আকাশপাতাল

সমরেশ মজুমদার

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক ১৩৬৮ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট ও অলংকরণ
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীললিতমোহন পান
লক্ষ্মী জনার্দন প্রিণ্টার্স
২৬/২এ, সিমলা রোড
কলকাতা-৬ ।

১

এমনটা কথা ছিল না। এই আমি, যার জন্ম উত্তর বাঙলার একটা নির্জন চা-বাগানে, যার নাড়ি কেটেছিল মদেশিয়া ধাই, যার বন্ধুরা এখন ছড়িয়ে রয়েছে চা বাগানের বাবুর চাকরি, ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গার ট্যাক্সি ড্রাইভারি অথবা কাঠের ব্যবসায়, যার পিতামহ এবং পিতা প্রায় অনেক বছর ধরে চা বাগানের চাকরি করে গেছেন শান্তিতে তার ললাট লিখন লিখতে গিয়ে ঈশ্বর যে এমন মারাত্মক ভুল করে বসবেন তা কে জানতো। কিংবা আরও পরে যখন জলপাইগুড়ি শহরে স্কুলের জীবন তখন পৃথিবী বলতে চায়ের বাগান আর তিস্তার চর, ফুট-বল মাঠ আর সাইকেলে শহর তোলপাড় করা তখন শেষ পরীক্ষার ফল ছিল অতি সাধারণ। এ অবস্থায় আর পাঁচটা ছাত্রের মতো তার ভর্তি হওয়া উচিত ছিল জলপাইগুড়ির কলেজে। কোনরকমে দু'তিনটে পাশ দিয়ে স্কুলের মাস্টারি পাওয়াই তো ভবিতব্য ছিল। পিতার আর্থিক অবস্থা এমন ছিল না যে সাধারণ মানের একটি ছাত্রকে তিনি কলকাতায় পড়তে পাঠাবার বিলাসিতা করতে পারেন। অতএব এখন আমি 'বেলাকোবা'র একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক অথবা চা বাগানের একজন বাবু হয়ে বেঁচে বর্তে বসতে পারতাম, যিনি কল-কাতায় বেড়াতে আসতে গেলে তিনমাস ধরে পরিকল্পনা করেন, এমনটাই প্রতিটি পয়সার অস্তিত্ব আলাদা করে ভেবে নেন। এমনটাই তো হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই ভদ্রলোক, তিনি আশিবছর আগে এনট্রান্স পাস করে চা বাগানের চাকরিতে ঢুকেছিলেন তিনি, তাঁর সাধ পুত্রদের মাধ্যমে মেটাতে না পেরে বেছে

নিলেন এই নাতিকে। চা-বাগান অথবা জলপাইগুড়ির কুয়ো ছাড়িয়ে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতা নামক বিশাল দিঘিতে। অনেকদিন আগে একটা গল্প লিখেছিলাম। বিধাতাপুরুষ যখন একজনের কপালে ভবিষ্যত লিখছিলেন তখন এক সাধু সেটা জেনে গিয়েছিলেন। ফলে সেই সাধুর জন্যে বিধাতাপুরুষকে দারুণ নাকানিচুবুনি খেতে হয়েছিল। আমি জানিনা আমার পিতামহ সেই সাধুর মতো জন্মক্ষণেই ললাট লিখন পড়ে ফেলেছিলেন কিনা! কিন্তু তিনি বিধাতার সব হিসেব পাল্টে দিয়েছেন, বারে বারে। নইলে স্রোতের বিপরীতে নৌকো তো সচরাচর বয়ে যায় না।

সেই ছোট্ট চা-বাগান আর তার গঞ্জ-এলাকা, শ-মিল পাহাড়ি নদীতে যার পৃথিবী শুরু সে জলপাইগুড়ি নামক জনাকীর্ণ শহরে যখন দাদুর হাত ধরে পড়তে এসেছিল তখন রুমালে নিজের উঠোনের মাটি বেঁধে এনেছিল। যেন নিজেকেই নিজের গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখা। অথবা স্মৃতি বয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু যেহেতু জল বা মাটি চট করেই নতুন জায়গায় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারায় তাই সেই কিশোরের পৃথিবীটা একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ল মফস্বল শহরের সিনেমা হলের সামনে, তিস্তার কাশবনের চরে, জেলাস্কুলের মাঠে আর একটু পরে সাইকেলে চেপে সারা শহর টহল দেওয়ায় পথের পাঁচালি যতটা নয় তার চেয়ে দস্যু মোহনের পোস্টার তাকে বেশি আকর্ষণ করে। কালো ভ্রমর থেকে শুরু করে মোহন সিরিজ কিরিটী দিয়ে যার যাত্রারম্ভ, দু'তিনবছরেই সে উঠে আসে 'কিনু গোয়ালার গলিতে। একটি লাইব্রেরির আলমারিগুলো তাকে এমন হাতছানি দিতে থাকে অনবরত যে সে ভুলে যায় খেলার মাঠ, নদীর চর। যখন নাকের তলায় হালকা রোমের রেখা তখনই মাঝরাতে রাজলক্ষ্মী তার সঙ্গে গল্প করে, কিরণময়ী হেসে ওঠার ছলে বুকের আঁচল লুটিয়ে দেয়। সে সন্দেহের চোখে তাকায় লাবণ্যের দিকে। একটু একটু করে সমরেশ বসু মায় বিমল কর পর্যন্ত যখন সঙ্গী তখন শহর জলপাইগুড়িটাকে' খুব ছোট মনে হয়। আর বেশির ভাগ লেখকদের লেখায় যেহেতু কলকাতা, উত্তমকুমারের সব ছবিই কলকাতার পটভূমিতে, দাদুর শাসনে ইংরেজি যে কাগজ পড়তে হয় প্রতি সন্ধ্যায় তাও আসে কলকাতা থেকে, সেখানকার খবর নিয়ে। তাই কৈশোর পেরোতে পেরোতে সে বুঝে নেয় কলকাতা ছাড়া তার মুক্তি নেই। চা-বাগান বা মফস্বল শহর নয়, পৃথিবী বলতে ওই কলকাতা। যে কলকাতার রাস্তায় হাঁটলে বড়-লোকের মেয়ে গাড়ি থামিয়ে লিফ্‌ট দেয়, মেসের ছেলে প্রাইভেট টিউশানি করতে গিয়ে হৃদয়ের রসদ পায়, ফুটপাতে নেমে এসে সত্যজিৎ রায় পরের ছবির নায়ক-কে নির্বাচন করেন সেই কলকাতা তাকে টানতে লাগল। জলপাইগুড়ি শহরে সে ইতিমধ্যে শম্ভু মিত্রের নাটক দেখেছে, হেমন্ত মুখার্জির গান শুনেছে। স্কুলের অনুষ্ঠানে নাটক করে অথবা গান গেয়ে ইতিমধ্যেই ধারণা তৈরি হয়ে গেছে কলকাতায় পৌঁছাতে পারলেই সত্যজিৎ রায় তাকে ডেকে নেবেন অথবা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে 'শোন বন্ধু শোন' গাইলেই হেমন্ত মুখার্জি পরের ছবিতে গাইতে দেবেন।

মনে মনে যে অন্য পৃথিবীতে যাওয়ার জন্য তৈরি তার স্কুলের শেষ পরীক্ষার ফল যদি হয় সাধারণ তাহলেও মন খারাপ হয়নি যেহেতু পিতামহ পিতার দ্বিধাকে নস্যাৎ করলেন। উচ্চ শিক্ষার্থে তাকে তিনি বিদেশে পাঠাবেনই। এই বিদেশ, যার নাম কলকাতা, যেখানে কোন আত্মীয়স্বজন নেই, থাকার মধ্যে পিতার এক বাল্যবন্ধু যিনি বউ বাজার নামক স্থানে মেসজীবন যাপন করেন তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করা হয়েছে। এই জেলা থেকে প্রতিবছর কিছু মেধাবী সন্দেহ তরুণ কলকাতায় পড়তে যায় অতএব তাদের সঙ্গী হতে অসুবিধা নেই। কিন্তু যাত্রার আগের উত্তেজনা আর যাত্রার সময়ের পরিবেশ বিপরীত হয়ে গেল। সেই সকাল থেকেই তরুণের মনে ভয় তিরতিরিয়ে উঠেছিল। চেনা গণ্ডি, আজন্ম পরিচিত মুখগুলো ছেড়ে অনিশ্চিত এবং অপরিচিত পরিবেশে পা বাড়াতে শেষ মুহূর্তে দ্বিধা এল। কিন্তু পিতামহ—। হ্যাঁ, সেই দৃশ্যটি অনেকটাই এইরকম।

'দাদু, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।'

'হয় ভাই। সহ্য করে নিলেই আনন্দ।' পিতামহ তরুণকে নিয়ে এলেন ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের সামনে। তারপর ধীরে ধীরে একটা হাত রাখলেন ওর কাঁধে, 'আমি গরিব, পড়াশুনাও বেশি করতে পারিনি। কিন্তু আমার পিতাঠাকুর বলতেন মানুষের মতো বাঁচতে। আমি চেষ্টা করেছি, তোমাকেও সেই চেষ্টা করতে হবে। তুমি কলকাতায় গিয়ে শিক্ষিত হও, স্থিতি হোক, সেইটেই আমার আনন্দ। আমি যা পারিনি, আমার ছেলেরা যা করেনি, নাতি হিসেবে তুমি সেটা পূর্ণ কর। যাও, তোমার গাড়ি হুইসিল দিচ্ছে।'

একটা একটা করে সিঁড়ি ভেঙে সে ট্রেনের কামরায় উঠে এল। পিতামহ এক পা এগিয়ে এলেন, 'নিয়মিত চিঠি লিখবে।' তরুণ ঘাড় নাড়ল। এই সময় ট্রেনটা দুলে উঠে চলতে শুরু করলো। পিতামহ লাঠি হাতে প্লাটফর্ম ধরে পাশাপাশি হাঁটার চেষ্টা করছেন। তরুণ ভাঙা গলায় বলে উঠলো 'দাদু!'

'এসো ভাই।' কিন্তু তাঁর পক্ষে আর তাল রাখা সম্ভব হলো না গতির সঙ্গে। সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে এসেছিল পৃথিবীতে। অনেক মানুষের ভিড়ে প্লাটফর্মের প্রান্তে দাঁড়ানো দীর্ঘ শরীরটা মিশে গেল। হঠাৎ সমস্ত চরাচর যেন অস্পষ্ট, একটা সাদা পর্দার আড়ালে চলে গেল। স্টেশনের আলো এবং মানুষ মিলেমিশে একটা পিন্ড হয়ে ছিটকে সরে গিয়েছে ততক্ষণে। জলপাইগুড়ি শহরের বাড়ি-ঘরদোর কেমন ছায়াছায়া, পান্তাপাড়ার রেলক্রসিং হুস করে বেরিয়ে গেল। যে কালো রাতটা চুপচাপ জলপাইগুড়ির ওপর নেমে এসেছিল ছুটন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে সে যেন তাকেও দেখতে পাচ্ছিল না। দৃষ্টি যখন অগম্য হয় তখন কল্পনা স্রষ্টা হয়ে ওঠে। সন্ধ্যে পার হওয়া বাতাস তার গালে শুধুই শীতলতা আনছিলো। হু হু ট্রেন ছুটে যাচ্ছিলো তরুণকে বুকে নিয়ে কলকাতার দিকে। চোখের জল তখন চোখের আড়াল। সারাজীবনের এই সত্যি ওই মুহূর্তে অনুভব করার ক্ষমতা অবশ্য সেই তরুণ অর্জন করেনি।

সে বড় সুখের সময় ছিলো। কারণ তখন অল্পেই কান্না পেতো। ভয় আসতো।

কষ্ট পেতাম। যা কিছু ভালো তাকেই ভালো বলতাম। খারাপের মধ্যে ভালো আবিষ্কারের জটিলতায় জড়াতাম না। বাঁকা জীবনকে সোজা করে দেখার প্রবণতা এনে দিল শহর কলকাতা। যে শহরে গত আঠাশ বছর থেকেও আমি প্রবাসী। আঠাশ বছর বিবাহিত জীবন যাপন করার পরও স্ত্রীকে কি মাঝে মাঝে অন্য বাড়ির মেয়ে বলে মনে হয় না? আঠাশ বছর পরেও মায়ের কাছে একান্তে বসলে নিজের জায়গায় এলাম বলে মনে হয় না? স্ত্রী আপত্তি করতে পারেন কিন্তু তাঁরও কি ওই একই সময় ঘর করার পর নিজের বাড়ি গুলিয়ে যায় না? তবু মিলেমিশে থাকা, তাই আছি। থাকতে থাকতেও তো থাকার অভ্যেসটা তৈরি হয়ে যায়।

এই কলকাতা শহর যার প্রায় প্রতিটি গলি আমি চিনি, যার রহস্য আর আমার কাছে তেমনভাবে নেই তার সঙ্গে বাস জীবিকার কারণে। অথচ এম এ পাশের পর চলে যেতে পারতাম জলপাইগুড়ির কলেজে। নিদেনপক্ষে বেলাকোবার স্কুলে। অথচ গেলাম না। খুব কষ্ট করে পিতার আর্থিক সাহায্য ছাড়া শুধু নাটক করার বাসনায় এই শহরে থেকে গেলাম। নষ্ট করে দেওয়ার সমস্ত ক্ষমতা রাখে এই শহর। কোনো সত্যজিৎ বা হেমন্ত মুখার্জির দর্শন পাইনি কিন্তু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কষ্ট করে নাটক করার ঘটনা চোখের সামনে দেখছি। আর তাই অনুসরণ করে বাহান্ন সপ্তাহের মধ্যে খবরের কাগজের বিশেষ পাতায় যদি কখনও চিলতে খবর বা ছোট্ট ছবি বেরিয়ে যায় তাহলে তো কথাই নেই। কেউ দেখলো কি দেখলো না সেই ছবি তো রয়েই গেল কিন্তু নেশাটা আপাদ-মস্তক পড়ল ছড়িয়ে।

সেই যে থেকে যাওয়া, একটু একটু করে শ্যাওলার মতো পাথরের গায়ে সেঁটে পড়ায় যার নুড়ি, ক্ষুধা কিংবা অভাব যে বয়সে পাত্তা পায় না, সেই বয়সেই আচমকা নাটক লিখতে গিয়ে গল্প লিখে ফেলার ব্যাপারটাও সম্ভবত বিধাতার ইচ্ছাতালিকায় ছিল না। ফলে বারংবার ভদ্রলোক বাধা দিয়েছেন, এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন যাতে লেখক হবার বাসনা যা সাতষট্টি থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত মনের কোণে উঁকি মারছিল তার উধাও হয়ে যাওয়ার কথা।

অনেক ভেবে দেখেছি, আমার সঙ্গে বিধাতার একটি চমৎকার সমঝোতা আছে যে জিনিস আমি আগ্রহী হয়ে চাইবো তা তিনি কিছুতেই দেবেন না। যে মানুষের সান্নিধ্য আমি কামনা করব তিনি আমাকে ভুল বুঝবেনই। ইচ্ছে ছিল ছবিতে অভিনয় করব অথবা গান গাইব, ওদুটোর ক্ষমতাই তিনি কেড়ে নিলেন। যে ইচ্ছে কখনোই ছিল না সেটাই হতে হতেও হচ্ছে না। এই যে লেখক আমি, এতো নিরন্তর ঝড়ের সঙ্গে, টালমাটাল স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাওয়া। কিন্তু কতখানি লেখক তাই নিয়েই আমার সংশয়। মোটামুটি লোকে নামটাম জানে সভাসমিতিতে ডাক পড়ে, দুদুটো পুরস্কারও তো জুটে গেল, যা কিনা অনেক লেখকের মোক্ষলাভ। কিন্তু মনে মনে তো জানি, হচ্ছে না কিছুই। এই আমি একজন লেখকের প্রক্সি দিয়ে যাচ্ছি। কিংবা বলা যায় একজন লেখকের ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছি। আর কে না জানে অভ্যেস এমন জিনিস যে এভাবে

অনেকদিন বেশ চালিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু খ্যাতি পুরস্কার এবং অর্থের বাইরে এই আমি যখন আমার পূর্বসূরীদের বই পড়ি তখনই নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হই। এই টানাপোড়েনের মধ্যে বেশ বেঁচে বর্তে আছি। তিরিশ বছর ধরে একজন লেখক তাঁর বোধবুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে যে লেখাগুলো লিখে গেলেন, এদেশে জীবনের প্রথম একটি অর্ডারি উপন্যাস লিখে তাঁকে টপকে যাওয়া যায়। ?

বোধহয় এই কারণেই আমার পক্ষে লিটল ম্যাগাজিন করা হলো না। এই কারণেই লেখকবন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত আড্ডা মারার বা গোষ্ঠী তৈরি করার প্রবণতা এলো না। এই কারণেই সকাল দশটার পর লেখার টেবিলে ধরে বেঁধেও কেউ আমাকে বসিয়ে রাখতে পারে না। অথচ অদৃষ্টের এমন পরিহাস ছেষট্টি সালে নাটকের জন্য যাকে তিরিশ টাকায় মাস কাটাতে হতো, তার গাড়ি-বিলাস-সংসার চালাচ্ছে লেখার টাকা। যে তার জীবনযাত্রায়, আচরণে এবং ভাবনায় লেখক ছাপটা চমৎকার মুছে ফেলতে পেরেছে, বিধাতা তাকেই জুতে দিয়েছেন! সাহিত্য নামক গাড়িটির সঙ্গে। এখন শুধু টেনে নিয়ে যাওয়া। নিস্তার নেই।

গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে আগ্রহ এবং মোহ ধাক্কা খেয়েছিল বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে। ইতিমধ্যে 'দৌড়' উপন্যাস ছবি হয়েছে। প্রায় আকস্মিকভাবেই 'দেশ' পত্রিকার নাটক-ছবির সমালোচনার দায়িত্ব কাঁধে চেপেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বিখ্যাত মানুষগুলোর সঙ্গে একই টেবিলে বসতে শুরু করেছি, যাঁরা জলপাইগুড়ি শহরে আমার কাছে নক্ষত্রের মতো ছিলেন। যাঁর অনুষ্ঠান দেখার টিকিট যোগাড় না করতে পেরে সারারাত বন্ধুদের সঙ্গে খোলামাঠে দাঁড়িয়ে গান শুনেছি রেসকোর্স পাড়ার মাঠে, তাঁর সঙ্গে এখন আমার সমীহ করার সম্পর্ক। এও কি কথা ছিল?

মনোজ ভৌমিকের সঙ্গে আমার আলাপ কফি হাউসে। সে একটা সময় ছিলো যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারতাম এক কাপ কফি নিয়ে। চিৎকার চেঁচামেচি, সবার একসঙ্গে কথা বলার একটুও অসুবিধে হতো না। তখন শুধু স্বপ্ন দেখার বয়স কিন্তু উদ্যোগ নেওয়ার বাসনা ছিলো না। কফি হাউস হয়ে গিয়েছিল অভ্যেসের মতো। যা হয়, নানান চাপে যখন সেই অভ্যেস স্তিমিত তখন কালেভদ্রে যাওয়া আর যে হট্টগোলে এককালে ভ্রুক্ষেপ ছিলো না তাই বিরক্তিকর মনে করা। এইরকম সময়ে মনোজের সঙ্গে আলাপ। মাঝারি মাপের স্বাস্থ্যবান চেহারা। গালে সযত্নে রাখা দাড়ি। কথা বলছে কফিহাউসি কায়-দায়। এককালে নাটক করতো। এখনও করে। তবে সেটা আমেরিকায় সেখানেই বসতি। কল্যাণ সর্বাধিকারীর সঙ্গে 'আন্তরিক' নামের একটা কাগজ বের করে যার কম্পোজ চলে কলকাতায়, ছাপা হয় নিউইয়র্ক থেকে। এ ছেলে নকশাল হতে পারতো, গ্রুপ থিয়েটারের দাদা হয়ে নাম কিনতে পারতো, কিন্তু তার বদলে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে রয়েছে নিউইয়র্কে। সেখানেই বাংলা থিয়েটার করছে বাঙালি জড়ো করে। বাংলা কাগজ বের করে পৌঁছে দিচ্ছে প্রবাসী বাঙালির ঘরে ঘরে। বেশি বয়সে নাকি সচরাচর বন্ধুত্ব হয় না। কিন্তু মনোজকে আমার ভালো

লাগলো। 'আন্তরিকে'র একটি সংখ্যায় ও আরম্ভ করেছে নিউইয়র্কের বাঙালিদের নিয়ে একটি লেখা। সেটা আমার অভ্যস্ত গল্প উপন্যাস থেকে একটু আলাদা। মাত্র দু'সপ্তাহের ছুটিতে এসেছিলো মনোজ কিন্তু আমার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি করে দিয়ে গেল 'আন্তরিক' পত্রিকার। যাওয়ার আগে ও আমার বেশ কিছু বই নিয়ে গিয়েছিল। চিঠিপত্রে প্রায়ই সেই বইগুলো সম্পর্কে অভিনব মন্তব্য লিখে পাঠাতো। এই পর্যন্ত আমি জেনে গিয়েছি নিউইয়র্ক আমেরিকায় হলেও তার বাঙালিরা দিল্লি বা বম্বের মতো সংস্কৃতি, পুজো এবং ঝগড়া-ঝাঁটি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এখানকার মতনই কেউ কারো ভালো সহ্য করতে পারেন না। তাঁরা ওদেশে গিয়েছিলেন অর্থ রোজগারের বাসনায়। দেশের চেয়ে বহুগুণ অর্থ তাঁদের পকেটে আসছে। কিন্তু ক্রমশ পারিপার্শ্বিকের নিশ্চয়তা তাঁদের চারপাশে এমন দেওয়াল তুলেছে যে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হলেও ফেরার দরজাটা নিজেরাই বন্ধ করে রাখেন শক্ত হাতে।

লক্ষ্য করেছি, বাঙালি সাহিত্যিক বিদেশে বেড়িয়ে এলেই একটা বই লিখে ফেলেন। দুর্ভাগ্যবশত এই বইগুলোর কোনটাই আমার পড়া হয়ে ওঠেনি। আমেরিকা সম্পর্কে আমার আগ্রহ হলিউডের ছবি দেখে এবং হ্যাডলি চেজের বই পড়ে। যে যাই বলুক এই ভদ্রলোকের বই পড়তে আমার খুব আরাম লাগতো। কিন্তু মনোজের চিঠিতে অবশ্য মজাদার খবর পেতাম। আন্তরিকে ছাপা ওর লেখাতেও অন্য আমেরিকার কথা থাকতো। একবার ও আমায় লিখেছিলো, 'সমরেশ কল্পনা করুন আপনি জীবনে প্রথমবার বয়স্ক অবস্থায় কলকাতায় এলেন। ওই শহরে কোনো আত্মীয়বন্ধু নেই। গ্রান্ড কিংবা পার্ক হোটেলে ওঠার সামর্থ না থাকলে আপনি লিটন জাতীয় হেটেলে উঠবেন। শিয়ালদার নিচুটাকার হোটেলের খবর পেতে আপনার সময় লাগবে। কিন্তু ভাড়ার ট্যাক্সি আপনাকে যা যা দেখাবে তার মধ্যে কফিহাউসের আড্ডা নেই, গ্রুপ থিয়েটারের নাটক নেই, কলেজ স্ট্রিটের বই-এর দোকান নেই।' কথাটা ঠিকই।

কিন্তু আমার পৃথিবীর আয়তন বেড়ে চলেছিলো। চা-বাগান, জলপাইগুড়ি, কলকাতার পর একটু একটু ভারতবর্ষের এদিক ওদিক যাওয়া আসা চলছিল। কিন্তু কলকাতায় বাস করার পর আমার বিস্ময়বোধটাই উধাও হয়ে গিয়েছিলো। ভারতবর্ষের যেখানেই গিয়েছি সেখানেই মনে হয়েছে অপরিচিত পৃথিবীতে আসিনি। অর্থাৎ পৃথিবীর আয়তন বেড়েছে কিন্তু চেহারা পাল্টায়নি। এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি কখনই একই বিষয় নিয়ে দু'বার লিখিনি। প্রতিটি বড় লেখার আগে যে ভাবনা কাজ করে তা হলো কিছু নতুন চেহারার মানুষকে ধরা। সেই যে কবি লিখেছেন মনের পৃথিবী মাটির পৃথিবীর চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। এ বিশ্বাস আমারও। এই পৃথিবীর কোথায় কি আছে তার নব্বুই ভাগ ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মানুষের মন আবিষ্কারের কৃতিত্ব কেউ দাবি করতে পারেন না।

আমার পূর্ববর্তী দুই লেখককে জানি যাঁদের পায়ের তলায় সরষে আছে। তা

না থাকলে বাংলার বিভিন্ন জেলার মানুষ তাঁদের কলমে এতো জীবন্ত হয়ে উঠতো না। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া ঘরে বসে কেউ নিরন্তর মানুষের গল্প বলে যেতে পারে না। মানুষের কথা বলতে গেলে মানুষের মধ্যে মিশে যেতে হবেই। নইলে 'টানা পোড়েনে'র মতো লেখা বেরুবে না কলম থেকে। কিন্তু দিল্লি বোম্বাই অথবা মানালি ঘুরে এসেও কোনো লেখা এই মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি। সন্তোষ-কুমার ঘোষ সারা পৃথিবী ঘুরেছেন বারংবার। কিন্তু তাঁর কোনো বড়ো ছোটো উপন্যাসের পটভূমি বিদেশ নয়। অথচ তিনি গল্প করতে করতে স্বচ্ছন্দে বলতে পারতেন, 'তোমাদের যে চা-বাগানে বাড়ি ছিলো, সেটা ছাড়িয়ে মাইল কয়েক গিয়েই আমাদের গাড়ি বিগড়ে গিয়েছিলো। ওই যে বিনাগুড়ির দিকে যে রাস্তাটা ডাইনে বাঁক নিয়েছে সেখানে। হেঁটে চলে গেলাম বিনাগুড়ি। দশ-টাকায় আশিটা কমলালেবু বিক্রি হতো সে সময়।' আবার পরের মুহূর্তেই তিনি অক্লেশে বলে যেতেন নিউইয়র্কের ম্যানহাটন থেকে কুইনসে যাওয়ার পথে কটা আণ্ডার গ্রাউন্ড স্টেশন পড়ে এবং সেখানে নামলে কোথায় পৌঁছান যায়। এই মানুষ কেন বিদেশ নিয়ে কিছু লেখেননি জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'দেশের মানুষ নিয়ে যা লেখার আছে তাই এখনও লিখে উঠতে পারলাম না তো বিদেশের মানুষ।'

মনোজ যখন দ্বিতীয়বার এদেশে এলো তখন ওর সম্পর্কে অনেক তথ্য পেয়ে গেছি। নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে কুইনস নামক জায়গায় ওর নিজের বাড়ি। গ্যারেজে স্বাভাবিক নিয়মেই গাড়ি আছে। যেখানে চাকরি করে সেখানে পদমর্যাদা কম নয়। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ছ'লাখ টাকার মতো বাৎসরিক মাইনে পায়। দুই ছেলে এবং স্ত্রী। প্রিয় গল্পকার বিমল কর। যেসব ভারতীয় দশ পনেরো বছর আগে এদেশ ছেড়ে গেছেন তাঁদের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি সম্পর্ক খুব ক্ষীণ। দু'তিন বছর বাদে দেশে ফিরলেও নেমন্তন্ন খেয়ে সময় কেটে যায়। স্মৃতিতে হেমন্ত সন্ধ্যা মানবেন্দ্র অথবা বিমল মিত্র সমরেশ বসু নিয়েই ওরা আছেন। সত্যজিৎ মৃণাল সেনের পর যাঁরা ছবি করছেন তাঁদের নামও এরা শোনেননি। লেখকদের তো কথাই ওঠে না। অথচ মনোজকে দেখে মনে হতো ও যেন বর্ধমান বা মালদায় আছে। হালফিল সমস্ত খবর সে রাখতো। এবার মনোজ এসে জানাল নিউইয়র্কের অফ ব্রডওয়ে থিয়েটারে সে অভিনয় করছে একটি ভারতীয় চরিত্রে। ইংরেজি নাটকটি সেখানে বেশ জনপ্রিয়। ব্রডওয়ে এবং অফ ব্রডওয়ের তুলনা করা যায় অনেটাই আমাদের প্রফেসনাল থিয়েটার এবং গ্রুপ থিয়েটারে সঙ্গে। অবশ্য গঠনগত কিছু পার্থক্য থাকছেই। অত্যন্ত হাসিখুশি এই মানুষটি আমায় বললো, 'সমরেশ স্থির করেছি আমি একটা ছবি করব।' এরকম ভাবনার সঙ্গে আমি ইতিমধ্যে বেশ পরিচিত হয়ে গিয়েছি। সত্যি বলতে কি সিনে-ক্লাবগুলোর দৌলতে দেশ-বিদেশের ছবি দেখতে দেখতে ওরকম বাসনা যে আমারও হয়নি তা নয়। কিন্তু ছবি করতে গেলে অর্থ লাগে। অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। এ দুটোই আমার নেই। 'দৌড়' ছবি তৈরির আগে পরিচালকের সঙ্গে অনেকদিন বসেছিলাম চিত্রনাট্য তৈরিতে সাহায্য করতে। চিত্রগ্রহণও

দেখেছি। কিন্তু ওই পর্যন্ত। তারপর থেকে মনে মনে কত গল্পের যে চিত্রনাট্য লিখলাম তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

কিন্তু মনোজ অন্যকথা বললো। ওর ছবির পটভূমি নিউইয়র্ক শহর। ছবির ভাষা বাংলা। এই দ্বীপ এই নির্বাসন নামের একটি উপন্যাস সে লিখছে আন্তরিক পত্রিকায় তাই হবে ছবির বিষয়বস্তু। খবরটা চমকপ্রদ। ভারতবর্ষের বাইরে বাংলা ছবি এর আগে কখনও তৈরি হয়নি। এক নিউইয়র্ক শহরেই বাঙালি থাকেন দশ হাজার। অতএব তাঁদের নিয়ে ছবি হতে পারে বইকি। মনোজের লেখাটা আমার পড়া ছিলো। সত্যি বলতে কি আমার মনে হয়েছিল ওই লেখা যদি 'দেশ' কিংবা বড় কাগজে বের হতো তাহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হতো। চর্চা না থাকার ছাপ কোথাও কোথাও রয়েছে বটে কিন্তু বিষয়বস্তু এবং ট্রিটমেণ্টের দিক থেকে একটা নতুন স্বাদ পেতেন বাঙালি পাঠকরা। ক'দিন খুব উত্তেজনার মধ্যে কাটল। গল্পটা নিয়ে আমরা নানা দিক থেকে আলোচনা করে যাচ্ছিলাম। সব কিছু পাকা না হলে মনোজ ঘোষণা করতে রাজি নয়। মনোজের হিসাব অনুযায়ী ছবিটা তৈরি করতে দশ লক্ষ টাকা লাগবে। অংকটা শুনে আমি চমকে উঠলাম। কারণ ইতিমধ্যে জেনেছি কলকাতায় বসেও কোনো কোনো পরিচালক বারো চৌদ্দ লক্ষ টাকায় বাংলা ছবি করছেন। তাহলে নিউইয়র্কের মতো শহরে অত কম টাকায় কি করে ছবি হবে? ওই প্রথম বুঝলাম তুলনামূলক আলোচনায় দশ লক্ষ টাকাকেও কম বলে মনে হতে পারে। মনোজ যে গল্প শোনাল তাও অভিনব। ওখানে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা অল্প পয়সায় ছবি তৈরি করতে চান তাঁদের সামনে পর্যাপ্ত সুযোগ আছে। আমেরিকার ছবি মানেই হলিউডি ছবি নয়। মাত্র দেড়শ টাকায় চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে ক্যামেরা ভাড়া পাওয়া যায়। শুক্রবার দুপুরের পর ক্যামেরা ভাড়া নিয়ে এলে সেটা সোমবার সকালে ফেরত দিতে হয় একদিনের ভাড়াসহ কারণ শনিবার বারোটার পর আর রবিবার পুরো দিন দোকান বন্ধ থাকে। ফেরৎ দেবার কোনো সুযোগ থাকে না। অতএব ওই দেড়শো টাকায় আড়াইদিন চমৎকার স্যুটিং করে ফেলা যায়। ফিল্ম জমা দিলে তার প্রোজেকশন বৃহস্পতিবারেই দেখিয়ে দেয় ওরা। নিজেদের ভুলভ্রান্তি দেখে নিয়ে শুক্রবার থেকে আবার নতুন করে ছবি তোলা সম্ভব। অথচ এদেশে রঙিন ছবি তুলতে খরচ অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কালার ল্যাব তৈরি হবার আগে ফিল্মের কাজ বম্বে বা মাদ্রাস পাঠিয়ে হাঁ করে বসে থাকতে হতো ফলাফলের জন্যে। দশ লক্ষ টাকা মানে তখন এক লক্ষ ডলার। নিজের সংগ্রহ ছাড়া মনোজকে সেদেশের অনেকেই সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমেরিকায় বাংলা ছবি তৈরির একটা বড় সুবিধা হলো ছবিটিকে বাংলাদেশে পাঠানো সম্ভব। ভারত বাংলাদেশের ব্যবসায়িকভাবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর চুক্তি নেই। কিন্তু এ ছবি যেহেতু আমেরিকার সার্টিফিকেট পাবে তাই তা বাংলাদেশে দেখাতে কোনো অসুবিধা হবে না। এর ফলে বাংলা ছবি আর একটা নতুন বাজার পাচ্ছে। মনোজ ইতিমধ্যে আমেরিকার নাগরিকত্ব পেয়ে গেছে। অতএব ওর পক্ষে সার্টিফিকেট পাওয়া স্বাভাবিক।

এবার ফিরে যাওয়ার আগে মনোজ আমার কাছে আচমকা প্রস্তাব দিল, 'আপনি আমার ছবির চিত্রনাট্য লিখতে সাহায্য করবেন ?' একটু অবাক হলেও সাগ্রহে রাজি হলাম। কারণ ততদিনে আমি ওর গল্প নিয়ে অনেক কিছু ভেবে ফেলেছি। মাঝে মাঝে টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলবে জানিয়ে মনোজ চলে গেল দায়িত্ব দিয়ে।

'এই দ্বীপ এই নির্বাসন' নিয়ে বসলাম এবার। প্রচুর শাখা প্রশাখায় ছড়ানো গল্পটিকে ছিমছাম করতে হবে। চরিত্রের ভিড় কমাতে হবে। উপন্যাসটি আমেরিকায় বসবাসকারী বাঙালিদের দু'টি প্রজন্মকে ধরছে। ষাট সালের পর যেসব বাঙালি চাকরি নিয়ে ওদেশে গিয়েছিলেন তাঁরা ওই দেশটাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন অর্থ রোজগারের মাধ্যম হিসাবে। দেশের সংস্কার তাদের রক্তে জড়িয়ে ছিলো। রুটি রোজগারের বাইরে আমেরিকানদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার কোনো চেষ্টা ওঁরা করেননি। লক্ষ্মীর প্রতিমা, লুঙ্গি থেকে শুরু করে ঘরের মধ্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন আবার ঘরের বাইরে এসে আমেরিকানদের নকল করেছেন। এঁরা সাদা চামড়ার লোকদের সান্নিধ্য চাইতেন কিন্তু কালো চামড়ার নিগ্রোদের এড়িয়ে যেতেন। নিরন্তর এঁদের মনে হতো নিজেদের দেশ ছেড়ে এসেছি কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করার চিন্তা এলেই শিউরে উঠতেন। যে সুবিধে, স্বাচ্ছন্দ্য, বৈভব ওদেশে ওঁরা পেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তা দেশে কোনোকালে পাওয়া যাবে না তা তাঁরা বুঝে গিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম ঘন ঘন দেশে আসতেন তাঁরা। কিন্তু ক্রমশ দেশের টিকিটের দাম, দেশের জল অসহ্য হওয়া, গরমে শরীরে এলার্জি বেরুনো এতবড় কারণ হয়ে দাঁড়াল যে আসাটা অনিয়মিত হয়ে গেল। কিন্তু তাঁরা বাঙালিত্ব বলতে যেসব সংস্কারে বিশ্বাস করেন তা হারাতে কিছুতেই রাজি নন। এঁদের ছেলেমেয়েরা, যারা আমেরিকায় জন্মেছে, সাদা কালো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক-সঙ্গে বড়ো হচ্ছে তাদের মনে ওইসব সংস্কার থাকার কথাও নয়। বাবা মায়ের বাড়িতে এক জীবন বাইরে অন্যজীবন তারা মেনে নিতে পারে না। তারা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে চায়। ফলে সংঘাত আসে, শ্রদ্ধা কমে যায়। যে দেশে সে থাকে না, একবার বেড়াতে গিয়ে যার ভয়াবহ স্মৃতি নিয়ে যে ফিরেছে তার সম্পর্কে কোনো স্বাদেশিকতা বোধ তার থাকতে পারে না। উচ্চবিত্ত পরিবারের কোনো ছেলেকে দিন তিনেক বস্তিবাসী কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে থাকাতে বাধ্য করা যায় কিন্তু তার মন সেখানে শেকড় নামাতে পারে না। ঐতিহ্য কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রতি মন ফেরানোর চেষ্টা তাদের আগের প্রজন্ম কখনোই করেন না কারণ তাঁরা নিজেরাই সেই ব্যাপারটা সম্পর্কে অজ্ঞ। অথচ সন্তান তাঁদের অবাধ্য হলে তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ক্রমশ অত বিত্তের মধ্যে বাস করেও মানুষগুলো কি ভীষণ অসহায়, একা হয়ে যান। এই ছবি ওই দুই প্রজন্মের বিরোধের গল্প।

কিন্তু মুশ্কিলে পড়ে গেলাম আমি। মনোজের উপন্যাসে দেখছি নায়ক পেট্রোল পাম্প থেকে সিগারেট খাচ্ছে। রাত দু'টোয় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলছে। এসব

আমার অভিজ্ঞতায় নেই। অতএব চিত্রনাট্য লিখব কি করে। ব্যাপারটা আমার দ্বারা সম্ভব নয় জানিয়ে ওকে যখন চিঠি লিখছি তখন এক রাতে মনোজের টেলিফোন এলো। ও জানতে চাইলো, আমি কতদূর এগিয়েছি? এক লাইনও লিখতে পারিনি, শোনামাত্র বলল, 'আমার ভুল হয়ে গিয়েছিলো। আপনি যদি কোনোদিন কলকাতায় না আসতেন তাহলে দৌড় লিখতে পারতেন না। এক কাজ করুন। আমি টিকিট পাঠিয়ে দিচ্ছি। সামনের মাসে প্রথম সপ্তাহে নিউইয়র্কে চলে আসুন। তখন এখানে পাতা ঝরার সময়। চমৎকার লাগবে। সব কিছু দেখে শুনে এখানে বসেই চিত্রনাট্যটা লিখে ফেলুন। আমি সঙ্গে থাকলে মনে হয় আপনাকে সাহায্য করতে পারবো। কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ও টেলিফোন ছেড়ে দিলো।

তখন পর্যন্ত মনে হয়েছিলো ব্যাপারটা খেয়ালে বলা। কিন্তু তার ক'দিন বাদেই ওর চিঠি এল. সঙ্গে কাগজপত্র পাঠিয়েছে যাদেখালে এখানকার মার্কিন দূতাবাস আমাকে ভিসা দেবে। এইবার অস্বস্তি শুরু হলো। মনের মতো কাজ পেলে সেটা করতে কখনোই কুণ্ঠিত হইনি! কিন্তু এক্ষেত্রে দশ লক্ষ টাকার ঝুঁকি আছে। তখন পর্যন্ত আমি একটিও চিত্রনাট্য লিখিনি। ব্যাপারটা নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করতে পারছি না। কিন্তু বুঝতে পারছি আমার পৃথিবীটা বড় হতে চলেছে আর মে মাসে। তখন পুজো সংখ্যার উপন্যাস লেখার সময়। রাত জেগে লিখতে কখনোই পারি না। এই দোটানায় যখন দুলছি তখন সুপ্রিয়দার সঙ্গে দেখা। উনি খবর পেয়ে গেছেন আমি আমেরিকায় যাচ্ছি। বললেন, 'যাচ্ছ যখন তখন ও দেশটায় ভালো করে ঘুরে বেড়াও। ইউ এস আই এস প্রতিবছর বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগের কৃতী মানুষদের আমেরিকায় পাঠায় ভাবের আদানপ্রদানের জন্যে। তাঁরা সেখানকার বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাও দেন। আমার ক্ষেত্রে যাতায়াতের ভাড়া দিতে হচ্ছে না ওঁদের। কিন্তু পনের দিনের জন্য আমার ইচ্ছেমতন গোটা আমেরিকায় ঘুরে বেড়াবার ব্যবস্থা ওঁরা করে দেবেন। ব্যাপারটা ছিল আশাতিরিক্ত। তাই যখন ওঁরা জানতে চাইলেন আমি কোন কোন শহরে যেতে চাই তখন গোলমালে পড়লাম। ইতি-মধ্যে আমেরিকার ম্যাপটা ভালো করে দেখেছি। কোনটা ছেড়ে কোনটা রাখব? প্রথমেই মনে পড়ল লস এঞ্জেলেসের কথা। হলিউড। চলচ্চিত্রের রাজধানী। তারপরেই সানফ্রান্সিসকো। অনেকগুলি ছবি দেখেছি ওই শহর নিয়ে। এবার শিকাগো। বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিয়েছিলেন ওই শহরে। আমার এক স্বল্প পরিচিতা মহিলা থাকেন ওয়াহিও শহরে। মনোজের মাধ্যমেই আলাপ। অনেক-বার বলেছিলেন ওদেশে গেলে ওঁর ওখানে উঠতে। তাঁর শহরটার নামও জুড়ে দিলাম। এই টুকুতেই দেখা যাচ্ছে পনের দিন কেটে যাবে। অতএব আর কি করা। এরপর জানতে চাওয়া হলো আমি কোন কোন বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি কোনো লেখকের নাম করিনি। কারণ হীনমন্যতায় ভুগতে আমি রাজি নই। যাঁর সঙ্গে দেখা করবো তিনি আমার বই কখনোই পড়বেন না। সুতরাং আলোচনা হবে এক তরফা। তিনজন অভিনেতা, গ্রেগরি পেক,

সিডনি পয়েটর, ডাস্টিন হফম্যান এবং দু'জন থ্রিলার লেখক যেমন হ্যাডলি চেজ আর হ্যারল্ড রবিন্সের নাম করলাম। এই দু'জনের বই ইংরেজি ও বাঙলায় এদেশে হু হু করে বিক্রি হয়। লেখক হিসেবে এদের সঙ্গে আমি আলাপ করবো না, পাঠক হিসেবে এদের কাছে যাব। হ্যাঁ, সেইসঙ্গে আর একটা বাঙলাভাষা প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। তিন শিকাগো ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এডওয়ার্ড ডিমক।

হঠাৎই প্রায় একসঙ্গে মনোজের টিকিট আর ইউ এস আই এস-এর কাগজপত্র হাতে এল! টিকিট অনুযায়ী আমাকে দিল্লি হয়ে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট ঘুরে নিউইয়র্ক যেতে হবে প্যান-অ্যামের প্লেনে চড়ে। আর ইউ এস আই এস জানাচ্ছে অমুক দিন অমুক সময় আমাকে ওয়াশিংটন শহরের ওয়াশিংটন হাউস হোটেলে রিপোর্ট করতে হবে। ব্যাপারটা যেন এমন গ্র্যান্ড হোটেলে চলে এস।

এমনটা হবার কথা ছিল না। বিধাতা পুরুষ যদি লিখেও থাকেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই কপাল গুলিয়ে ফেলেছিলেন। খুব হাসি পাচ্ছিল দু'কলম লেখার দৌলতে চা বাগানের সেই কিশোর বাক্স গোচাচ্ছে সাগরপাড়ি দেবে বলে! লাঠি হাতে প্লাটফর্মে দাঁড়ানো মানুষটি এখন আমার চোখের সামনে! যিনি সাতানব্বুই বছরে দেহ রেখেছিলেন স্মিতমুখে পিতামহ বলছেন, 'এসো দাদু।'

২

ভিসা পেতে একটুও অসুবিধে হয়নি মনোজের পাঠানো কাগজপত্রের জন্যে। সেই কাগজের দৌলতেই মনোজের বাৎসরিক রোজগারটির পরিমাণ জানতে পারলাম। আমার জানাশোনা কোনো বঙ্গ সন্তান অত লক্ষ টাকা রোজগার করেও কফি হাউসে আড্ডা মারবে এমন ভাবতে অসুবিধে হয়। বন্ধু বান্ধবরা, যারা আমেরিকায় যায়নি তারা ওদেশ সম্পর্কে খুব জ্ঞান দিয়েছিল। সন্তোষকুমার ঘোষ বলেছিলেন, 'আড্ডা মারার চেষ্টা করবে, নইলে গল্প পাবে না। আর প্লিজ, বাড়িঘর স্ট্যাচু দেখে এসে গল্প শুনিও না।' সুনীল গাঙ্গুলী বললেন, 'একটি ছেলের টেলিফোন নাম্বার দিচ্ছি। কামাল ওয়াহিদ। পারলে ফোন করবে।' সুনীল ওদেশে বহুবার গিয়েছেন, কোনো টিপস আদায় করতে পারিনি ওঁর কাছ থেকে।

মুস্কিল হয়ে গেল পোশাক নিয়ে। কলকাতায় আমি যে জীবনযাত্রা করতাম তাতে আর যাই হোক পোশাকের চিন্তা কখনই করতে হতো না। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকেই জামাকাপড় সম্পর্কে সচেতন না থাকায় ব্যাপারটা পাত্তা পেত না। একটি দৃশ্য এখনও চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই। ক্লাশ এইট-নাইনে পড়ি তখন। পিতামহের সঙ্গে জলপাইগুড়ির দিনবাজারে পুজোয় জামাপ্যান্ট কিনতে গিয়েছি। চিরকালই মিলের মোটা সুতির কাপড় কিনে প্যান্ট বানানো হতো। শার্টও তাই। সেবারও ব্যতিক্রম হলো না। ফিরে আসার

সময়পিতামহ হঠাৎ ভারি গলায় বললেন, তোমার একটাও ভালো জামাপ্যান্ট নেই। এ বছরও হলো না। তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?'
আমি মাথা নেড়ে না বলেছিলাম। পিতামহ বলেছিলেন, 'আমার ক্ষমতামত তোমার পোশাক দিলাম। নিজের ক্ষমতা হলে তুমি দামী পোশাক পরতে পারো।' কিন্তু সেই বাসনা কখনই মনে উঁকি দেয়নি। কিন্তু এবার বন্ধুরা বলল, 'মার্কিন মুলুকে যেতে গেলে একটু সাজুগুজু করে যাওয়া উচিত।'
কিন্তু দমদম এয়ারপোর্টে যখন বাক্স নিয়ে পৌঁছালাম তখন সাকুল্যে তিনটে ভালো শার্ট, তিনটে প্যান্ট, দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত সোয়েটার, ধার করে নেওয়া জ্যাকেট এবং নিউমার্কেটের সামনে থেকে কেনা এক জোড়া সস্তার বুট জুতো ছাড়া কয়েকটা বই আমার সঙ্গী। সিডিউল যা তাতে দিল্লি থেকে আমার বিমান ছাড়বে ভোর সাড়ে চারটেয়। সন্ধে সাড়ে সাতটায় সেখানে পৌঁছে কি করে সময় কাটাবো তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা তখন আই সি আই-এর বাসু সামাধান করে দিল। মনোজের পাঠানো টিকিট প্যান এ্যাম এয়ারলাইন্সের। ওরা দিল্লির এক পাঁচতারা হোটেলে আমার রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে ছিল কলকাতা থেকেই। বলে দিল যাতায়াতের ট্যাক্সি ভাড়াটাও হোটেল দিয়ে দেবে। এয়ারলাইন্সের সঙ্গে নাকি হোটেলের সেরকম বন্দোবস্ত থাকে।
এর আগে প্লেন বলতে চড়েছি ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের, বাগডোগরা পর্যন্ত। ঠিক কত দিনের এই ট্যুর আমার জানা নেই। কিন্তু নিজের জায়গা ছেড়ে যাচ্ছি এই বোধটা হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ভি আই পি রোড দিয়ে যখন দলবল নিয়ে যাচ্ছি তখন মনে হলো, আচ্ছা না গেলে কেমন হয়। এই আমি বেশ সুখে ছিলাম। কফি হাউসের আড্ডা, বন্ধুদের সঙ্গে তাস—বেশ তো কেটে যাচ্ছিল দিন। এগুলো তো এখন থেকে আমি মিস করবো। কি দরকার সুখে থাকতে ভূতের কিল খাওয়ার। সামনের সপ্তাহে একটা ভালো ছবি রিলিজ করবে, সেটাও তো দেখা হবে না। কথাটা খুব সিরিয়াসলি বলে ফেলতেই সবাই হৈ হৈ করে উঠল। হয় আমি ঠাট্টা করছি নয় মাথা খারাপ হয়েছে। এই জন্যেই বাঙালির কিছুই হয় না। জাতটা ঘরকুনো রয়ে গেল এই কারণেই। এতো ইমোশনাল। কিন্তু বোর্ডিং কার্ড হাতে নেওয়ার পর দেখা গেল সেই মুখগুলোই গম্ভীর। যেন কথা বলতে পারছে না কেউ। প্লেনটা দাঁড়িয়েছিল খুব কাছাকাছি। রানওয়ের ওপর দিয়ে হেঁটে সিঁড়ির কাছে পৌঁছে অনেকদিন বাদে কলকাতার আকাশ দেখলাম। যারা বলেন পৃথিবীর সব আকাশের চেহারা এক তারা সত্যি কথা বলেন না। জলপাইগুড়ির আকাশ এমন পুরোন ছবির মতো হয়ে থাকে না। তবু মনে হলো এই আকাশ আমি আর দেখবো না। মুখ ফিরিয়ে দূরের ব্যালকনিতে দাঁড়ানো আন্দোলিত হাতগুলো দেখলাম। ওখানে এতো মানুষের ভিড় যে স্বজনদের আলাদা করে চেনা যায় না। কেমন একটা শূন্যতা নিয়ে নিজের সিটে গিয়ে বসলাম। দরজা বন্ধ হলো। ইঞ্জিন চালু হবার পর প্লেনের চাকা গড়াতে লাগলো। ততক্ষণে সন্ধের অন্ধকার দমদমকে ঢেকে ফেলেছে। হঠাৎ মনে হলো জলপাইগুড়ি থেকে প্রথমবার কল-

কাতায় আসার সন্ধ্যায় হু হু করে ছুটে যাওয়া ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে পরিচিত দৃশ্যগুলোকে পেছনে সরে যেতে দেখেছিলাম। চোখের জল শেষ পর্যন্ত আড়াল হয়ে গিয়েছিলো। আর এ যেন চোখে ঠুলি পরে বসে থাকা। শুধু আচমকা নিচের রক্তচক্ষু আলোগুলো শেষবার জানিয়ে দিয়ে গেল তুমি আর কলকাতার নও।

সন্ধের পরেও দিল্লিতে বড় অভিমানী আবহাওয়া থাকে। মালপত্র সংগ্রহ করে ট্যাক্সিতে বসে মনে হলো আমি বিদেশে এসে গেছি। এতো চওড়া চওড়া রাস্তা, সুন্দর আলোর সারি, চারপাশে নির্জনতা ছড়ানো—বাঙালি কবে পাবে? ট্যাক্সিওয়ালাকে দুবার বললাম হোটেলটির নাম। শেষপর্যন্ত লোকটি আমাকে একবার ঘুরে দেখল। গেট পেরিয়ে বিরাট বাঁধানো চাতালের ওপর ঘুমিয়ে থাকা সার সার গাড়ির মিছিল ডিঙিয়ে হোটেলের দরজায় পৌঁছাতেই সুবেশ একটি লোক ঢাউস সেলাম দিল। ট্যাক্সিওয়ালা জানতে চাইল ভাড়া আমি দেব না হোটেল থেকে নিতে হবে। উত্তরটা শুনে লোকটা মোটেই খুশি হলো না। স্যুটকেশ নিয়ে যখন ঝকঝকে সিঁড়ি ভাঙছি তখন সুবেশ লোকটি পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, 'আপনার যদি খুব অসুবিধে না হয় তাহলে ওটা আমার কাছে ছেড়ে যেতে পারেন।' হকচকিয়ে গেলাম। হোটেলের পোর্টারটি তো আমার থেকেও স্মার্ট। হাতছাড়া করতেই লোকটি থ্যাঙ্কু বলে ওটাকে নিয়ে ভেতরে এগিয়ে গেল। ঘোরানো কাঁচের দরজা ঠেলে মনে হলো কোনো কার্নিভালে এসে পড়েছি। পাঁচতারা হোটেল বলতে কয়েকবার গ্রান্ড হোটেলে গিয়েছি। সেখানেও এ দৃশ্য দেখিনি। খুব দামী দামী পোশাকের মেয়ে পুরুষ চারটে টেনিস কোর্টের মতো হলঘরে দাঁড়িয়ে গপ্পো করছেন। লাল নীল আলো জলছে। গোটা পাঁচেক রেস্টুরেন্টের নাম দেওয়ালগুলোয় জ্বলছে। বাজনা বাজছে স্পিকারে। রিসেপশনিস্ট ভদ্রমহিলা আমার টিকিট এবং কুপন দেখে একদম পাত্তা না দিয়ে আর একজনকে বলতে লাগলেন একটু আগে রাজেশ খান্না তাঁর সঙ্গে কি ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন। শেষ করলেন, 'হি ইজ সো সুইট ইউ নো'। শেষ পর্যন্ত আমার তৈরি করা ইংরেজিতে তাঁকে বললাম, 'আমি কি একটা ঘর পেতে পারি?' তিনি মাথা নোয়ালেন ঈষৎ, 'ও, সিওর। আপনি প্যান অ্যাম ফ্লাইট ধরবেন তো? ঠিক আছে, আপনাকে দুটোর সময় ডেকে দেওয়া হবে। এই নিন ডিনার কুপন। নিচের যে কোনো রেস্টুরেন্টে এই কুপন দেখালে খেতে দেবে। তবে আশি টাকার মধ্যে খেতে হবে প্লিজ। এই নিন চাবি। এখানে সই করুন। রাতটায় চমৎকার ঘুম হোক আপনার।' একটা বিরাট এবং ভারি চাবি নিয়ে যে লিফটে উঠলাম তাতে যাত্রী আমি একা। চাবির গায়ে ফ্লোরের নম্বর পড়ে বোতাম টিপে ছিলাম। সুদৃশ্য সেই বাক্সের তিনধারে আয়না। তিন সমরেশ আমার দিকে তাকিয়ে। এখনও আমার পরনে মহম্মদ আমিনের তৈরি প্যান্ট সার্ট যা পরে কফি হাউসে আড্ডা দিতাম। হঠাৎ মনে হলো এই তিন আমি খুব একটা পাল্টাইনি। ওই যে ভ্রুর ওপরে কাটা দাগটা যা চা বাগানে তৈরি হয়েছিলো শৈশবে তা এখনও স্পষ্ট। বরং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টতর

হচ্ছে। দরজা খুলে গেল আপনা আপনি। লম্বা করিডোর নির্জন, দু'পাশে ঘরের দরজায় নম্বর সাঁটা। খুঁজে পেতে সময় লাগল। দরজা খুলে ভেতরে পা দিতেই নীল আলোয় দেখতে পেলাম সুদৃশ্য একটি বিছানা ধবধব করছে। সবকটা আলো জেবলে দিয়ে জুতো শুদ্ধু শুয়ে থাকলাম খানিক। এই আমি দিল্লির পাঁচতারা হোটেলে, একা। আমার মাথার পাশে টেলিফোন। বাঁ দিকে রঙিন টি ভি সেট। ওপাশে কায়দাদুরস্ত বাথরুম। টেবিলে অ্যাশট্রের ভেতর হোটেলের বিজ্ঞাপন ছাপা দেশলাই। দরজায় শব্দ হলো। বেয়ারাটি স্যুটকেশ নামিয়ে হাসল, 'আপনার ফ্লাইট ভোরে?' 'হ্যাঁ'। লোকটা হাসছে কেন? লোকটা মাথা নাড়ল, 'কোনো চিন্তা করবেন না, দুটোর সময় আপনাকে উঠিয়ে দেব আমি। চটপট খেয়ে শুয়ে পড়ুন।' লোকটা চলে গেল।

ঠিক বুঝতে পারছিলাম না ঘণ্টা চার সাড়ে চারের মধ্যে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমিয়ে নিয়ে কি করে তৈরি হব। বন্ধুবান্ধব থাকলে রাত জাগা যেত। দিল্লীতে মুখার্জির কথা মনে পড়ল। ওর টেলিফোন নম্বরও সঙ্গে আছে। কিন্তু ফোন করলেও তো এতদূরে আসতে পারবে না। আচ্ছা, ভালো করে দাড়ি কামিয়ে স্নান করলে কেমন হয়! বাথরুমে ঢুকলাম। কল্যাণ বলেছিল যেসব হোটেলে আমি থাকব তার বাথরুমের বাক্স থেকে একটা করে সাবান যেন স্যুভেনির হিসেবে নিয়ে আসি। অনেকে নাকি তোয়ালেও নিয়ে যায়। কিন্তু এত প্রসাধনী দ্রব্য, এত সাবান সামনে, কেমন বোকা বোকা লাগলো নিজেকে। এমন কি দাড়ি কামাবার নতুন সরঞ্জামও সামনে রাখা।

পুরোদস্তুর আগামীকালের জন্যে তৈরি হয়ে নিচে নামলাম। মোগল রান্নার রেস্টুরেণ্টে ঢুকতেই যিনি ছুটে এলেন তাঁর রোজগার নিশ্চয়ই আমার পাঁচগুণ। অর্ডার নেবার খাতা সঙ্গে না থাকলে বুঝতেই পারতাম না ভদ্রলোকের চাকরিটা কি! দুটো খাবার বলতেই আশি টাকা হয়ে গেল। সেটা পরিবেশিত হবার পর মনে হলো নিজের টাকায় এ জীবনে হয়তো কখনই এখানে খাওয়া হবে না। আমার পাশের টেবিলে যে সুন্দরী পাঞ্জাবি মহিলা এত রাত্রে ছটা পদ নিয়ে নষ্ট করছেন তাঁর স্বামীর টাকার পরিমাণ কত?

বঙ্গ সন্তানের একটা বড় খারাপ স্বভাব তারা সবসময় টাকার হিসেব করে। ফলে টাকাটাও থাকে না আবার উপভোগ করাও হয়ে ওঠে না। ঘরে ফিরে ক্রমে মনে হলো পেট ভরেনি। কিন্তু আমার পকেটে এখন সাকুল্যে ভারতীয় টাকা বেশি নেই। শুনেছি এয়ার পোর্ট ট্যাক্স লাগবে একশ আর আঠারো উনিশ ডলার পথ খরচা বাবদ পাওয়া যাবে বোর্ডিং কার্ড দেখালে তার জন্যেও রাখা আছে। কিন্তু তার বাইরে উদ্বৃত্ত সামান্য। বিদেশে তো এটাকা আর পেপার ন্যাপকিনের দাম এক। টি ভিটা খুলব খুলব করেও খোলা হলো না। আলো জ্বালিয়ে রেখেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। হাতের ঠেলায় ঘুম ভাঙল। ধড়মড়িয়ে উঠে দেখি সেই বেয়ারাটি সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে, 'সাব, টেলিফোনকো রিঙমে আপকো নিদ নেহি টুটা। দরয়াজামে নক কিয়া থা ফিরভি আপ নেহি শুনা। ওহি লিয়ে কামরামে আনা পড়া।'

এদের কাছেও যে চাবি থাকে খেয়াল ছিল না। ঘড়িতে এখন দুটো দশ। বললাম আমি তৈরি। কিন্তু মজা হলো এই সাড়ে চার ঘণ্টায় দেখছি ঘরময় ছড়িয়ে রেখেছি ঘড়ি, সিগারেট, টুকিটাকি। মানুষ যেখানে একটু বসে সেখানেই কি শেকড় গাড়ে। স্যুটকেশ নিয়ে বেয়ারা নিচে নেমে গেল। আর আশ্চর্য, এই ঘরটা ছেড়ে যেতে আমার খারাপ লাগছে? যে ঘরে জীবনে ঢুকিনি, কখনও ঢুকব না তার জন্যে মায়া? মনে হচ্ছে কেন এই আমার শেষ ঘর? একি ভারত-বর্ষ ছেড়ে চলে যাচ্ছি বলে?

নিচের কাউণ্টারে বিস্ময় জমা ছিল। সেই মহিলা মাঝরাতের ডিউটিতে নেই। যে পুরুষটি আছেন তিনি মেশিনের চাবি টিপে টিপে আমাকে ছেষট্টি টাকা দিতে বললেন। অপরাধ জিজ্ঞাসা করতে তিনি জানালেন যে খাবার খেয়েছি তার দাম ট্যাক্স নিয়ে একশ টাকা। অতএব কুড়ি টাকা বেশি হয়েছে সেখানে। আটটা টেলিফোন করেছি। এর জন্যে ষোল টাকা। আর টি ভি দেখার জন্য তিরিশ। একেবারে শ্যামবাজারি ভাষায় প্রতিবাদ করলাম টেলিফোন এবং টি ভি আমি স্পর্শ করিনি। থতমত হয়ে গিয়ে লোকটি আবার মেশিন দেখে জানাল সবাই করে তাই একটা এভারেজ করে নিয়ে আমার ওপর চাপানো হয়েছিলো। ঠিক আছে, আমি কুড়ি টাকা দিয়েই পার পেতে পারি। বেয়ারাটিকে দশ টাকা বকশিস দিতে খুব খারাপ লাগছিলো। ওর ভূমিকাটা ঈশ্বরের মতো। যদি দুটোর বদলে পাঁচটায় জাগাতো তাহলে আর বিদেশে যেতে হতো না। কিন্তু এর বেশি দিতে যে আমিই পারি না। অভ্যেস বলেও তো একট কথা আছে।

ফেরার ট্যাক্সি ভাড়াটা চেয়ে আনার কথা খেয়াল ছিল না। ফলে পকেট আরও হালকা হলো। এখন প্রায় তিনটে বাজে। কিন্তু এয়ারপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে দিনদুপুর। আন্তর্জাতিক এই এয়ারপোর্টের ভিড় দেখে চক্ষু চড়ক গাছ। সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার জন্যে মানুষরা বিভিন্ন কাউণ্টারের সামনে ভিড় করেছে। প্যান এ্যামের কাউণ্টারের ভদ্রলোক স্যুটকেশ নিয়ে নিলেন। ওটা আমি ফেরত পাব নিউইয়র্কে। বোর্ডিং কার্ড নেওয়া মাত্র একটি লোক এগিয়ে এল কাছে। আপনি কি নিউইয়র্ক যাচ্ছেন? গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লাম। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলো, 'সেখানে কেউ আছে?' আবার মাথা নাড়লাম। লোকটি যেন নিশ্চিন্ত হলো, 'তাহলে এই উনিশ ডলারের দরকার নেই আপনার। আপনি যদি আমাকে ডলারটা ক্যাশ করে দিয়ে দেন তাহলে খুব উপকার হয়।' এখন পর্যন্ত ডলার নিজের চোখে দেখিনি। সঙ্গে আছে ট্রাভেলার্স চেক। কলকাতার মানি এক্সচেঞ্জে ডলার ক্যাশে দিতে পারেনি। শুনেছি আমি যে ক্লাশে যাচ্ছি সেখানে একটা বিয়ার কিনতে হলে ডলার দিতে হয়। ডলারের নোট চোখে দেখার আগ্রহ ছিলো। তাই লোকটিকে নিরাশ করতে হলো। একটা খাঁচার মধ্যে বসা ভদ্রলোকের দেওয়া কাগজে সইটই করে টাকা দিয়ে ডলার যখন হাতে পেলাম তখন হঠাৎ একটা কার্টুনের কথা মনে পড়ল। সম্ভবত অমৃতবাজারে বেরিয়েছিলো সেটা। পাঁচজন ভারতীয় মানে একজন আমেরিকান। কারণ তখন পাঁচটাকার একটা ডলার পাওয়া যেত। এখন সংখ্যাটা ডাবলের বেশি হয়ে গেছে। এ ডলার

দেখলেই বোঝা যায় আমেরিকানরা কি শক্তিশালী !

মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছিল প্যান এ্যামের যেসব যাত্রী নিউইয়র্ক যাবেন তাঁরা যেন অবিলম্বে ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনক্লোজারের দিকে এগিয়ে যান। এখন আমি ঝাড়া হাত পা। শুধু কাঁধে একটা হালকা চামড়ার ব্যাগ যাতে কাগজপত্র পাসপোর্ট এবং ডলারের চেকগুলো রেখেছি। পাসপোর্টে ছাপ পড়ল। কোনো প্রশ্ন শুনলাম না। শুধু ও'রা যন্ত্রে আমার পাসপোর্টের নম্বরটা তুলে দেখে নিলেন আমার নামে কোনো অভিযোগ আছে কিনা। আরও এগিয়ে যাও। সামনেই কাস্টমস এনক্লোজার। অফিসাররা শান্তমুখে যেতে দেখছেন যাত্রী-দের ! হঠাৎ এক ভদ্রমহিলাকে মিষ্টি গলায় বললেন এক অফিসার, 'আপনার হাতব্যাগ একটু খুলবেন।' ভদ্রমহিলা থতমত হয়ে বললেন, 'কেন ?'

'আমরা একটু দেখব'। অফিসার আমার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। মন খারাপ হয়ে গেল। এরা আমাকে পাত্তাও দিলো না ? ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম ও'রা ভদ্রমহিলার ব্যাগ থেকে গোছা গোছা ডলার বের করছেন। এরপর সিকিউরিটির লোকেরা আমাকে পরীক্ষা করবেন। সংগে কোনো অস্ত্র আছে কিনা যাচাই করবেন। কিন্তু ভদ্রলোক বললেন, 'করছেন কি আপনার সংগে একটা ব্যাগ আছে তাতে লাগেজ ট্যাগ লাগাননি ?' তাড়াতাড়ি একটা লাগিয়ে আনুন প্যান এ্যামের কাউণ্টার থেকে।'

কিন্তু আমি চলে এসেছি অনেক ভেতরে। দু'দুটো পাহারাদার পেরিয়ে। সেখানে আবার যেতে দেবে ? একজন অফিসারকে সেটা জিজ্ঞাসা করতে তিনি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে চলে গেলেন। সামনে পেছনে ইলেকট্রনিক বোর্ডে বিভিন্ন ফ্লাইটের নম্বর জ্বলছে। আমারটা তো ডাকাডাকি শুরু করবে এখনই। যা হবার হবে এমন ভঙ্গিতে নেমে এলাম কাস্টমস এনক্লোজারে। কারো সংগে কথা না বলে হেঁটে ঢুকলাম ইমিগ্রেশন এরিয়ায়। গট গট করে বেরিয়ে এলাম লম্বা হল ঘরটায় যেখানে বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের কাউণ্টার। প্যান এ্যামের লোকটি আমায় দেখে বললেন, 'কি সর্বনাশ। আপনি এখনও এখানে ? যাবেন না নাকি ?' বললাম, 'এই ক্ষুদ্র ব্যাগটা যে আপনাদের ফ্লাইটে যাচ্ছে তার একটা পরিচয় পত্র দেবেন?' ঘনঘন মাথা নেড়ে ভদ্রলোক বললেন, 'সেটা তো তখনই বলতে পারতেন। যান ছুটে যান।'

ট্যাগটা ব্যাগের স্ট্র্যাপের গায়ে গলাতে গলাতে আবার ইমিগ্রেশনের এলাকায় চলে এলাম। ও'রা মুখ তুলে তাকাতেই চিৎকার করলাম, 'ট্যাগ আনতে গিয়ে-ছিলাম।' আশ্চর্য কেউ আমাকে আটকালো না। কাস্টমস এনক্লোজারে পৌঁছা-তেই বলে উঠলাম, 'আমার প্লেন ছেড়ে যাচ্ছে। দাঁড়াতে পারব না।' ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, 'কে আপনাকে দাঁড়াতে বলেছে ?' সিকিউরিটির লোক-জন শরীর ছেঁকে আমার ব্যাগ এক্সরে মেশিন থেকে বের করে বললেন, দৌড়ে যান।'

আমি দৌড়লাম। যেন শেষ তরী চলে যাচ্ছে আমাকে ছেড়ে। বিশাল রান-ওয়েতে অনেক প্লেন দাঁড়িয়ে। কোনটে নিউইয়র্ক যাবে ? কে আমাকে নিয়ে

যাবে ? প্যান এ্যামের নাম দেখে এগিয়ে গেলাম একটার দিকে, 'এটা কি নিউ-ইয়র্ক যাবে ?'
সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে যিনি বোর্ডিং কার্ড পরীক্ষা করছিলেন প্যান এ্যামের উর্দি পরে তিনি বললেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ?' প্রশ্নটা পরিষ্কার বাংলায়।
'এই একটু দেরি হয়ে গেল।' হাসলাম।
'হাসবেন না। এই জন্যে বাঙালির কিছু হয় না। এটা কি নিউইয়র্ক যাবে ? এমন ভাবে প্রশ্ন করছেন যেন এটা বাস। ল্যান্সডাউন যাবার মতো। উঠে পড়ুন।' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই শ্বেতাঙ্গিনীকে দেখতে পেলাম। হাত জোড় করে বললেন, 'গুড মর্নিং।' তখনও আমার মাথার ওপর ময়ূরকণ্ঠী আকাশ। হলদে তারাগুলো নিভবো নিভবো করছে। দিল্লীতে ভোর আসছে। চারটে বাজতে সামান্য দেরি। দিল্লি, মানে ভারতবর্ষের সকাল একটু বাদেই হবে। মুখ ঘুরিয়ে আর একটু যে দেখব তার উপায় নেই। সুন্দরী বললেন, 'ভেতরে আসুন প্লিজ।'
এত বিশাল প্লেন আমি কি স্বপ্নে দেখেছি ? যার তিনটে শ্রেণী যাদের তিন-রকমের টিকিট কেনার সামর্থ্য আছে। আমি চলে এলাম একদম শেষ প্রান্তে। আমাদের শ্যামপার্কের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত হবে। আমার পাশের সিট ফাঁকা। বসতে না বসতেই সিট বেল্ট বাঁধার হুকুম। পৃথিবীর সমস্ত বিমান কোম্পানির গৃহীত নীতি অনুযায়ী সুন্দরীরা দেখাতে লাগলেন কিভাবে বেল্ট বাঁধতে হয়। অক্সিজেন মাস্ক কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। আমি তখন জানলা দিয়ে এয়ার-পোর্ট দেখছি। দিল্লির গায়ে এখনও অন্ধকার। এবার প্লেন নড়ে উঠল। লাল সবুজ আলোর চোখগুলো ঘুরতে লাগলো। আর তারপর আকাশ টানতে লাগলো প্লেনটাকে। একঘণ্টা আমি আকাশ দেখলাম। কতো রঙ সেখানে। মাঝ আকাশে কি করে রাত ভোর হয়। কিভাবে সূর্য রাঙিন করে মেঘগুলোকে। তিরিশ হাজার ফুট উঁচুতে মানুষের হাত যেহেতু নোংরা ছড়ায় না তাই ওই ভোর ভোর হওয়া সময়টা একটা রঙের বাগান হয়ে বসে থাকে।
এর মধ্যে সুন্দরী এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পাশে, 'আপনি বেল্ট বেঁধে নিন। আমরা নামছি।'
'নামছি ? এর মধ্যেই ?' প্রশ্নটা শুনে মহিলা খিলখিলয়ে হেসে উঠলেন। বললেন, 'নটি'। বলে চলে গেলেন। কথাটা কোন পরিপ্রেক্ষিতে বললেন বোধ-গম্য হলো না। তবে সুন্দরী মেয়েদের হাসতে দেখলে আমার খুব ভালো লাগে। মনে পড়ল প্লেন ছাড়ার সময় এটাকে কোমরে বাঁধা হয়নি। সুন্দর বেল্টের গায়ে হাত রেখে মনে হলো এই বস্তুটি আজ অবধি কতো মোটা সরু মাঝারি কোমর জড়িয়ে থেকেছে ? মহেশ্বর দাস বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ভাষা-তত্ত্ব পড়াতেন। বাংলা শব্দ ভান্ডারে বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ চ্যাপ্টারটা পড়াতে গিয়ে একদিন ক্লাশে প্রশ্ন করেছিলেন সে ধরনের কোনো শব্দ আমাদের জানা আছে কিনা। মহেশ্বরবাবুর ক্লাশ আমার কখনই ভালো লাগতো না। বৃষ্টি পড়ছিল বলে থেকে গিয়েছিলাম। হাত তুলতে উনি খুব অবাক হয়ে

বলেছিলেন, 'ও তুমিও জান। বলো বলে ফেল।' আমি গম্ভীর গলায় উত্তরটা দিয়েছিলাম, 'সরু নরম গরম কোমর পছন্দ।' ক্লাশের সবাই এমন প্রাণখোলা হেসেছিলো যে মহেশ্বরবাবু শুধু মুখ লাল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিরিশ সেকেন্ড। তারপর রাগত গলায় বলেছিলেন, 'ব্যাটাছেলের কোমর কখনও সরু হয় না। তোমার উত্তরে আদি রসের প্রাধান্য আছে। কিন্তু প্রতিটি শব্দ যেহেতু বিদেশি ভাষা থেকে এসেছে তাই শাস্তি কমিয়ে দিলাম। তুমি এই ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যাও।'

তারপর থেকেই আমার ধারণা হয়েছিল সরু কোমর মানেই বিদেশি মেয়ে। এদেশের মেয়েদের কোমর, যেটুকু বাইরে থেকে দেখা যায়, সরু বলা যায় না। প্লেনের এই সিট বেল্টটাকে যে অবধি ছোট করা যায় সেই মাপের কোমর কোনো ভারতীয় মেয়ের হলে তাকে মন্বন্তরী বলতে হবে। বেল্ট নিয়ে ভাবনাটা চলে গেল কারণ চোখের সামনে প্লেন থামতেই এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর নামটা দেখতে পেলাম। সবে ভোর হয়েছে করাচীতে। যাত্রীরা এগিয়ে আসছেন এই প্লেন ধরতে। আমি এখন তাহলে পাকিস্তানে দাঁড়িয়ে। পাকিস্তান সম্পর্কে আমার তেমন আগ্রহ নেই। প্লেনে যাঁরা উঠছেন তাঁদের সঙ্গে ভারতীয়দের চেহারার কোনো পার্থক্য নেই। সিট খোঁজার সময় ওঁরা নিজেদের মধ্যে কথাও বলছেন হিন্দিতে। একান্নবর্তী পরিবারের দুটি সদস্য আলাদা বাড়ি নিয়েছে, এই মাত্র। নড়ে চড়ে বসলাম। আমার পাশে যিনি বসলেন তাঁর মুখ দেখার কোনো সুযোগ নেই। বোরখার আড়াল সত্ত্বেও বুঝতে পারছি বপুটি বিরাটত্বে অসাধারণ। একাধিক হাত ব্যাগ ছাড়াও ছোট একটি স্যুটকেস নিয়ে এসেছেন তিনি। মাথার ওপরে সেগুলো চালান করে দিয়ে সিটে বসে বেল্টটা কোমরে বাঁধতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ওঁর আগে যিনি ব্যবহার করেছিলেন তাঁর কোমর ছিল মাঝারি। এঁকে অনেকটা চওড়া করতে হলো। বাঁধাবাঁধি হয়ে গেলে স্থির হলেন তিনি। সন্ত্রস্ত হয়ে বসে আছি। প্লেন আবার জমি ছাড়ল। এবার একটানা অনেক ঘণ্টা। এ মহাদেশ পেরিয়ে ও মহাদেশ। প্লেন থামবে ফ্রাঙ্কফুর্টে।
ব্রেকফাস্ট এল। লাঞ্চ না হলেও মনে হচ্ছে চলবে। আড়চোখে দেখলাম খাবারগুলো বোরখাধারিণী কি সুকৌশলে ভেতরে চালান করে দিচ্ছেন অথচ ওঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না। খাওয়া শেষ করে তিনি স্যুটকেস নিয়ে বাথরুমে চলে গেলেন। কালকের রাত খুব টেনশনে গিয়েছে কিন্তু এখন চোখে একদম ঘুম নেই। এয়ারহোস্টেস ইয়ারপ্লাগ দিয়ে গেলেন। হাতলের গর্তে লাগিয়ে চাবি ঘুরিয়ে গান বাজনা শোনা যাবে। একবার টয়লেট থেকে তাজা হয়ে এলে ওই গান শুনে যদি ঘুম আসে। পেট যখন ভরেই গেছে! প্যান এ্যামের এই ফ্লাইটে আর কি বাঙালি নেই? চারপাশে তাকিয়ে দেখতে দেখতে টয়লেটে চলে এলাম। খালি আলো জ্বলতে দেখে ভেতরে ঢুকেই সাবানগুলো দেখতে পেলাম। প্রায় চকোলেটের সাইজের রঙিন মোড়কে প্যান এ্যামের নাম ছাপা সাবান রয়েছে প্রচুর। কল্যাণ বলেছিল স্যুভেনির আনতে। গোটা চারেক নিলে কেমন হয়? ঠিক করলাম এখন নয়, নামবার আগে নিয়ে নেব। টয়লেটের বাইরে এসে

এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়ালাম। কয়েক'শ মানুষ যে যার নিজের সিটে বসে আছেন। সুন্দরীরা তাঁদের দেখাশোনা করছেন। একজন আমার কাছে এগিয়ে এসে আন্তরিক স্বরে শুধালেন, 'ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম'? হেসে মাথা নাড়লাম। হে বালিকা, আমার কি সমস্যা তা কি আমিই জানি? মাছ কি জানে সে সারাক্ষণ ভিজে থাকে? যেন ফুলের বাগানে বেড়াচ্ছি, এমন ভঙ্গিতে নিজের সিটের কাছে এসে গুলিয়ে ফেললাম। আমার সিট কোনটা? সেই বোরখা-ধারিণীকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। আশে পাশের সব মানুষের মুখই একরকম দেখাচ্ছে। মাথার ওপরে সাঁটা সিট নাম্বার মিলিয়ে থৈ পাচ্ছিলাম না। আমার সিটে বসে আছেন একজন সুন্দরী। তাঁর পরনে লাল জিনস, হলুদ গেঞ্জি। স্বাস্থ্যের প্রাবল্যে সেগুলো প্রায় বিদ্রোহ করার মুখে। মাথার চুলগুলো পালিশ করা যার প্রান্ত কাঁধ ছুঁয়েছে। মুখখানা একজিবিশনে প্রাইজ পাওয়া ডালিয়ার মতো। ইনি কোত্থেকে এলেন? কাছে এগিয়ে শুধালাম, 'এক্সকিউজ মি, আপনার সিট নাম্বার কত?' তিনি মুখে কিছু না বলে হাতের ইশারায় পাশের আসনে বসতে বললেন। কারণ ইতিমধ্যেই তিনি ইয়ারপ্লাগ গুঁজে দিয়েছেন কানে। সম্ভবত সুরমূর্চ্ছনায় মগ্ন। আমার জীবনে মেয়েদের কোনো শাসনের ভূমিকা নেই। পিতামহ এবং কিছু পরিমাণে পিতা ছাড়া আর কারো দ্বারা শাসিত হইনি। অতএব আপত্তির গলায় বললাম, 'এটা তো আমার সিট নয়।'

ইয়ারপ্লাগ খুলে মহিলা অত্যন্ত বিরক্তি নিয়ে তাকালেন, যেন এরকম বেরসিক পুরুষ এ জন্মে দ্যাখেন নি। বললেন, আরে বাবা, আমি একটু জানলার পাশে বসলে আপনার আপত্তি আছে? ওটা তো আমার সিট। করাচীতে বোর্ডিং কার্ড দেবার সময় বলল, 'উইন্ডো সিট দিল্লি থেকে ভরে আসছে।'

এমন হতভম্ব আমি জীবনে হইনি। সেই বোরখাধারিণী টয়লেটে গিয়ে এই রূপ ধারণ করেছেন? বোরখাটাকে দেখতে পাচ্ছি না। পিসীমা বলতেন কোনো মেয়েকে দুঃখ দিস না, মায়ের জাত। তাছাড়া প্লেনের ভেতরে জানলার পাশে আর প্যাসেজের পাশে তো তফাৎই বা কি? এটা তো আর টু বি বাস নয়। অতএব অত্যন্ত সন্তর্পণে মহিলার পাশে বসলাম। তিনি ইতিমধ্যে ইয়ারপ্লাগ কানে গুঁজেছেন। চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর স্পর্শ এড়াতে পারছি না। সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ ঝুপ করে আলো নিভতে লাগলো। যাদের পাশে জানলা খোলা ছিল তাদের সেগুলো বন্ধ করতে বলা হলো। ভি সি আর-এ ছবি দেখানো হলো, 'ডক্টর নো'। ইয়ার প্লাগ কানে গুঁজে সংলাপ শুনতে শুনতে সময় কাটিয়ে দিলাম ছবি দেখে। এর মধ্যে পার্শ্ববর্তিনী যে ছবি দেখার উত্তেজনায় কতটা হেলে পড়েছেন তা খেয়াল করেন নি। আলো জ্বলতেই বলে উঠলেন 'সরি।' পুরুষদের স্পর্শ পেলে যে সব মহিলা চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় বলে ভাবেন ইনি তাঁদের দলে কিনা বলে যখন ভাবছি তখন প্রশ্ন এল, আপনার সিটে বসেছি বলে খুব রাগ করছেন, না? আসলে আমি না জানলার ধারে ছাড়া একদম বসতে পারি না। দিল্লিতে থাকেন?'

একদম বোম্বাই হিন্দিতে কথা বলছিলেন মহিলা। মাথা নাড়লাম, 'না কলকাতা।'

'ভেরি ক্লাউডি সিটি তাই না? কবার টি ভি তে কলকাতা দেখিয়েছিল। ওঃ মাই গড।' মহিলা বললেন, আমি না কখনও ইন্ডিয়ায় যাইনি।'

'আপনি করাচীতে থাকেন?'

'ও নো! আমি থাকি শিকাগোয়। এখানে আমার শ্বশুরবাড়ি।'

'আপনি বোরখা পরে উঠেছিলেন তো—।'

'ওঃ নো। পাকিস্তানে এলে আমি বোরখা ছাড়া এক পা হাঁটি না। কেউ বলতে পারবে না আমাকে বেসরম। কিন্তু প্লেনে উঠেই আমি ওটা খুলে ফেলি। একটু ঘুমিয়ে নিলে আপনার আপত্তি আছে? সারারাত ঘুমাইনি।' হাই তুলে তিনি পাশ ফিরলেন।

জানলাটা হাত বাড়িয়ে খুললাম। এখনও আধো আঁধার কেন? সকাল তো অনেক আগেই হয়ে গেছে। তখনই ঘোষণা হলো ফ্রাঙ্কফুর্ট এসে যাবে আধ ঘন্টার মধ্যে। এখন জার্মানীতে সকাল সাতটা। নিজের ঘড়ি দেখে চমকে উঠলাম। এখন কলকাতার মানুষ দুপুরের স্নানের কথা ভাবছে।
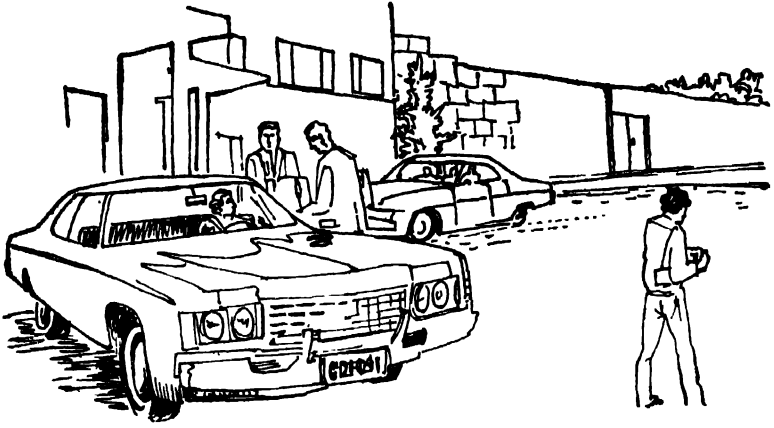
৩

ফ্র্যাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টকে আমি দুটো কারণে চিরকাল মনে রাখবো। আমরা যখন নেমেছিলাম তখন ওখানে সবে ভোর হয়েছে। ছায়া ছায়া আলস্য জড়ানো। টারম্যাক এত বিশাল সেখানে এত প্লেন দাঁড়িয়ে আছে তা আমি একসঙ্গে কখনও দেখিনি। আমার ঘড়ি এখন স্থানীয় সময় থেকে কয়েক ঘণ্টা এগিয়ে গেছে। বাইরের ঠাণ্ডা শীতকালে দার্জিলিং-এ গেলে পাওয়া যায়। কিন্তু প্লেনের দরজা থেকে টানেলের মধ্যে সেন্ট্রালি এয়ার কন্ডিশন এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এ ঢুকে যাওয়ায় আমার একটুও শীত করল না।

আমরা ট্রান্সিট প্যাসেঞ্জার। আমাদের থাকতে হবে একটি নির্দিষ্ট এলাকায়। আড়াই ঘণ্টা বাদে নিউইয়র্কের প্লেনে চাপতে হবে। এই এলাকটিতে ডিউটি ফ্রি শপের সংখ্যা সম্ভবত নিউমার্কেটের সব দোকানকেও ছাড়িয়ে যাবে। গোটা আটেক হাওড়া স্টেশন এর কাছে নস্যি। অন্তত বাইশটি গেট দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্লেনে যাত্রীরা ক্রমাগত যাওয়া-আসা করছে।

আমি এখন জার্মানিতে। অথচ ভিসা না থাকায় জার্মানির এমন একটা বাজারে যা পৃথিবীর সব বড় এয়ারপোর্টেই পাওয়া যাবে। ইউনিফর্ম পরা জার্মান এয়ারপোর্ট কর্মীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমার পেছন পেছন সেই পাকসুন্দরীও নেমে এসেছেন প্লেন থেকে। তিনি নেমেই আমায় বলেছেন, 'এই নিয়ে আমি আটবার ফ্র্যাঙ্কফুর্টে এলাম, জানেন? এত বোরিং!' আমার তাঁর সঙ্গে একমত হবার কোনো কারণ ছিল না। মালপত্র বিমান কোম্পানীর হেফাজতে। আমি

শুধু হালকা চামড়ার কাঁধব্যাগ নিয়ে হাঁটছি। প্রতিটি দোকানেই পৃথিবীর সেরা বিদেশী জিনিস। দেখেও সুখ। কয়েকজন দক্ষিণ ভারতীয়কে দেখলাম। আমায় আড়চোখে দেখে গেল। সুন্দরী আমার সঙ্গ ছাড়ছেন না। একটু বেশী কথা বললেও হাজার হোক আমরা তো অবিভক্ত ভারতবর্ষের মানুষ। রাশিয়ান মেয়েরা যদি মোটা হয় তো এঁর দোষ কি। রামচন্দ্র সেন বলতেন, 'বুঝলে চাঁদু, মেয়েদের শরীরে মাংস না থাকলে মেয়ে কিসের। খড়ম আবার জুতো নাকি!' রামদা এই পাকসুন্দরীকে দেখলে কী বলতেন জানি না তবে আমার অন্তত মনে হচ্ছে আমি একা নই। হিন্দিতে কথা বলছেন মানে কলকাতার ভাষায় কথা বলছেন। আজকাল তো রকের ছেলেরা হিন্দি সিনেমার ভাষায় কথা বলে।
সুন্দরীর হাতের ব্যাগে সম্ভবত বোরখাটি রয়েছে এখন। স্যুটকেস আর এক হাতে। কিন্তু তাতে তিনি দমে যাওয়ার পাত্রী নন। জার্মান রুপোর হারের সন্ধান করছেন দোকানে ঢুকে ঢুকে। আর প্রতিবারই আমাকে অনুরোধ করছেন একটু দাঁড়াতে। এই করতে করতে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আমাদের দরজা একেবারে শেষ প্রান্তে। অবশ্য তার হদিশ পাচ্ছি না এখনও। হঠাৎ সুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'জার্মান বিয়ার খাবেন?' হেসে ফেললাম। তাতে সুন্দরী আরও উৎসাহিত হলেন। বললেন, 'জার্মানিতে এলে জার্মান বিয়ার খেতে হয়। এগুলো দেখুন আমি আসছি।' স্যুটকেস এবং ব্যাগ নামিয়ে রেখে পাশের দোকানে ঢুকে গেলেন তিনি তরতরিয়ে। কোনো মহিলা আজ পর্যন্ত আমাকে মদ খাওয়াননি। উনি কি নিজেও খাবেন? ওঁর ওই চেহারায় কি বিয়ার খাওয়া উচিত? এবং তখনই আমার রামচন্দ্র সেনের কথা মনে পড়ল। ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিস করতেন রামদা। গাড়িতে দুটো ফ্লাস্ক থাকতো। একটায় বিয়ার অন্যটায় হুইস্কি। এক দুপুরে গাড়িতে বসিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পেছনে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'খেয়ে দ্যাখো চাঁদু, খোদ জার্মান বিয়ার। বিয়ার খাবে জার্মানির, হুইস্কি স্কটল্যান্ডের, খাবার চীনের আর বউ জাপানের। অত সেবাযত্ন কেউ করবে না। চেহারাও গোলগাল।' তা বিয়ারে চুমুক দিয়ে গা গুলিয়ে উঠেছিল। এখন ইনি সেই জার্মান বিয়ার খাওয়াবেন। ভোরবেলায় মদ খাওয়া উচিত? বিনি পয়সায় যারা আয়োডিন খায় আমি সেই দলে নই। খুব নামকরা কবি বা সাংবাদিককে দেখেছি অন্যের দেওয়া পার্টিতে গিয়ে নির্লজ্জের মতো মাছ হয়ে মদে সাঁতার কাটেন। পরের পয়সায় মদ খেতে সম্ভবত কিছু মানুষের এক ধরনের স্যাডিস্ট সুখ হয়।
এই সময় মহিলা বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে একটি ঢাউস ব্যাগ তাতে চার বোতল হুইস্কি। আর এক হাতে দুটো বিয়ারের ক্যান। বললেন 'খেয়ে নিন।'
মাথা নাড়লাম, 'সকালবেলায় মদ খাওয়া আমার শরীরে পারমিট করবে না।'
'দূর'। মহিলা ঠোঁট বাঁকালেন, 'বিয়ার আবার মদ নাকি! পাকিস্তানে তো মেয়েরা লুকিয়ে চুরিয়ে খায়। আসুন এখানে আমরা প্রকাশ্যে খাই।' একটি টিন আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে অন্যটির মুখ খুলে যেই মুখগহ্বরে ঢালতে যাচ্ছেন তখনই কান্ডটা ঘটল।

এক ভদ্রলোক ঢাউস ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে উইনডো শপিং করতে করতে হাঁট-ছিলেন। শো-কেসের জিনিসে তিনি এমন মগ্ন ছিলেন যে মহিলার কথা খেয়াল ছিল না তাঁর। ফলে তাঁর ব্যাগ এসে ধাক্কা মারল মহিলার নিতম্বে। ক্যান থেকে তখন পানীয় বেরিয়ে আসছিল। হাত এবং শরীর নড়ে যাওয়ায় তা ছিটকে পড়ল মহিলার মাথায় এবং মেঝেতে। অপ্রস্তুত হয়ে ভদ্রলোক ভাঙা ইংরেজিতে বোঝাতে চাইলেন, তিনি সত্যিই দুঃখিত।
সেই সময় আমি পাঁচুর মাকে দেখতে পেলাম। শ্যামপুকুরের বারোয়ারী ঝি পাঁচুর মা রণমূর্তি ধারণ করলে যে গলায় চেঁচান অবিকল একই গলায় পাক-সুন্দরী ইংরেজি ভুলে হিন্দিতে বুলেট ছুঁড়তে লাগলেন, ‘উঃ মাগো। চোখের মাথা খেয়েছে নাকি? মেয়েছেলের শরীরে ঠেলা দিয়ে দাঁত বের করে হাসা হচ্ছে? সামনে মেয়েছেলে আছে দেখতে পান না? বাড়িতে মা বোন নেই?’
ভদ্রলোক আমাদের অবোধ্য ভাষায় কিছু বোঝাতে চাইছেন। বিয়ার ভেজা চুল দেখে আমার খারাপ লাগছিল কিন্তু শেষ কথাটা শুনে হাসি চাপতে পারলাম না। কলেজ স্ট্রিটের একটি প্রাইভেট বাসে ষাট বছরের এক বৃদ্ধার গায়ে ধাক্কা মেরেছিল বলে তিনি একটি যুবককে ধমকে ছিলেন, ‘মেয়েছেলেকে ধাক্কা মারা হচ্ছে? বাড়িতে মা বোন নেই?’
সুন্দরী আমার হাসি দেখে ফেলেছিলেন। বললেন, ‘আপনি হাসছেন? আপনার কষ্ট হচ্ছে না?
‘হচ্ছে।’ তড়িঘড়ি গম্ভীর হলাম।
সুন্দরী যখন আবার সেই ভদ্রলোকের ওপর বাক্যবাণ বর্ষণ করছেন তখন এক-জন ইউনিফর্ম পরা জার্মান আমার পাশে এসে নিচু গলায় ইংরেজিতে বলল, ‘আপনার স্ত্রী সম্ভবত খুব রেগে গেছেন। ওকে একটু ঠান্ডা করুন। উনি তো আর ইচ্ছে করে ধাক্কা দেননি। খামোকা চেঁচিয়ে কি লাভ?’ কথাটা কানে যাওয়া মাত্র চোখ দুটো বোধহয় রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। তবু আচমকা জিজ্ঞাসা করলাম, ‘উনি যে আমার স্ত্রী তা বুঝলেন কী করে?’
অফিসার হাসল, ‘আপনি সঙ্গে আছেন বলেই তো উনি এতো চেঁচাচ্ছেন। মেয়েরা স্বামীর কাছে সবসময় অনেস্ট প্রমাণ করতে চায়। নিজের স্ত্রীকে দেখে বুঝেছি মশাই।’
কলকাতা হলে এতক্ষণে চমৎকার ভিড় জমে যেত কিন্তু এখানে যাতায়াতের সময় কেউ কেউ হাসিমুখে তাকাচ্ছে মাত্র। অফিসারকে বললাম, উনি আমার স্ত্রী নন। আপনার ধারণা ভুল।’ ‘আই সি’। চলে যাওয়ার আগে চিন্তিত ভদ্রলোক বললেন, ‘আই অ্যাম সরি ফর ইউর লাক।’
পাঁচুর মায়ের জ্বালা কিছুতেই মিটতো না। সকালে ঝগড়া হলে বিকেলেও নিজের মনে বকবক করত। ইনি অবশ্য অতটা গেলেন না। রুমালে মুখ মুছে বিয়ারের খোলা ক্যানটা আমার হাতে ধরিয়ে পাশের দরজার দিকে ছুটে গেলেন। সেখানে মহিলার ছবি আঁকা আছে। সেই সুযোগে বিব্রত ভদ্রলোক উধাও। মাইকে ঘন ঘন ঘোষণা চলছে। লন্ডন চলো, প্যারিস চলো। দিনের আলোকে হার মানানো

আলোয় সাজানো আধ মাইল লম্বা ট্রাঞ্জিট লাউঞ্জে যেন বইমেলা বসে গেছে আর আমি পরিবার নিয়ে দেওঘরযাত্রী একবাঙালি কেরানীর মতো মালপত্র সামলাচ্ছি। হাতের খোলা বিয়ার ক্যানটার দিকে নজর পড়ল। অনেকটা পড়ে গেলেও তিন-ভাগ তো রয়েছেই। একা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার চাইতে মুখে ঢালা ভালো। গলা দিয়ে নামানোর সময় মনে হলো ভিক্টোরিয়ার পেছনে যা খেয়েছিলাম তার সঙ্গে কোনো মিল নেই। বরং রাত জাগা শরীরটায় ঈষৎ আরাম ছড়িয়ে পড়ছে। বাকীটাকে ফেলে রাখলাম না। ক্যানটাকে দেওয়ালে টাঙানো আবর্জনার বাক্সে ফেলে দিতেই মহিলা এলেন। ইতিমধ্যে তিনি তার হৃতশ্রী অনেকটাই উদ্ধার করেছেন। জামার ভিজে দাগগুলো অবশ্য রয়েই গেছে। এসে হাত বাড়ালেই আমি দ্বিতীয় ক্যানটা এগিয়ে দিলাম। তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'হাউ নটি ইউ আর! খাবো না খাবো না বলে ঠিক খেয়ে নিয়েছেন।' আঙুলের চাপে ক্যানের মুখ খুলে গলায় ঢেলে তৃপ্ত হয়ে বললেন, 'এই পুরুষ জাতটা সত্যি উজবুক। না প্লিজ রাগ করবেন না। কানাকে কানা বলতে নেই কিন্তু উজবুককে উজবুক বলব না কেন বলুন। জানেন একবার ইতালিতে গিয়ে আমার কি অবস্থা? কেঁদে কুল্ পাই না। রাস্তায় যেই দ্যাখে সেই আমার পেছনে চিমটি কেটে যায়। চিৎকার করলে লোকে হাসে। তাবপর জানলাম কোনো মেয়ের সৌন্দর্যের প্রশংসা নাকি ওভাবেই করা হয়। পুরুষের মাথা ছাড়া কার মাথা থেকে এমন বদ মতলব বের হবে বলুন?' বিয়ারের ক্যানটাকে শেষ করে বাক্সে ফেলে তিনি মালপত্র আধাআধি করে নিলেন। নিয়ে বললেন, 'লোকটা কোন দেশের ছিল বলুন তো?'

স্বীকার করলাম, 'আমি ওঁর ভাষা বুঝতে পারিনি।'

প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসে মাঝখানে পেতে রাখা চেয়ারগুলোর একটায় বসলেন পাকসুন্দরী। বসে বললেন, 'এখানে বসুন। ওই যে দেখছেন প্যান এ্যামের ডেস্ক। ওখান দিয়েই আমাদের যেতে হবে। বোর্ডিং কার্ডটা ফ্যালেননি তো। ওইটে অবশ্য কোনো কাজে লাগবে না। নতুন করে বোর্ডিং কার্ড নিতে হবে। আগে করাচি থেকেই দুটো কার্ড পেতাম এখন এক নতুন ঢঙ হয়েছে।

হাতলছাড়া চেয়ারে ওঁর নিতম্ব আঁটছে না। একটি চেয়ার ছেড়ে বসলাম। এবং তখনই কানে এল পেছনের চেয়ার থেকে সংলাপ ভেসে আসছে এবং তা স্পষ্ট বাংলায়, 'সুভাষ বোস জার্মানিতে এসেছিলেন হিটলারের সাহায্য নিতে। ব্যাপারটা জানো?' দু মুহূর্তের নীরবতা। তারপরে গলার স্বর নিচে নামল, 'তোমার কি হয়েছে। তখন থেকে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছ?' আমাকে একটু একা থাকতে দাও, কথা বলতে ভালো লাগছে না।' মহিলার স্বর।

বাঙালি ছাড়া পথে বেরিয়েও এইরকম শীতল আর কোনো জাত হতে পারে আমার জানা নেই। মুখ ফিরিয়ে শ্রীমুখ দুটো দর্শন করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই পাকসুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আপনি বিয়ে করেছেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন বলুন তো?'

দেখে মনে হচ্ছে করেননি। বিবাহিত মানুষগুলো হাড়বজ্জাত হয়। আমার

হাজব্যান্ডকে তো দেখছি। এই যে আমি এতোদিন করাচিতে ছিলাম তাতে ওর খুব মজা। নিত্য নতুন সাদা চামড়ার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে চেষ্টা করবেন। আমি তো এবারে না জানিয়ে যাচ্ছি। একেবারে হাতে নাতে ধরলে তিনমাস ঠান্ডা থাকবে। আপনার মতো চুপচাপ মানুষ তিনি নন। আপনি সিগারেট দিন তো একটা।'

দুটি আঙুল বাড়ালেন মহিলা। প্রসঙ্গটা এত দ্রুত পাল্টে গেল যে বুঝতে সময় লাগল। আমি তখন প্যাকেট খুলছিলাম। একটা এগিয়ে দিতেই মহিলা বললেন, 'আগুনটা'। এটা ঠিক সেই গলায় যে গলায় চৌরঙ্গীতে বেকার টাইপের লোকরা সিগারেট ধরালেই সামনে এসে বলে। ধরিয়ে দিলাম। এক গাল ধোঁওয়া ছেড়ে মহিলা বললেন, 'করাচিতে সিগারেট খেতে দেখলে হৈ চৈ পড়ে যাবে। যেহেতু স্মোকিং ইনজুরিয়াস তাই কিছুদিন করাচিতে থেকে সিগারেট খাওয়ার অ্যাভারেজটা কমিয়ে আসি। ইন্ডিয়ান সিগারেট কিন্তু খারাপ নয়। আমি ইন্ডিয়া কিংস খেয়েছি। ওয়ান্ডারফুল। আপনি ওটা খান না কেন?'

উত্তর দিলাম না। কি করে বলি বিদেশে যাচ্ছি অন্যের টাকায়। সেই সত্যজিতবাবুর ছবি কাঞ্চনজঙ্ঘার নায়কের মতো অবস্থা আমার। ইন্ডিয়া কিংস খাওয়ার সামর্থ আমার নেই। মহিলা বোধহয় উত্তরের জন্য প্রশ্ন করেননি। চোখ বন্ধ করে ধোঁওয়া উপভোগ করছেন। উঠে দাঁড়ালাম আমি, 'আপনি বসুন। আমি একটু ঘুরে আসি।'

পাকসুন্দরী জানালেন যেহেতু সময় বেশি নেই তাই আমার দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসা উচিত। প্রায় ছিটকে সরে এলাম। মহিলা খারাপ নন। কিন্তু যাঁরা বেশি কথা বলতে ভালবাসেন তাঁরা অন্যের বিরক্তির পরিমাণটা বুঝতে পারেন না। পাকসুন্দরীর স্বামী দেবতাটির জন্যে আমার এখন কষ্ট হচ্ছে। বেচারা! কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলাম। একটা টয়লেটে ঢুকে পরিষ্কার হয়ে নিলাম। নিজেকে খুব খারাপ দেখাল না বিশাল আয়নায়। এরকম একটা ঝকঝকে টয়লেট কলকাতার মানুষ দু'দিনেই নিজের করে নেবে। শুধু হেঁটে যাওয়া। কারো সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলারও সুযোগ নেই। ঘড়িতে নজর করে খেয়াল হলো সময় আমার হাতে বাঁধা নেই। এইসময় আকাশবাণী হলো, নিউইয়র্কগামী প্যান এ্যামের প্যাসেঞ্জারদের বাইশ নম্বর গেটের দিকে যেতে বলা হচ্ছে। দূরত্বটা পেরিয়ে আসতে মিনিট পাঁচেক লাগল। এসে দেখলাম পাকসুন্দরী নেই। এমন কি পেছনে যে বাঙালি দম্পতি বসেছিলেন যাদের মুখ আমার দেখা হয়নি তারাও উধাও। একটু এগিয়ে প্যান এ্যামের ডেস্কের সামনে পৌঁছে দেখি সেখানে বিশাল লাইন পড়েছে এবং পাকসুন্দরী তাঁর দু'হাতে মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখতে পাওয়ামাত্র তিনি চিৎকার করে উঠলেন, এই যে, দশ মিনিট হলো। তাড়াতাড়ি চলে আসুন।' সামান্য সরে নিজের পাশে আমার জায়গা করে দিলেন তিনি। লাইন এগোচ্ছিল দ্রুত। সুন্দরী তাঁর বোর্ডিং কার্ড নিয়ে এগিয়ে গেলেন সিকিউরিটির দিকে। প্যান এ্যামের কর্মচারীটি হাত বাড়ালেন, 'ইওর টিকিট প্লিজ।'

ডান হাত দিয়ে বাঁ কাঁধে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগটা ছুঁতে গেলাম। আঙুলে শুধুই শূন্যতা। চমকে মুখ নিচু করলাম, ব্যাগটা নেই। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে গেল। এতক্ষণ তো ব্যাগটা আমার কাঁধে ছিল। আর ওই ব্যাগের ভেতরে আমার টিকিট, পাশপোর্ট, ট্র্যাভেলার্স চেক এবং দিল্লি এয়ারপোর্ট থেকে কেনা ডলারের নোটগুলো রাখা ছিল। প্যান এ্যামের লোকটি তাড়া দিলেন, 'টিকিট দেখান।' পেছনের লোকজন উসখুশ করছে। আমি কী করব বুঝতে পারছি না। ব্যাগ-টাকে আমি কখন শেষবার দেখেছি মনে করতে পারছি না। পাকসুন্দরীর পাশে বসে থাকার সময় হালকা ব্যাগটা চেয়ারের পাশে পড়ে যায়নি তো। কিছু একটা বলে, কী বলেছিলাম জানি না, দৌড়ে এলাম চেয়ারগুলোর সামনে। কোনো ব্যাগ নজরে আসছে না। আমি সেখানে বসেছিলাম সেখানে এখন এক শ্বেতাঙ্গিনী বসে। তাঁকে বিরক্ত না করে নিচু হয়ে দেখতে চাইলাম নিচে পড়ে আছে কিনা। তিনি 'হোয়াট ননসেন্স' বলে রেগে মেগে উঠে গেলেন। কিন্তু না নিচেও ব্যাগটির দর্শন পেলাম না।
ততক্ষণে আমি ঘেমে নেয়ে একশা। মনে হলো পাকসুন্দরী কি দেখেছেন বস্তুটি জিজ্ঞাসা করে আসি। ছুটে গেলাম সিকিউরিটির সামনে। তিনি তখন ভেতরে পা বাড়াচ্ছেন, প্রশ্নটি শুনে চোখ ঘোরালেন, 'দ্যাখো কি কান্ড। এতক্ষণ ওই সামান্য ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে ঘুরছিলেন আর সেটা খেয়াল রাখলেন না। আমার হাজব্যান্ড ঠিক এই কান্ড করেন। যে পুরুষগুলো নিজের রুমাল সামলাতে জানে না তারা কি করে বিশ্বের সমস্যা সমাধান করতে চায় কে জানে! না বাবা, আমি দেখিনি কিছু।' তিনি চলে গেলেন ভেতরে। এবং আমার মনে হলো টয়-লেটে ফেলে আসিনি তো ? দৌড়ে গেলাম। একই চিহ্ন দেওয়া গোটা তিনেক টয়লেট। এর কোনটায় আমি এসেছিলাম। তিনটেতেই খুঁজলাম। যে বেসিনে মুখ ধুয়েছিলাম তার নিচেও নজর করলাম, আমার ব্যাগ কোথাও নেই।
বাইরে বেরিয়ে এসে মনে হলো ট্রানজিট লাউঞ্জের সমস্ত আলো আমার কাছে হলদে হয়ে গেছে। এতো মানুষ এতো সুমধুর শব্দ কিন্তু আমি যেন গভীর জলের তলায় শুয়ে আছি। গেঞ্জি ভিজে গেছে এবং নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। টিকিট এবং পাশপোর্ট ছাড়া জার্মানিতে আমি প্রমাণ করতে পারব না কোথায় যেতে চাইছি। এমন কি এই কারণে ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। আমি তো আমার পরিচয় বোঝাতে চাইলেও কেউ বুঝবে না। খিদে পেলে খাবার কেনার পয়সা নেই। লস্ট আয়ডেনটিটি বলতে যা বোঝায় এখন আমার অবস্থা তাই। আর তখনই কলকাতার জন্যে, জলপাইগুড়ির জন্যে মন কেমন করতে লাগল। আমি এখন কি করব ?
এইসময় আকাশবাণী হলো, নিউইয়র্কগামী প্যান এ্যামের যাত্রীদের শেষবারের জন্যে ডাকা হচ্ছে। প্লেন খুব শিগগির ছেড়ে যাবে। অর্থাৎ আমার নৌকো আমাকে না নিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছে। কবিত্ব নয় অসহায় মানুষের যন্ত্রণা কি কখনও কখনও কবিতার মতো হয়ে যায় ? পরশপাথর হারানো ক্ষ্যাপার মতো আমি চারপাশে নজর রেখে হাঁটছিলাম। কোথাও ব্যাগটির চিহ্নমাত্র নেই। মন বলল

পাওয়া যেতে পারে না। কারণ যে পাবে সে ডলারগুলো ছাড়বে না। যে পাবে সে ট্রাভেলার্স চেকেরও একটা গতি করে নিতে পারে। এইসময় আবার আকাশ-বাণী হলো, মিস্টার এস মজুমদার, এ প্যাসেঞ্জার ইন প্যান এ্যাম নিউইয়র্ক ফ্লাইট ইজ রিকোয়েস্টেড টু—। আর দাঁড়ালাম না। জীবনের সেরা দৌড়টি দৌড়ে প্যান এ্যামের ডেস্কের সামনে পৌঁছে গেলাম।

ডেস্কে তখন দুজন প্যান এ্যামের পোশাক পরা কর্মচারী দাঁড়িয়ে। প্রথম জন সাহেব। ব্যস্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়েস?' ইংরেজি শব্দগুলো দ্রুত তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। তবু বোঝাতে পারলাম আমিই সেই লোক যার নাম মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে।

ভদ্রলোক ধমকে উঠলেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? তাড়াতাড়ি টিকিট দিন। একটা পুরো প্লেন আপনার জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে না!' ব্যস্ত হয়ে হাত বাড়ালেন তিনি।

গলা শুকিয়ে গেছে ততক্ষণে। বললাম, 'আমাকে কি আপনার মনে পড়ছে না? তখন টিকিট দেখাতে পারিনি, আসলে আমার সাইড ব্যাগটাই আমি হারিয়ে ফেলেছি।'

'মাই গড!' ভদ্রলোক কপালে চোখ তুললেন, 'ব্যাগে টিকিট ছিল?'

বার কয়েক মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। তারপরে খেয়াল হতে বুক পকেট থেকে দিল্লি ফ্র্যাঙ্কফুর্টের বোর্ডিং কার্ডের অংশটি বের করে ডেস্কে রেখে বললাম, 'এই দেখুন আমি আপনাদের এয়ারলাইন্সে ফ্লাই করছি।'

'হোয়ার ইজ ইওর পাশপোর্ট?'

'সব ওর মধ্যে ছিলো। পাশপোর্ট, টিকিট, ডলার, ট্র্যাভেলার্স চেক।'

ভদ্রলোক কাঁধ নাচালেন, 'আমার কিছু করার নেই। আপনি পুলিশকে রিপোর্ট করুন ইমিডিয়েটলি নইলে উইদাউট পাশপোর্ট এখানে থাকলে বিপদে পড়বেন।' আমার সম্পর্কে দুশ্চিন্তা করা ছেড়ে দিয়ে তার সঙ্গীকে বললেন, 'ক্যাপ্টেনকে, বলে দাও প্লেন ছেড়ে দিতে।'

দ্বিতীয় ভদ্রলোক ফর্সা কিন্তু মনে হচ্ছিল এশিয়ার মানুষ। এতক্ষণ সোজা চোখে আমাকে দেখে যাচ্ছিলেন। এবার জড়ানো ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি দিল্লির লোক?'

'না। আমি কলকাতায় থাকি। প্লেন ছেড়ে দিলে আমি কী করব?'

'ব্যাগটাতে এতসব জিনিস রেখে অসাবধান হয়েছিলেন কেন?' একটা কাগজ টেনে নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাম কী?'

নাম বলতেই চোখ তুললেন, 'লেখেন?'

'দেশ' পত্রিকায় যখন আমার প্রথম গল্প ছাপা হয়েছিল তখনও এতো আনন্দ হয়নি। মাথা নাড়তেই ভদ্রলোক তার সঙ্গীকে বললেন, ক্যাপ্টেনকে বলো আর দশ মিনিট অপেক্ষা করতে।' সঙ্গীটি কাঁধ নাচালেন। ডেস্ক ছেড়ে বেরিয়ে এলেন দ্বিতীয় ভদ্রলোক। তারপর পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে এসে ঠিক কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন বলুন তো?'

আমি তখন হতবাক। এই ভদ্রলোক বাঙালি? ফ্র্যাঙ্কফুর্টের প্যান এ্যামের ডেস্কে একজন বাঙালি বিদেশীর ভঙ্গীতে কাজ করছেন? বিস্ময় কাটিয়ে বললাম, 'আপনি যে বাঙালি তা বুঝতেই পারিনি।'
তিনি বললেন, 'সেটা বুঝে আপনার কোনো উপকার হবে না। চটপট বলুন। ওই ব্যাগ না পেলে আপনার কি অবস্থা হবে অনুমান করতে পারছেন? এখানকার জেলে কিছুদিন কাটিয়ে দেশে ফিরতে হবে হাই কমিশনের দয়ায়। ব্যাগটা কীরকম ছিলো?'
ভদ্রলাককে যতটা সম্ভব, ঠিকঠাক বর্ণনা দিলাম। তিনি প্রথমে টেলেফোনে এয়ারপোর্ট অথরিটিকে জার্মান ভাষায় কিছু জানালেন। তারপর আমাকে নিয়ে বেরুলেন ব্যাগ খুঁজতে। বাচ্চারা পথে কিছু হারিয়ে এলে মা বাবা যেভাবে সেটা খুঁজতে বের হন ওর ভঙ্গী দেখে তাই মনে হচ্ছিল। ইতিমধ্যে জার্মান, ফরাসী এবং ইংরেজিতে ঘোষণা করা হচ্ছিল, যে কোনো ধরনের সাইড ব্যাগ যার সরু স্ট্র্যাপ এবং চামড়ার শরীর যদি কেউ কোথাও পড়ে থাকতে দ্যাখেন তাহলে বাইশ নম্বর গেটে প্যান এ্যামের ডেস্কে এখনই পৌঁছে দিন। চেয়ারগুলো থেকে শুরু করে ডিউটি ফ্রি শপগুলোর সামনে দিয়ে অনেকটা পাক খেয়ে এলাম ওঁর সঙ্গে। আমার মন বলছে পাওয়ার কোনো চান্স নেই। বাল্যকালে এক তান্ত্রিক পিতামহকে বলেছিলেন আমার নাকি জেলের ভাত খাওয়ার যোগ আছে। ফ্র্যাঙ্কফুর্টের জেলে কি ভাত দেয়? এই ভদ্রলোককে ঠিকানা দিয়ে গেলে কি তিনি কলকাতায় জানিয়ে দেবেন আমার কপালে কি ঘটেছে? বিয়ার খাওয়ার সময় মুখ তুলেছিলাম ওপরে। তখনই যদি পড়ে গিয়ে থাকে—' আবার ছুটে গেলাম জায়গাটায়। ঝকঝকে মেঝেতে একটা কুটো পর্যন্ত পড়ে নেই। পাকসুন্দরীর ফেলে দেওয়া বিয়ার পর্যন্ত এর মধ্যে মুছে নিয়ে গিয়েছে জমাদার। ভদ্রলোক এবার টয়লেটেগুলোয় ঢুকছেন। এক নম্বরে আমি যাইনি কিন্তু উনি গেলেন। দু'নম্বরে উনি যাবার আগে বললাম, 'আমি তিন নম্বরটায় গিয়েছিলাম।' তিন নম্বর থেকে ফিরে এসে ভদ্রলোক জানালেন, 'নাঃ। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। কি করা যায় বলুন তো আপনাকে নিয়ে!' বলতে বলতে তিনি এবার দু'নম্বরটায় ঢুকলেন। একা হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনটে টয়লেট একইরকম দেখতে। ওই বেসিনটায় কি আমি মুখ ধুয়েছিলাম। হঠাৎ ভদ্রলোক দেওয়ালে ঝোলানো ওভারকোট বা টুপি রাখার হ্যাঙার দেখিয়ে বললেন, 'ওটা কি আপনার?'
মেলায় হারিয়ে যাওয়া বউকে খুঁজে পেলে সম্ভবত এমন আনন্দ হয় না। এক দৌড়ে কাছে গিয়ে ব্যাগটা নামিয়ে নিলাম। এ ব্যাগ আমারই। আমার প্রাণভোমরা এর মধ্যেই ছিলো। জিপার খুলতেই টিকিটের রঙ উঁকি মারল। পাগলের মতো হাতড়ে দেখলাম পাশপোর্ট, টিকিট, ট্র্যাভেলার্স চেক মায় সেই ডলারগুলোর একই অবস্থায় পড়ে রয়েছে ওর গহ্বরে। ভদ্রলোক ততক্ষণে ছুটতে আরম্ভ করেছেন, 'চলে আসুন। আর এক মিনিটও নেই।'
টিকিটের একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বোর্ডিং কার্ড ধরাতে কতক্ষণ লেগেছিল

জানি না। পৃথিবীতে কেউ এতো জলদি বোর্ডিং কার্ড নিয়ে সিকিউরিটির গণ্ডি পেরিয়েছে কিনা তাও জানা নেই। বাঙালি ভদ্রলোক সিকিউরিটিকে বলেছিলেন তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে। ওরা এক্স-রে পর্যন্ত করতে পারল না। প্লেন তখন টানেল ছেড়ে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে। অতএব আমরা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে ছুটছি। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এলাকা ছাড়িয়ে টারম্যাকে নামতেই মনে হলো জমে যাব। অনর্গল বেরুনো ঘামে ঠাণ্ডা লেগে আরও কনকনে হয়ে যাচ্ছে। পরনে একটিও গরম জামা নেই। কিন্তু শীতের তোয়াক্কা না করে ছুটে এলাম প্লেনের কাছে। বাঙালি অফিসারের নির্দেশে একটি চাকাওয়ালা সিঁড়ি লেগে গেল প্লেনের দরজায়। দু'পা উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে যাচ্ছি তিনি চিৎকার করে বললেন, 'চটপট উঠে যান। ওসব বলতে হবে না।' প্লেনের দরজাটা যখন আমার পেছনে বন্ধ হলো তখন মনে পড়ল এতো তাড়াহুড়োয় মানুষটির নামটাও জেনে এলাম না। অথচ তিনি আমার কাছে ঈশ্বরের ভূমিকায়। বিশাল চেহারার আমেরিকান ক্যাপ্টেন যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে তা বুঝতে পারিনি। যথাসম্ভব গলা নামিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাশয়ের পরিচয়টা জানতে পারি কি যাঁর জন্যে আমাকে এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো?' তারপরই উত্তরের জন্যে এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে তিনি হনহনিয়ে চলে গেলেন ককপিটের দিকে। একজন এয়ার হোস্টেস আমার বোর্ডিং কার্ডটিতে নজর বুলিয়ে ইশারা করলেন অনুসরণ করতে। বিশাল প্লেনটাকে প্রায় সাঁতরে এলাম যেন দু'পাশে কৌতূহলী এবং বিরক্ত দৃষ্টি উপেক্ষা করে। যেন আমি না এলেই এরা খুশি হতেন।

একেবারে শেষ প্রান্তের জানলার ধারের একটি আসন দেখিয়ে এয়ার হোস্টেস বললেন, 'চটপট সিট বেল্ট বেঁধে নিন।' বলতে বলতে ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। শরীর এলিয়ে দিয়ে মিনিট তিনেক চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম। মাথা থেকে পা পর্যন্ত চিনচিনে অনুভূতি বয়ে যাচ্ছে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্লেনের ভেতরে বসেও আমার শরীর ক্রমশ শীতল থেকে শীতলতর হয়ে যাচ্ছে। মাথার ভেতর পৃথিবীর সব শূন্যতা যেন চাপ বেঁধে রয়েছে। নিজেকে ধাতস্থ করতে বেশ সময় লাগলো। একটু আগে ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমার পরিচয় কি? ওই বাঙালি অফিসারটি না থাকলে আমার পরিচয় কিছু দেবার ছিলো না। হঠাৎ মনে হলো যদি কোন মানুষকে তার পরিবার পাড়া পরিচিত অল্প-পরিমণ্ডল থেকে বের করে এনে এস্কিমো বা ওই ধরনের প্রায় বিচ্ছিন্ন সমাজে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে সে কোন পরিচয় নিয়ে গর্ব করবে? কোন পরিচয় দিয়ে সে স্বীকৃতি আদায় করবে?

খাবার এলো। খেতে মোটেই ইচ্ছে করছিলো না। ফিরিয়ে দিলাম। হঠাৎ এয়ার হোস্টেস কোমল গলায় বললেন, 'আমরা শুনেছি আপনি আপনার আইডেনটিটি এবং টিকিট হারিয়ে ফেলেছিলেন। আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি। আপনি কি একটা ব্র্যান্ডি নেবেন?'

আপত্তি করলাম না। প্লেন তখন মহাকাশে। জার্মানি রইল পেছনে পড়ে। মাঝে

মাঝে ক্যাপ্টেন জানিয়ে দিচ্ছেন ইওরোপের কোন কোন দেশের ওপর দিয়েআমরা উড়ে যাচ্ছি। আলো নিভিয়ে ছবি দেখানো হলো। কিন্তু কিছুই উপভোগ করতে পারছিলাম না। এই প্লেনে তিন স্তরের যাত্রীরা আছেন। সিট ছেড়ে তাঁদের দেখবো বলে খানিকটা এগোতেই পাকসুন্দরীকে নজর পড়লো। তিনি জানলার ধারে একটা সিটে বসে পাশের এক ছোকরা সাহেবকে কি বোঝাচ্ছেন। সাহেব কিছু বলতেই তিনি হেসে গড়িয়ে পড়লেন। ততক্ষণে আমি তার কাছাকাছি পেঁৗছে গিয়েছি। হাসতে হাসতে সুন্দরী তখন বলছেন, 'যাই বলুন, পুরুষরা বড় অল্পেই সন্তুষ্ট হয়। এতো বোকা, না?'

ফিরে এলাম। কেন এলাম তাও জানি না। ওই সাহেবকে ঈর্ষা করার অথবা পাকসুন্দরী সম্পর্কে অভিমান আমার মনে জন্মাবার কোনো কারণ নেই। উনি নিশ্চয়ই এয়ার হোস্টেসের সঙ্গে আমাকে দেখেছেন। অথচ—! দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। আকাশে মেঘের গায়ে রঙের খেলা। জানলা দিয়ে অলসভাবে তাকিয়েছিলাম। হঠাৎ কানে এল, আমরা মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই কেনেডি এয়ারপোর্টে নামছি।

ক্রমশ চোখের সামনে সাজানো আলোর বাগান ভেসে উঠলো। আকাশ থেকে নিউইয়র্কের কেনেডি এয়ারপোর্ট দেখার আনন্দে আমি পাকসুন্দরীকে ক্ষমা করলাম। ক্রমশ নিচু হয়ে আমাদের প্লেনটা সেই আলোর বৃত্তে প্রবেশ করলো।

৪

হেমন্তের রাত্রে চা-বাগানের আকাশ মধ্যবয়সী নারীর আলস্য মেখে স্থির হয়ে থাকে। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেলেই সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার পবনমাসীর মুখ মনে পড়তো। সারাদিন শুয়ে বসে বই পড়ে কাটিয়ে দিতেন তিনি। ভারি শরীরে যৌবন দেখার বয়স হয়নি তখন আমার। কিন্তু আমাদের মায়েদের থেকে পবনমাসী যে আলাদা তা বুঝতে অসুবিধে হতো না। বিকেল চারটে হলে তিনি স্নান করতে যেতেন। রোজ পাট ভাঙা নীলচে শাড়ি পরতেন গুছিয়ে চুল বেঁধে। মুখে সামান্য পাউডারের ছোঁয়া পড়লেই প্রায় চল্লিশে চেহারাটা অন্যরকম হয়ে যেত। সন্তানহীনা সেই মহিলার স্বামী পবনমেশো যিনি কাঠের ব্যবসা করতেন ফিরে আসতেন আলো জ্বললেই। সঙ্গে থাকত বন্ধুরা। রাত এগারটা পর্যন্ত ওই বাড়িতে হুল্লোড় হতো। তাঁরা যখন বিদায় নিতেন তখন পবনমেশোকে দেখা যেত না। পবনমাসী দরজায় দাঁড়িয়ে হাতের উল্টো পিঠে হাই ঢাকতেন। আমাদের নিষেধ ছিল ওবাড়ির চৌহদ্দিতে যাওয়া। তবু আমরা পবনমাসীকে দেখতে চাইতাম। আর হেমন্তের রাত এলে আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হতো কোথায় যেন বড় মিল, খুব মিল। আশ্চর্য, কেনেডি এয়ারপোর্টে নেমে আমার এতদিন পরে সেই পবনমাসীর মুখ মনে পড়ল।

শীত ছিল। তাও চা বাগানে ডিসেম্বর এলে যেমন থাকে। টানেল নয়। আমাদের নামানো হয়েছে এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর দরজায়। শীতবস্ত্র রয়েছে বাক্সে। সেটার দখল পাব ভেতরে যাওয়ার পরে। ছুটন্ত পথ আমাদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে

ওপরে। সুড়ঙ্গের মতো এই রাস্তার কতো মুখ। যার যেদিকে দরকার সে চলে যেতে পারে। আমি চোখ রেখেছি পাকসুন্দরীর ওপরে। তিনি এখন একা। সেই সাহেব ভিড়ে মিশে গেছেন। পাকসুন্দরী যেদিক দিয়ে বেরুবেন আমিও সেই পথ ধরব। মনোজের আসার কথা আছে আমায় নিতে। আচ্ছা, ধরা যাক, মনোজ এলো না। এয়ারপোর্ট নিশ্চয়ই শহরের বুকে হবে না। কী করে ঠিকানা খুঁজে বের করব! আর এক ধরনের নার্ভাসনেসের শিকার হলাম আমি। জানি না কেন এমন হয়, বিদেশের অপরিচিত পরিবেশে আমি কিছুতেই স্বচ্ছন্দ হতে পারি না। আড্ডা মারার নেশা রক্তে এমন মিশে গেছে যে একা কাটানোর কথা ভাবলেই মনে হয় গিয়ে কাজ নেই। অথচ চাপড়ামারির জঙ্গলে কত রাত একা কাটিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। হয়তো সেই গাছগাছালিগুলোকেও বন্ধু বলে মনে হতো তখন।

সামনেই বিশাল হলঘর। খানিকটা দূরত্ব রেখে পর পর গোটা পনের ডেস্ক। সাদা এবং কালো সাহেবরা ওখানে বসে আমেরিকায় প্রবেশ করার অনুমতি দিচ্ছেন। তড়িঘড়ি কেরাসিনের লাইন নয়, আমাদের রাখা হলো কিছুটা দূরত্বে। তারপর এক একজনের কাজ ফুরলে এগিয়ে যাওয়া। আমার ভাগ্যে পড়লেন একজন কালো অফিসার। চেহারাটি বিশাল। বললেন, 'শো মি ইওর আই ডি'। আই ডি বস্তুটি বুঝতে পারলাম না। ঠোঁটের ফাঁকে একটা টুথপিক চেপে রেখে কাঁধ নাচাল, 'পাশপোর্ট'।

এগিয়ে দিলাম। পাতাগুলোয় শুধু আমেরিকার ভিসা নয়, ফরাসী দেশের ভিসাও নিয়েছিলাম। ফেরার পথে লন্ডনে নেমে যাওয়ার ইচ্ছে আছে তাই। খবর নিয়ে জেনেছি তখন লন্ডনে ভিসার চাহিদা নেই। উল্টেপাল্টে পাতা ক'টা দেখে লোকটি বলল, 'শো মি ইওর টিকেট।' অর্থাৎ আমি ফিরে যাব কিনা যাচাই করতে চাইছে। 'হোয়েন উইল ইউ গো ব্যাক?'

'উইদইন টু মান্থস।' চটপট জবাব দিলাম।

'হাউ মাচ ডলার ডু ইউ হ্যাভ?'

এ যে দেখছি আমাদের মতো ইংরেজি বলে। অঙ্কটা জানালাম। তারপর মনে পড়তেই ট্রাভেলার্স চেকের সঙ্গে রাখা ইউ এস আই এসের আমন্ত্রণ পত্রটা বের করে সামনে রাখলাম। সেটায় নজর বুলিয়ে স্ট্যাম্প তুলে সশব্দে ছাপ মেরে দিলো লোকটা পাশপোর্টের পাতায়। তারপর ইশারায় পাশ দিয়ে চলে যেতে বলল। ঘূরন্ত বেল্টে নিজের স্যুটকেশ দেখার মতো আনন্দ আর কিছুতেই নেই। বেচারা দিল্লি থেকে এসেছে আমার সঙ্গে অথচ পথে ছিলো ভাসুর ভাদ্দর বউ-এর সম্পর্ক। বেল্ট থেকে সেটাকে তুলে এগোচ্ছি হঠাৎ পাক সুন্দরী ডাকলেন, 'শুনিয়ে'। মুখ ফেরালাম। তিনি বিগলিত হয়ে বললেন, 'যাক শেষ পর্যন্ত ব্যাগ খুঁজে পেয়েছেন দেখে কি ভালো লাগল। নাউ, উইল ইউ বি কাইন্ড এনাফ টু ক্যারি দিজ টু বটলস? আমি বাইরে গিয়েই নিয়ে নেব। ওরা এমন পাজি, দুটোর বেশি নিলেই ঝামেলা করে।' জীবনে প্রথমবার কোনো নারীকে বিমুখ করলাম। তিনি হিংস্র মুখে তাকাতেই আমি এগিয়ে গেলাম কাস্টমস এনক্লো-

জারের দিকে। খাদ্য দ্রব্য, গাঁজা চরস জাতীয় মাদক আমেরিকায় নিয়ে আসা বেআইনি। জানি না আমেরিকায় সোনা পাচার হয় কিনা। কাস্টমসের অফিসাররা আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডু ইউ হ্যাভ এনিথিং টু ডিক্লেয়ার ?' মাথায় কিছু না আসতে বললাম, ইয়েস, আই হ্যাভ ব্রট মাইসেল্ফ ?
'ওয়েলকাম। ওয়েলকাম ইন ইউ এস এ।' হাত বাড়িয়ে প্রস্থান পথ দেখিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।
আপাতত আমার স্যুটকেসটা আসলে মুকুন্দর। চারটে চাকা লাগানো স্যুটকেসটা তিনি আমায় বিদেশ যাত্রার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। কিন্তু কান ধরে টানলে এত আওয়াজ হয় যে চারপাশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে উপায় নেই। তার চেয়ে একটা লাগেজ ট্রলি নিলে কাজ হতো। দরজা পার হতেই কিছু মানুষের ভিড় নজরে এলো। আত্মীয় বন্ধুদের সংগ্রহ করতে এসেছেন এঁরা। বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছিল। এবং তখনই মনোজ হাত তুলল। মাঝারি চেহারার সুন্দর ছাঁটা দাড়ি নজরে পড়তেই বুক জুড়িয়ে গেল। কাছে এসে মনোজ বলল, 'তাহলে আমি আপনাকে পেলাম।' হাতে হাত মিলিয়ে বলল, 'আলাপ করিয়ে দিই, আমার ভাই শ্যামল।' ছিপছিপে লম্বা ফর্সা এক সুদর্শন যুবক আমায় নমস্কার করল। দাদার সঙ্গে ভাই-এর তেমন মিল নেই। মনোজ বলল, 'চলুন'। নিচে গাড়ি আছে। ওহো, তার আগে গরম জামা পরে নিন।' স্যুটকেস খুলতে হলো। মনোজ এবং শ্যামলের পরনে জিনসের প্যান্ট এবং চামড়ার জ্যাকেট। মনোজ বলছিল, 'ঠান্ডাটা এখন কম। কলকাতার শীতের চেয়ে একটু বেশি। কিন্তু বৃষ্টি পড়লে আর দেখতে হবে না।' আমি সোয়েটার চাপাতে চাপাতে বললাম, 'চা বাগানের ঠান্ডা এর চাইতে বেশি।' এইসময় পাকসুন্দরীর চেহারা নজরে পড়ল। তিনি গদগদ মুখে বের হচ্ছেন। তাঁর দৃষ্টি এক রাসভারি প্রৌঢ়ের দিকে। কাছে এগিয়ে যেতেই প্রৌঢ় মাথা নেড়ে হাঁটা শুরু করলেন। অবশ্য হাঁটার আগে তিনি শুধু স্ত্রীর হাত থেকে হুইস্কির ব্যাগটা তুলে নিলেন। পাকসুন্দরী ক্রীতদাসীর মতো মালপত্র নিয়ে পেছন পেছন চললেন ট্রলি ঠেলে। হঠাৎ বেচারার জন্যে খুব কষ্ট হলো। ওঁর অবস্থা রত্নদার মতো। গল্প লিখতেন রত্নদা। দেশ পত্রিকা বা বড় কাগজে যেদিন মফস্বল থেকে জমা দিতে আসতেন সেদিন তাঁর স্ত্রী একটা খাতায় গল্পের নাম কাগজের নাম লিখে রাখতেন। টাকা বা চেক এলে তার পাশে অঙ্কটি বসিয়ে ব্যাঙ্কে জমা দিতেন তিনি। অ্যাকাউন্টটা যেহেতু দুজনের নামে তাই তিনিই টাকা তুলতেন। একবার দেশ পত্রিকা থেকে তাঁর গল্প ফেরত দেওয়া হয় কাকিমার সঙ্গে ভাইপোর শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে আপত্তি তুলে। তাই শুনে ক্ষেপে যান রত্নদার স্ত্রী। খাতা থেকে গল্পের নাম কাটতে পারবেন না তিনি। তাঁরই নির্দেশে রত্নদা কাকিমা কেটে বউদি করেন। ভদ্রমহিলার যুক্তি ছিল রবীন্দ্রনাথ যদি ওই কাজ গল্পে করতে পারেন তাহলে রত্নদাও পারবেন। ঘটনাটা শুনে আমাদের কষ্ট হয়েছিল রত্নদার জন্যে। পাকসুন্দরী আর রত্নদার মধ্যে ফারাক খুব বেশি নেই বাড়তি স্বাধীনতা এইটুকু যে ওঁকে এখানে বোরখা পরতে হয় নি।

শ্যামল ব্যাগ তুলে নিল। কাঁধের সরু স্ট্র্যাপের ব্যাগটা আর হাতছাড়া করতে রাজি নই আমি। আলো ঝলমল কেনেডি এয়ারপোর্টের বিভিন্ন করিডোর পেরিয়ে বাইরে আসতেই মনে হলো মুখের চামড়ায় জ্বালা ধরল। এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর ভেতরে বুঝতে পারিনি ঠান্ডাটা কত জাঁকালো। মনোজের গাড়ির সামনের সিটে বসামাত্র ও বলল, 'বেল্টটা বেঁধে নিন নইলে ফাইন দিতে হবে।' আজন্ম কোনো গাড়িতে ওঠার পর এমন নির্দেশ পাইনি। ড্রাইভারের জায়গায় বসে মনোজও বেল্ট বাঁধলো। বকলস লাগিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বুঝতে পারছি অ্যাকসিডেন্ট থেকে সামলাবার জন্যে এই ব্যবস্থা কিন্তু ফাইন করার লোক দেখবে কী করে?'

মনোজ হাসল, 'আইনের চোখ এখানে সর্বত্র।'

এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর পাশ দিয়ে গাড়ি বাইরে বের করে আনতেই মনে হলো যা ছিল এয়ারপোর্টের ভেতর ঘন সন্ধ্যা তা এখন শেষ বিকেল। রোদ নেই কিন্তু অন্ধকারও নেই। আমার ঘড়ি বলছে কলকাতার মানুষজন ঘুমের জন্যে তৈরি। ফাকা মাঠের মধ্যে দিয়ে মসৃণ রাস্তা যত বাঁক নিচ্ছে তত গাড়ির ভিড় নজরে আসছে। মনোজ বলল, 'চারপাশে নজর বোলান, এখন শুধু আপনার দেখার পালা। আপনি আসবেন বলে আমি ছুটি নিয়ে বসে আছি। জমিয়ে একটা স্ক্রিপ্ট করুন তো যাতে হৈ চৈ ফেলে দেওয়া ছবি করতে পারি।'

আমরা যাচ্ছিলাম হাইওয়ে দিয়ে। ষাট সত্তর স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছে মনোজ। বিশাল রাস্তার একদিকে চারটে ট্রাকে বিভিন্ন স্পিডের গাড়ি যাচ্ছে। রাস্তার ওপরে নানা রকম দিকনির্দেশ টাঙানো। লেখাগুলোয় স্প্যানিশ প্রভাব বেশি। কিন্তু কোথাও কোনো ট্রাফিক পুলিশ চোখে পড়ল না। সেকথা জিজ্ঞাসা করতে মনোজ বলল, 'আছেন, তাঁরা সর্বত্র বিরাজ করেন।' আমার চোখ অবশ্য ওকে সমর্থন করলো না।

হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে সুন্দর, ছবির মতো সুন্দর একটা পাড়ায় চলে এলাম আমরা। এই জায়গাটার নাম কুইন্স। দু'পাশে দেওদার গাছের সারি দিয়ে পড়ে থাকা নির্জন রাস্তার গায়ে সুন্দর বাংলোগুলোর একটার সামনে মনোজ গাড়ি থামালো। থামিয়ে বলল, 'এই আমার কুঁড়ে ঘর। ইয়ার্কি ভাববেন না, এখানে এই বাড়িগুলোকেই হাট বলে।'

ওপরে লাল টালি দেওয়া কাঠ ও সিমেন্ট মেশানো লন বাগানওয়ালা ছিমছাম বাড়িটির দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক সুন্দরী মহিলা। পরনের হলদে শাড়ি তাঁর গায়ের রঙের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গিয়েছে। মাঝারি চেহারার ওই মহিলার গায়ে একটা জ্যাকেট। হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, 'আসুন, পথে কোনো অসুবিধে হয়নি তো?' শ্যামল ততক্ষণে সবাইকে পাশ কাটিয়ে আমার মালপত্র বয়ে নিয়ে গিয়েছে ভেতরে। পথের অসুবিধের কথা মনে হতেই ফ্র্যাঙ্ক-ফুর্ট এয়ারপোর্ট চোখের সামনে ভেসে উঠল। নিজের অসাবধানতার কথা গল্প করে লাভ কি!

মনোজের বসার ঘরে ঢুকতেই মনে হলো নাটকের স্টেজে ঢুকে পড়েছি। কার্পেটে

মোড়া মেঝের ওপর সোফা সেট, টিভি কিন্তু তার একপাশে উঁচু প্লাটফর্ম। সেখানে চা করার ব্যবস্থা। ওপাশে রান্নাঘর। ওই প্ল্যাটফর্মের একাংশ চলে গেছে শোওয়ার ঘরের দিকে। দুটো প্রচন্ড ছটফটে শিশু এই বাড়িটিকে ব্যতি-ব্যস্ত করে রেখেছে। একতলায় দুটি শোওয়ার ঘর। দোতলায় শ্যামল থাকে। একতলার একটিতে আমার ব্যবস্থা হবার পর জামা প্যান্ট পাল্টে চওড়া নরম বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে কয়েক মিনিট শুয়ে রইলাম। দেড়দিনের মতো পথে কাটিয়েও কিন্তু সেরকম ক্লান্তি লাগছে না আমার। জেট লক বলে একটা কথা শুনেছিলাম। সেটা আমাকে এখনও তো আক্রমণ করেনি। মুখ ফিরিয়ে চারধারে বাচ্চাদের খেলনা, রামকৃষ্ণের ছবি দেখতে পেলাম। হঠাৎ মনে হলো এই যে আমি এখন খোদ নিউইয়র্কে শুয়ে আছি অথচ এই ঘরটাকে পশ্চিমবাংলার যে কোনো জায়গায় নিয়ে গেলে বলা যেত সেখানেই রয়েছি। মানুষ বোধহয় যে কোনো শহরে বাস করতে গিয়ে সেই শহরটাকে নিজের মতো করে নেয়।

মনোজ টালিগঞ্জের ছেলে আর ওর স্ত্রী হাওড়ার। নিউইয়র্কে এত বছর থেকেও খাওয়া পরা জীবনে পুরো বাঙালি হয়ে আছে। স্বপ্নের মতো চাকরি করেও সে বাঙালিদের সাহেব হওয়া নিয়ে উগ্র ঠাট্টা করে যায়। রাতের খাওয়া সেরে মনোজ আমাকে মাটির তলার ঘরে নিয়ে এল। আর ঘরটিকে দেখেই আমি প্রায় প্রেমে পড়লাম। এখানেই ওরা পত্রিকার কাজকর্ম করে। কল্যাণের কলকাতা থেকে পাঠানো আর্টপুল নিউইয়র্কে ছাপিয়ে বিদেশের বাঙালিদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে মনোজ আর শ্যামল। বিশাল ঘরটায় টিভি, টয়লেট, বই এবং রেকর্ড প্লেয়ার রয়েছে। আছে একটা টেলিফোনও। আরাম করে বসে মনোজ জিজ্ঞাসা করলো, 'খুব টায়ার্ড লাগছে? ঘুমাবেন?' 'মোটেই না। আমি ভাবছি আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তো এই ঘরে চলে আসব।'

'আমি ওকে বলেছিলাম। ও রেগে গেল। বলল, অতিথিকে মাটির নিচের ঘরে রেখে অসুস্থ করতে চাও? অবশ্য এখানে ঠান্ডাটা বেশি।'

'কম্বল আছে। কোনো অসুবিধে হবে না।'

কথায় কথায় মনোজের ছবির কথায় এলাম। ওর উপন্যাসের নাম এই দ্বীপ এই নির্বাসন। আমার প্রস্তাব মতো নির্বাসন নামে আসতে দ্বিধা দেখাল মনোজ। গল্পটা আমি কিভাবে ভেবেছি বলতে শুরু করলে ও হেসে ফেললো, 'না মশাই, এখানে পান সিগারেটের দোকান পাড়ায় পাড়ায় নেই। চলুন এক পাক ঘুরে আসি। আপত্তি আছে?'

প্রাথমিক ক্লান্তি কেটে যাওয়ার পর ঘুমের বালাই ছিল না চোখে। মনোজের স্ত্রী আপত্তি করলেন, 'অতখানি পথ উড়ে এসেছেন উনি আর তুমি এত রাতে আবার ওকে নিয়ে বের হচ্ছ! এখানে থাকাটা কি আজই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু দুটি অবাধ্য পুরুষকে কোনো নারী কি স্তিমিত করতে পারে। বেরুবার আগে মনোজকে বললাম, 'এক ভদ্রলোককে ফোন করা দরকার। শুনেছিলাম তিনি রাত এগারটার আগে বাড়িতে থাকেন না। আপনার যদি আপত্তি না থাকে—!'

মনোজ বিরক্ত হলো, 'ফোন করবেন তো কিন্তু কিন্তু করেছেন কেন। যখন ইচ্ছে করবেন। বাড়িতেও তো আপনার জানানো উচিত ঠিকঠাক এসেছেন।' ঘড়ি দেখে বলল, 'কিন্তু কলকাতায়। ওরা এখনও ঘুমোচ্ছে। ফিরে এসে কলকাতা ধরবো।'

ছ'টা নম্বরের চাকতি ঘুরিয়ে টেলিফোনে কথা বলতে অভ্যস্ত আমরা। ডায়েরি খুলে দেখলাম নম্বব বিরাট লম্বা। বোতাম টিপে টিপে সেটা শেষ করতেই ওপাশে ভারি গলা বেজে উঠল, 'হেলো।' জিজ্ঞাসা করলাম, মিস্টার কামাল ওয়াহিদা।'

'স্পিকিং। হু আর ইউ প্লিজ।'

'আমার নাম সমরেশ মজুমদার। একটু আধটু লিখিটিখি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আপনার নম্বর দিয়ে যোগাযোগ করতে বলেছেন।'

'কবে এসেছেন আপনি।'

'আজই।'

'কোথায়।'

'নিউইয়র্কের কুইন্সে।'

'সুনীলের নাম না বললেও চলত। ঠিকানাটা বলুন।'

মনোজের ঠিকানা জানাতেই ভদ্রলোক বললেন, 'ঠিক আছে, আমি আসছি।'

মনোজ অপেক্ষা করছিল। রিসিভার রেখে বললাম, 'মনোজ, একটু মুস্কিল হলো। ভদ্রলোক বললেন তিনি আসছেন। এখন বেরিয়ে যাওয়া কি উচিত হবে।'

মনোজ কাঁধ নাচাল, 'ওকে বললেন না কেন আমরা বেরুচ্ছি! কোথায় থাকেন?' ঠিকানাটা পড়তেই মনোজ হো হো করে হেসে উঠে এল, 'আপনি ভুল শুনেছেন। উনি আসছি বলতেই পারেন না। চলুন বেরিয়ে পড়ি।' আর কথা না বাড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। নিজে একটা জ্যাকেট পরে নিল পাশের ওয়ার্ড-রোব থেকে বের করে। আমার সোয়েটার পরা চেহারাটা দেখে জ্যাকেটটা উঁচিয়ে ধরল, 'এইটে চাপিয়ে নিন আপাতত।' কিন্তু আমি নিজের কান ভুল করতে পারি না। সেটা জানাতে মনোজ বুঝিয়ে দিলো, 'আপনি যদি কলকাতা থেকে মালদার কাউকে টেলিফোন করে শোনেন সে আসছি বলছে তাহলে কি বুঝবেন? এখান থেকে বোস্টনের দূরত্ব সেইরকম।' লক্ষ্য করলাম মনোজের স্ত্রী আর আমাদের বাধা দেননি বেরুতে কিন্তু তিনি দরজা বন্ধ করার সময় নিজের আপত্তির চিহ্ন মুখে গোপন রাখতে পারেন নি।

রাত এখন এগারটা। পাড়াটা নিঝুম। ঠান্ডা ধারালো। মনোজের জ্যাকেটটা খুব উপকার দেবে বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য গাড়ির ভেতরে ঢোকামাত্র মনোজ গরম হাওয়া চালিয়ে দিতেই আরাম লাগল। কুইন্স নিউইয়র্কের এক প্রান্তে। আসলে এইরকম কয়েকটা দ্বীপ নিয়েই নিউইয়র্ক। নিউইয়র্কের প্রাণকেন্দ্র হলো ম্যানহাটন। কয়েকটা ছোটো রাস্তা পেরিয়ে আমরা মূল রাস্তায় চলে আসতেই গাড়ির ভিড় নজরে পড়লো। এই চওড়া রাস্তার আশেপাশে ঘরবাড়ি নেই।

মাঝে মাঝে রেস্টুরেন্ট, টয়লেট বা মোটেলের চিহ্ন। মনোজ বলল, 'একটা দিশি সিগারেট দিন তো।'
নিজের প্যাকেটের শেষ দুটো সিগারেট নিজেরা নিয়ে ছুটে যাওয়া গাড়ি থেকে প্যাকেটটা বাইরে ফেলে দিতেই মনোজ উচ্চারণ করলো 'সর্বনাশ'। অবাক হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই ও বললো, 'এয়ারপোর্ট থেকে আসার পথে পুলিশের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন না? কপাল খারাপ, থাকলে এবার দেখা পেতে পারেন।'
ওর কথা ঠিক বুঝে ওঠার আগেই মনোজ বললো, 'এসে গেছেন।' দেখলাম পেছনে একটা গাড়ি বারংবার আমাদের আলোর সংকেত দিচ্ছে। রাস্তার এক-পাশে মাঝে মাঝে গাড়ি পার্ক করার ব্যবস্থা আছে। তার একটাতে গাড়ি থামাতেই লম্বাটে একটা গাড়ি আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। ওপাশের গাড়ির বেগে এ কারণে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হলো না। সামনের গাড়ির দরজা খুলে এক বিশাল চেহারার পুলিশ অফিসার বাঘের মতো দ্রুততায় এগিয়ে এলো, 'প্যাকেটটা কে ফেলেছ?'
মনোজ স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে কাঁধ নাচাতে লোকটা পকেট থেকে একটা ছোট খাতা বের করলো। এইসময় আমি যেচে উত্তর দিলাম, 'আমি ফেলেছি।'
লোকটা কলম না খুলে হাত বাড়াল, 'শো মি ইওর আই ডি'।
আইডেন্টিফিকেশন কার্ডের আদুরে নামটি যে আমার ক্ষেত্রে পাশপোর্টের তা বুঝতে অসুবিধে হলো না। গাড়ির আলোয় সেটাকে উল্টেপাল্টে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, 'কবে এসেছ এদেশে?' উত্তরটা শুনে মনোজের দিকে হাত বাড়াতেই সে তার কার্ডটি এগিয়ে দিলো। একপলক সেটাকে দেখে নিয়ে লোকটা মনোজকে ধমকাল, 'তোমার ওকে বলে দেওয়া উচিত ছিলো। সিগারেটের প্যাকেটের ফয়েলে চাকা পড়লে স্কিড করতে পারে গাড়ি। তাছাড়া রাস্তাটা ডাস্টবিন নয়।' পাশপোর্ট আর কার্ড ফিরিয়ে দিয়ে লোকটা গাড়ি নিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ স্থির বসে থাকলো মনোজ। তারপর হাসলো, 'খুব জোর পঞ্চাশ ডলার বেঁচে গেল আপনি আজই এসেছেন বলে।'
সত্যি চমকে উঠেছিলাম। কলকাতায় কোনো বড় রাস্তায় কেউ সিগারেটের প্যাকেট ফেলছে আর পুলিশ এসে তাকে ধরে পাঁচশো টাকা জরিমানা করছে স্বপ্নেও তো ভাবা যায় না? হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানকার পুলিশ ঘুষ খায় না?'
'প্রচুর। কিন্তু হাত বাড়িয়ে লরিওয়ালার কাছ থেকে আট আনা নেয় না।' এত রাতেও মাঝে মাঝেই গাড়ি দাঁড়াচ্ছিল ট্রাফিকের আলোর নিষেধে। আর তখনই পাশের ফুটপাত থেকে কালো ছেলের দল সাবানের স্প্রে আর ডাস্টার নিয়ে এগিয়ে আসছিল গাড়ির দিকে। তারা গাড়ি পরিষ্কার করে পয়সা নেবে। মনোজ প্রতিবার নিষেধ করছে তাদের। লক্ষ্য করলাম দুটো গাড়ি আপত্তি করলেও তৃতীয়টিতে ওরা কাজ পাচ্ছিল। এইভাবে এক একটি ছেলে দিনে কুড়ি ডলার রোজগার করে। মনোজ বললো, 'শীতকালে এখানে ভালো বরফ পড়ে। নিয়ম

হলো প্রত্যেক বাড়ির মালিককে তার লনের জমে থাকা বরফ রাস্তার ধারে ফেলতে হবে সপ্তাহে দুদিন। পরিশ্রমটা বুঝুন। সেই সময় এই ছেলেরা এসে আমাদের সঙ্গে চুক্তি করে। এক রাস্তার দু'ধারে যতো বাড়ি আছে তার বরফ ওরা পরিষ্কার করে দেবে। ভালো রোজগার করে ওরা। শুধু বরফ কেন লনে লনে ঘাস ছাঁটবার কন্ট্রাক্ট নেয় ওরা।'

কুইন্স থেকে ম্যানহাটন পৌঁছাতে সময় লাগে পঁয়তাল্লিশ। কিন্তু মাঝখানে শহরে ঢোকার জন্যে আমাদের পয়সা দিতে হলো। লম্বা লাইন পড়লো গাড়ির। আমেরিকান সাহেব মাঝখানের টিকিট ঘর থেকে হাত বাড়িয়ে পয়সা নিয়ে টিকিট দিচ্ছেলেন। হিমাচল প্রদেশের অনেক শহরে এই আইন চালু আছে। তখন ভাবতাম দার্জিলিং-এও চালু করা উচিত। এখন মনে হলো কলকাতায় নয় কেন? লক্ষ লক্ষ লোক রোজ কলকাতায় রোজগার করতে আসেন। শহরে ঢোকার মূল্য তাঁদের দিতে আপত্তি থাকবে কেন?

এইসময় চোখের সামনে মুক্তো ঝলমল বললে কম হবে হীরের ঠিকরানো আলোয় জ্বলে ওঠা স্বপ্নের মতো আকাশের একটি অংশ চোখের সামনে ভেসে উঠলো। গাড়ি না থামিয়ে মনোজ বললো, 'সামনেই নদী। নদীর ওপরের ব্রিজটার নাম ব্রুকলিন। ব্রুকলিন ব্রিজ থেকে ওই দিকে তাকাবেন। ও এর মধ্যেই দেখতে পেয়েছেন? নিউইয়র্কের স্কাই লাইন। চমৎকার, না?'

মাথা নাড়লাম। সত্যি চমৎকার। মনোজ বললো, 'কী কি দেখবেন একটা লিস্ট করে ফেলুন।'

'কিছু না। শুধু মানুষ দেখব।'

হঠাৎ বেশ উত্তেজনা নিয়ে মনোজ বলে উঠল, 'দারুণ! আমার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব জমবে মশাই। লোকে আসে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখতে জাতি সঙ্ঘের বাড়ি, একগাদা স্থবির জিনিসপত্র ঘুরে ঘুরে দেখতে। আরে মশাই এসব দেখতে যাদের ভালো লাগে তারা জীবনের অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত। সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণ কিছু আবিষ্কার করে নেওয়ার আনন্দ সারা জীবন মনের ভেতর শেকড় গেড়ে থাকে।'

খানিকটা তরল গলায় বললাম, 'মনোজ, আপনি এবার সিরিয়াসলি গল্প লিখুন।'

'ফিলম করব না বলছেন?'

'করবেন। নিজের কাগজে শুধু না লিখে বড় কাগজগুলোয় লিখুন।'

সে কোনো উত্তর দিলো না। ততক্ষণে আমরা আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত শহরের হৃদয়ে ঢুকে পড়েছি। দোকানপাট বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ। রেস্টুরেন্ট বার-গুলো অবশ্য খোলা। মনোজ প্রায় রিলে করে যাওয়ার মতো জায়গাটাকে চিনিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় ভিড় আছে। সত্যি বলতে কি এই প্রথম আমি ফুটপাতে লোকজন দেখলাম। রাস্তার ধারে গাড়ি পার্ক করে পার্কিং মিটারে পয়সা ফেলে মনোজ বললো, 'চলুন একটু চক্কর মেরে আসি।'

ঠান্ডা সত্ত্বেও হাঁটতে ভালো লাগলো। এই রাস্তার ওপাশেই ব্রডওয়ে পাড়া।

আরও কিছুটা গেলেই টাইমস্কোয়ার। নামগুলো আমার কাছে কোনো আলাদা মানে তৈরি করছিল না। দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমরা রাস্তায় রাস্তায় হাঁট-ছিলাম। নম্বর দিয়ে রাস্তার পরিচিতি। একসময় মনে হলো সব পথই এক-রকম মনোজকে হারিয়ে ফেললে আমার পক্ষে বাড়ি ফেরা অসম্ভব হবে। ট্যাক্সিকে ঠিকানা দিলে গোটা পঁচিশেক ডলার পড়বে। এখানে পারতপক্ষে কেউ ট্যাক্সিতে চাপে না, বাড়িতে চাকর রাখার কথা ভাবতে পারে না এবং ড্রাইভার রাখার চিন্তা করতেই সাহস পায় না। বাঁ দিকে একটি বার দেখিয়ে মনোজ বললো, 'প্রতি শুক্র এবং শনিবার এটা ভরতি থাকে। নিউইয়র্কে অনেকগুলো সিঙ্গলস ক্লাব আছে।'

'কি হয় এখানে?' নিওন আলোয় সাজানো বারটির গায়ে কোথাও সিংগল শব্দটি লেখা নেই। মনোজ বললো, 'যেসব নারী পুরুষ বিয়ে থা করেনি উথবা স্টেডি প্রেম করছে না সংতাহের শেষ ছুটিতে খুব একলা হয়ে যায় তারা। ওরাই এখানে আসে। পান করতে করতে যদি কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় তো উইক এন্ডটার একটা হিল্লে হলো। না হলে মুখ শুকিয়ে চলে যাও। বেশির ভাগ বংধুত্ব ওই দুটো দিনের জন্যেই। তারপরের পাঁচদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির সময় কেউ কাউকে চেনে না। খবরের কাগজ বলছে সিঙ্গলস ক্লাবে বংধুত্ব হবার পর শতকরা মাত্র বিশ ভাগ নারী পুরুষ ক্রমশ আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বিবাহিত জীবনযাপন করছে।

মনোজের জ্যাকেট আমার অঙ্গে চাপানো না থাকলে ভেতরে ঢুকতে পারতাম না। দ্বারী এ বিষয়ে খুব সচেতন। ভেতরের পরিবেশ যে কোনো বারের মতনই। তবে বসার জায়গা কম। সবাই পান করছে দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে। সুবেশ পুরুষ এবং নারীরা এখানে প্রবেশের আগে হয়তো খুব একটা পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু কথা বলার ভঙ্গিতে কোনো আড়ষ্টতা নেই। এইসব নারী পুরুষেরা চাকরীজীবি। তবে কোনো বিবাহিত মানুষ খবরটা গোপন রেখে এসেছেন কিনা বলা যাবে না। পুরুষের বয়স যেমন পঞ্চাশের ওপরেও রয়েছে নারীরাও তাই। তিরিশের নিচে কাউকে দেখলাম না। মনোজ মদ খাবে না কারণ এখানে গাড়ি চালাবার সময় পেটে এ্যালকোহল রাখা বেআইনি। দুটো অরেঞ্জ জুসের অর্ডার দিয়ে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে চারপাশে নজর বোলাচ্ছি। এই মুহূর্তে কোনো মহিলাকে একা দেখা যাচ্ছে না একমাত্র আমাদের ডান পাশে দাঁড়ানো মহিলাটি ছাড়া। আমি চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'যদিও তার কোনো দরকার ছিলো না, 'ইনি এখনও সঙ্গী পাননি না?'

মনোজ আড়চোখে দেখে নিয়ে বলল, 'মুখ দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো পিসিমা টাইপের হবে।'

'মনোজ আপনি গল্প লিখুন।'

'দূর! আপনি পিসিমার সঙ্গে আলাপ করবেন?'

'ইন্টারেস্টেড নই। আচ্ছা মনোজ এদের মধ্যে কোনো মেয়ে প্রফেশনাল নয়?'

'মাথা খারাপ? ধরা পড়লে পুলিশের হাতে পড়তে হবে। ধরে নিন দুটি একলা নারী পুরুষ এখানে এসে সাময়িক বন্ধুত্বে আবন্ধ হতে পারে। হয়তো এই

পিসিমাকে কেউ অ্যাপ্রোচ করেনি-অথবা পিসিমারই কাউকে পছন্দ হয়নি। চলুন, বেশি সময় নেই।'

'বাড়ি ফিরে যাবেন?'

'না না। পার্কিং মিটারে যে পয়সা দিয়ে এসেছিলাম তার মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। এর পরে পুলিশ ফাইনের লকেট ঝুলিয়ে দেবে।' মনোজের কথা শেষ হতেই আমার সিগারেটের প্যাকেটটার কথা মনে পড়ল। তাড়িঘড়ি গেলাসটা রেখে ঘুরে দাঁড়াতেই আমার হাত লেগে কাউন্টারের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা পিসিমায় ব্যাগটা নিচে পড়ে গেল। অপ্রস্তুত হয়ে সেটাকে তুলতে তুলতে ক্ষমা চাইলাম, 'মাপ করবেন। দেখতে পাইনি।'

গ্লাস নামিয়ে সেই বিদেশিনী মুখ ফিরিয়ে মৃদু হাসলেন। তারপর স্পষ্ট বাংলায় বললেন, 'তাই বলে আপনাকে ভাইপো বলে ভাবতে পারছি না।'

৫

আমি জানি না ভগবানকে সামনে দেখে মানুষ কতটা চমকে উঠবে। মনোজের কথা বলতে পারব না, একজন আধাসুন্দরী মহিলা তাঁর পাতলা ঠোঁটে অসম্ভব বিদ্রূপের ছবি ফুটিয়ে যখন দ্বিতীয়বার বাংলায় বললেন, 'আচ্ছা বলুন তো সুন্দরী মিশুকে মেয়েরা কি পিসিমা হয় না?'
কোনোরকমে বলতে পারলাম, 'আমি দুঃখিত।'
'দূর মশাই! দুঃখ করার কী আছে? দুঃখ অত সস্তা? না, না, আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। পিসিমা পিসিমা মুখ মানে খুব গম্ভীর, বেরসিক এবং আর কি, বলুন না? কিন্তু এটা কেন হবে? ব্যাপারটা খুব ইণ্টারেস্টিং। সুন্দরী মেয়েদের ভাইপো ভাইঝি থাকতে নেই?'
'বিশ্বাস করুন, না ভেবে কথাটা বলেছি। আসলে আপনাকে বাঙালি বলে ভাবতে পারিনি।' আমার অবস্থা তখন পালাতে পারলে বাঁচি। আড় চোখে দেখেছি মনোজ তখন দাম মিটিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমার হয়ে গেলেই সে হাঁটতে শুরু করবে।
'আমার বুকের ভেতরটা একদম বাঙালি। যাকে বলে কাঠ বাঙাল আমি হলাম তাই। আজ রাত্রে একটা কবিতা অনুবাদ করতে করতে খুব খারাপ লাগতে শুরু করলো। আমার আবার ওই একটা রোগ। খারাপ লাগা শুরু হয়ে গেলে মাথায় পোকা কাটে। দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এই সিঙ্গল ক্লাবটায় ঢুকে পড়ে সময় কাটাচ্ছি। এইসময় আপনি পিসিমা বললেন। আমার

কপালটা দেখুন। চেরাপুঞ্জি থেকে একখানা মেঘ গোবি সাহারার বুকে আসা দূরে থাক পদ্মার বুকে চর তুলে দিলেন। তা কী করা হয়?' মহিলা কথা বলছেন আর মাথার চুল সরাচ্ছেন। সেগুলো এতো অবাধ্য যে বারংবার কপালে এসে পড়ছে। বাঙালি মেয়েদের তুলনায় যথেষ্ট লম্বা, প্যাণ্ট এবং ওভারকোটে এঁকে মানিয়েছে চমৎকার। মুখ ফিরিয়ে কথা বলা শুরু করার পর আর এক-দম পিসিমা বলে মনে হচ্ছে না। বললাম, 'কলকাতায় থাকি। আজই নিউইয়র্কে এসেছি। ইনি মনোজ ভৌমিক, এঁর কাছে।'

'মনোজ ভৌমিক? নামটা, আরে মশাই, আপনি সেই লোক?'

'সেই লোক মানে?' মনোজ হতভম্ব।

'নিউইয়র্কে বসে বাংলা কাগজ বের করেন অথচ আমার কবিতা ছাপেন না? আপনার আন্তরিক পত্রিকা আমি দেখেছি। কবিতাগুলো খুব সাব স্ট্যাণ্ডার্ড। গল্প ভালো হয় না। প্রবন্ধ ভালো। আর ওই ধারাবাহিক উপন্যাসটা বিউটি-ফুল।'

'আপনার নাম?'

'ফরিদা। এখানকার একটা উনিভার্সিটিতে পড়াই। খুব ভালো হলো। কোথায় যাবেন এখন?'

'এই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব।'

'কাল ঘুরবেন। চলেন, আমার বাড়িতে বসে এক পাত্র রাম খেয়ে যান। খাঁটি জ্যামাইকান রাম আছে। আমার এক প্রেমিক এনে দিয়েছিল। বেশিদূর না, হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব।' ফরিদা আমাদের আর কথা বলার সুযোগ দিলেন না। মনোজ আমার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। মহিলাকে আমার ভালো লাগলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা কোনো মহিলা এইভাবে কথা বলবেন ভাবতে পারা যাচ্ছে না। বাইরে বেরিয়ে মনোজ বলল, 'ফরিদা, একটু দাঁড়াতে হবে। আমার গাড়িটাকে নিয়ে আসি। সময় ফুরিয়ে গেলে পুলিশ লকেট ধরিয়ে দেবে।'

ফরিদা বললেন, 'তাহলে চলেন, আপনাদের গাড়িতেই যাই। আমি ফকির মানুষ আমার গাড়ি নেই। থাকা খাওয়ার পয়সা দিতেই মাইনা চলে যায়।'

রাত একটায় কোনো তৎক্ষণাৎ পরিচিতা মহিলার ফ্ল্যাটে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার এর আগে ছিল না। দুটো দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে ফরিদা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, 'বাইরের দরজায় দেখবেন প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটের নম্বর আছে। সেটা টিপলে এই দরজা খুলবে। এখানে ঢুকে ওই রিসিভার তুলে নিজের পরিচয় দেবেন। আমি বোতাম টিপে দরজা খুলে দেবো। মনোজ এসব জানে। আপনি নতুন তাই বলছি।' লিফটে উঠে বললেন, 'আমাদের ঢাকার বাড়িতে কেউ এলে এমন কড়া নাড়তো যে পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে যেত।'

ফরিদার ফ্ল্যাট দু'ঘরের। বসার ঘরের সঙ্গেই পার্টিশন দিয়ে রান্নার ব্যবস্থা। সোফায় বসে যে জিনিস দেখে মুগ্ধ হলাম তা হলো বই। ইংরেজিই বেশি। কিছু আরবিও আছে। জিজ্ঞাসা করতে বললেন, 'বাঙালি ঘরের কালো মেয়েকে

যেমন রান্না সেলাই ঘরের কাজ থেকে রবীন্দ্রসংগীত শিখতে হয় বর পাওয়ার জন্যে তেমনি টাকা রোজগারের ধান্দায় আমাকে চার চারটে ভাষা শিখতে হয়েছে মশাই। দাঁড়ান আপনাদের রাম এনে দিই।' মহিলা অবশ্য ঘরে ঢোকার পর একদম বসে ছিলেন না। সন্দেশ খেয়ে যাওয়া পাত্র তুলে নিয়ে গেলেন। যেতে যেতে বললেন, 'একা থাকলে কোনো কাজ ঠিক সময়ে করতে ইচ্ছে করে না। অথচ নিজের চোখে ঠেকে না। আর যেই আপনারা এলেন তখনই ঘরটার চেহারা দেখে লজ্জা লাগছে।'

দুজনে একা হওয়ামাত্র মনোজ চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলো, 'কেসটা কি মনে হচ্ছে?'

'বুঝতে পারছি না। আর একটু দেখা যাক।'

'বেশিক্ষণ বসবো না। মিনিট কুড়ির মধ্যে উঠে পড়বেন।' মনোজ উঠে বই-এর আলমারির কাছে গেল। আমারও মনে হচ্ছিল নতুন শহরে বেড়াতে এসে বসে সময় কাটানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাছাড়া ফরিদার বৃত্তান্ত কিছুই জানা নেই। ম্যানহাটন মানে কলকাতার চৌরঙ্গী। সেখানে এমন ফ্ল্যাট নিয়ে যে থাকে সে নিজেকে ফকির বলবে কেন? এইসময় মনোজ চাপা গলায় উত্তেজনা ফুটিয়ে আমায় ডাকল, 'এই সমরেশ, জলদি!' সোফা ছেড়ে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আলমারির দুটো তাকে বাংলা বই। শামসুর রহমানের কবিতার বই বেশি। সুভাষ মুখার্জি এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও আছেন। এই বিদেশে ওঁদের দেখে কেমন যেন আত্মীয় আত্মীয় বলে মনে হচ্ছিল। সমরেশ বসুর বিবর, গঙ্গা, সুনীল গাঙ্গুলির আত্মপ্রকাশ, শীর্ষেন্দু পারাপারের পাশে কি আশ্চর্য, আমার উত্তরাধিকার? বুকের মধ্যে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। আমি কি সত্যি দেখছি! মনোজ আমার বইটাকে এখানে দেখে অমন উত্তেজিত হয়েছিল। হিসেবটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! নিজেকে সাহিত্যিক বলতে আমার আপত্তি খুব; লিখি এই পর্যন্ত। যার লেখক হবার কোনো কথা ছিল না সে লিখে সংসার চালাচ্ছে, এটাও মেনে নিতে পারি কিন্তু তার বই এতো হাজার মাইল দূরে ম্যানহাটনের একটা ফ্ল্যাটে শোভা পাবে ভাবতেই গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল। উত্তরাধিকার দেশ পত্রিকায় যখন ধারাবাহিক বেরুচ্ছে তখন একদিন আশাপূর্ণা দেবী আমায় বলেছিলেন, 'এ্যাদ্দিনে তুমি সংসারী হলে।' কালবেলা একাডেমি পাওয়ার পর প্রিয়জনেরা আপসোস করেছিল, ওটা উত্তরাধিকারের পাওয়া উচিত ছিল। এসব মনে নিইনি তখন। হঠাৎ সেই মানুষটার জন্যে বুক নিংড়ে বাতাস বেরিয়ে এল। যাঁকে নিয়ে উত্তরাধিকারের শুরু, অনিমেষের সারা জীবনের মূল্যবোধ যাঁর হাতে গড়া, কলকাতায় পড়তে আসার সংধ্যায় জলপাইগুড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে যিনি বলেছিলেন, 'মানুষ হও', তাঁর কাছে আর একবার কৃতজ্ঞ হলাম আমি।

'না-না, ওখানে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম জীবনানন্দ নেই। তাঁরা আছেন আমার শোওয়ার ঘরে। এখানে তো বাঙলা বই বেশি পাই না। চেয়ে চিন্তে নিই। আর শামসুর যখন আসে ওর বই দিয়ে যায়। আসেন, রাম খান। সঙ্গে এই

বড়াগুলান। কিসের বড়া খেয়ে বলতে হবে।' ট্রে নামিয়ে রাখলেন ফরিদা। আমরা ফিরে এলাম সোফায়। নতুন কিছু রান্না করে রহস্য উদ্ধারের দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে চাপিয়ে মেয়েরা চিরকাল খুব মজা পায়। মনোজ বড়া রহস্যের সমাধান করায় ফরিদা খুব দুঃখিত হলেন, 'তাহলে খুব খারাপ হয়েছে। আমার মা যখন বানিয়েছিলেন আমি ধরতেই পারিনি।'

মনোজ বলল, 'ফরিদা, আপনার কথা বলুন।'

ফরিদা হাসলেন, 'আমার আবার কথা কি! ছাত্তর পড়াই, একা থাকি। মাঝে মাঝে প্রেমিক জুটলে প্রেম করি। সবার সঙ্গে শুতে ইচ্ছে করে না। জানেন, আজকাল পুরুষ মানুষের ভাবনার গভীরতা খুব কমে যাচ্ছে। মেয়েদের কথা ছাড়ান দেন। চিরকালই তো আপনারা আমাদের দাবায়ে রেখেছেন। তবু মেয়েরা আজকাল কিছু ভাবে টাবে।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি বাংলা দেশের মেয়ে?'

'হ্যাঁ, তখন পাকিস্তান। আমার বাবা যেমন মডার্ন তেমনি কনজারভেটিভ। আপনি ইন্ডিয়ান সিগারেট খাচ্ছেন? আমার ভাল্লাগে না।' বলে ফরিদা একটা আমেরিকান সিগারেট ধরালেন, 'আমাদের বাড়ির উঠোনে একটা ডুমুর গাছ ছিল। ঢাকার বাড়িতে। ডুমুর গাছের ছায়ায় কখনও বসেছেন? এক নাপিতের বউ আসতো নখ কাটতে। সে আবার হাত দেখতে জানতো। ডুমুর গাছের ছায়ায় বসে আমার হাত দেখে বলেছিল আমি গোরা বর পাব। তাই শুনে সবাই কি হেসেছিল। কথাটা কিন্তু সত্যি হয়েছিল।'

'আপনার স্বামী বৃটিশ?'

'না। আমেরিকান। সেকেন্ড হাসব্যান্ড। প্রথমজন বাবার পছন্দ করা। একজন পাঁড় মুসলমান। চার বছর ঘর করেছিলাম। পড়তে দেয় না, কলেজে যেতে দেয় না, শুধু বলে বাচ্চা চাই। তা আল্লা বললেন ফরিদাকে বাচ্চা দেবো না। ব্যস, তালাক। ততদিনে আমার বোনের বিয়ে হয়েছে লন্ডনে। বি এ পাস করে চলে এলাম ওর কাছে। এম এ করলাম। করতে করতে এক আমেরিকার ছোকরার প্রেমে পড়ে গেলাম। ওকে বিয়ে করে এখানে। সিটিজেনশিপ পেয়ে গেলাম। যাই বলেন, ভেতরে ভেতরে তো ভেতো বাঙালি। বর এর ওর সঙ্গে শোবে সহ্য হয়নি। অতএব ডিভোর্স। তদ্দিনে উনিভার্সিটির চাকরিটা জুটিয়ে নিলাম। লেটেস্ট খবর হচ্ছে এক ইংরেজ ডিউক খুব প্রেম করছে আমার সঙ্গে। বিয়ে করে ইংলন্ডে নিয়ে যেতে চায়। আমি বলেছি আর না, খুব হয়েছে। বিয়ে ফিয়ে আমার পোষাবে না। আবার ভাবি, বুড়ো বয়সে দেখবে কে? নাপতানির ভবিষ্যৎ বাণী সত্যি করে ফেলি।' রামের গ্লাসে চুমুক দিলেন ফরিদা। অবাক হয়ে শুনছিলাম।

মনোজ বলল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভালই হলো।'

ফরিদা হাসলেন, 'তাহলে আমার কবিতা শুনতে হবে। ভালো লাগলে আপনার কাগজে ছাপবেন।' ফরিদা উঠলেন, সম্ভবত কবিতার খাতা আনতে। আর যাই হোক এত রাত্রে কবিতা শোনার কোনো বাসনা আমার ছিল না। মনোজ সেটা

বুঝলো। বলল, 'আজ থাক ফরিদা। সমরেশকে নিয়ে আরও কয়েকটা জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছে আছে।'

'সমরেশ? ফরিদা আমার দিকে তাকালেন, 'আপনার নামটাই এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিনি।'

হাসলাম। ফরিদা আমাদের এগিয়ে দিতে আসছিলেন, 'মনে হচ্ছে হঠাৎ করে আপনারা চলে যাচ্ছেন। এখন আমি একা থাকব, একদম একা।'

শেষের দিকটায় গলার স্বর এমনভাবে কেঁপে গেল অবাক হয়ে তাকালাম। মনোজের টেলিফোন নম্বর জেনে নিলেন ফরিদা। আবার একদিন আসতে হবে বলে কথা আদায় করলেন। তারপর প্রায় লিফটের মুখে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সমরেশ, আপনার উপাধিটা কি?'

মনোজ জবাব দিলো, 'উত্তরাধিকার বইটা আপনি কোত্থেকে পেলেন?'

যেন ভূত দেখার মতো তাকালেন ফরিদা, 'আরে! কি মুর্খ আমি? আপনি সমরেশ মজুমদার?'

কথা বলার কিছু ছিল না। হাসলাম। ফরিদা তখন আমার হাত জড়িয়ে ধরেছেন, 'আপনার আর কোনো লেখা পাড়িনি। গতবার ঢাকা থেকে ওই বইটা কিনেছিলাম। প্লেনে আসার সময় অনির মায়ের মৃত্যুর ঘটনায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলাম। ওই একটা বই, আপনি আমার খুব প্রিয়জন।'

'ধন্যবাদ ফরিদা।'

'ধন্যবাদ না। আপনার আঙুলগুলো দেখি।' প্রায় জোর করে আঙুলগুলো সামনে ধরে ঠোঁট ছোঁয়ালেন ফরিদা, 'এই হাতে জীবন ফুটুক। আল্লা যা পারে না তাই এই আঙুল পারুক।'

মনোজ বলল, 'সমরেশ। আপনি ভাগ্যবান। আমি জানি না এত বড় কথা আর কোনো লেখক এর আগে শুনেছেন কিনা।'

আপনি যা নন তার জন্যে যদি প্রশংসা শোনেন তাতে যা অস্বস্তি, আপনি যা কখনও হতে পারবেন না তা যদি কেউ আপনার কাছে আকাঙ্ক্ষা করে তার যন্ত্রণা অনেক বেশি। কিন্তু এর মধ্যেই ফরিদা এক কান্ড করলেন। মনোজকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাবেন আপনারা?'

'নিউইয়র্কের রাস্তায় ঘুরব। ওকে হুকার দেখাব।'

'হুকার? হুকার কেন?'

'সমরেশ একটা চিত্রনাট্য লিখছে। তাতে হুকারও আছে।'

'তাই?' আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন ফরিদা। এক মিনিট দাঁড়াতে বলে নিজের ফ্ল্যাটে চলে গেলেন ছুটে। মনোজ বললো, 'সত্যি, লেখক হবার কি সুখ!'

ফরিদা এলো তৈরি হয়ে, 'আমি আপনাদের সঙ্গে ঘুরব। যাওয়ায় পথে নামিয়ে দেবেন।'

মনোজ বিব্রত হলো, 'শুনলেন আমাদের বদ মতলব আছে!'

ফরিদা বললেন, 'আরে মশাই, আমি প্রবলেম ক্রিয়েট করবো না।'

নিউইয়র্কে এখন প্রায় আড়াইটে। রাত হিসেবে মাঝ রাত পার হওয়ার সময়। অতটা পথ উড়ে এসেও আমার ঘুম পাচ্ছে না কেন? পার্কিং লট থেকে গাড়ি বের করে আমরা চললাম রাতের নির্জন পথ বেয়ে। মনোজের পাশে ফরিদা, আমি পেছনে। এক একটা রাস্তার এক এক রকম চরিত্র। রাস্তার নাম নেই, সংখ্যায় পরিচয়। মনোজ বললো, 'হুকারদের পেতে আমাদের আরও একটু এগোতে হবে।' ফরিদা জানালেন, তিনি চৌত্রিশ নম্বর রাস্তায় হুকার দেখেছেন। এই নিয়ে ওদের তর্ক চলছিলো। দেখলে কে বলবে আজ সন্ধেবেলাতেও আমরা পরিচিত ছিলাম না। হঠাৎ ফরিদা মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সমরেশ, হুকার মানে জানেন?'

'মনোজের গল্পে পড়েছি।'

'একই ব্যাপার। পৃথিবীর সব দেশে আছে। আপনাদের কলকাতায় স্ট্রিট গার্ল নেই?'

'আছে। তারা সন্ধের পর চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রিটে ঘুরে বেড়ায়। খুব গরিব।

'গরিব এরাও। তবে দাপট খুব। সেটাই পার্থক্য।'

এখন দোকান পাট বন্ধ। গাড়ির সংখ্যাও কম। বার রেস্টুরেন্টের আলো জ্বলছে। ফুটপাতে মাঝে মাঝে নারী পুরুষ দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ মনোজ ঘোষণা করল, 'সমরেশ, এবার চোখ খোলা রাখুন।'

গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়েছে মনোজ। একটা বাড়ির গায়ে ফুটপাতের ওপর গোটা পাঁচেক মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ওদের কারো হাটু অবধি জুতো এবং স্কার্ট, কেউ লাল জিনস্ সাদা শার্ট পরে গল্প করছে সিগারেট খাচ্ছে। আমাদের গাড়িটাকে দেখে কৌতূহলী হয়ে তাকাল সবাই। তারপর একটি সাদা মেয়ে ফুটপাতের ধারে এসে চিৎকার করে বললো, 'দয়া করে গাড়ির ইঞ্জিনটা বন্ধ করে মুখখানা দেখান।'

মনোজ গাড়িটা থামাতেই মেয়েটা ছুটে এলো রাস্তায়। ফরিদাকে দেখে খুব বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলো, 'ও মাই গড! তোমার সঙ্গে তো পার্টনার আছে আবার আমাকে ডাকছ কেন?'

'আমি তো ডাকিনি।' মনোজ উত্তর দিলো।

'তাই নাকি! এত রাত্রে এই রাস্তায় স্লো স্পিডে গাড়ি চালায় কারা তা জানো না? ঠিক আছে, তুমি তো একলা আছ, যাবে আমার সঙ্গে?' শেষ প্রশ্নটি আমার দিকে। এই মাঝরাতের বিবর্ণ আলোয় মেয়েটিকে খুব নীরক্ত মনে হচ্ছিল। হঠাৎ ওপাশ থেকে কেউ সিটি দিয়ে উঠতেই মেয়েটি দুদ্দাড় করে দৌড়ে পাশের এক গলির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। দেখলাম ফুটপাতে যারা জটলা করছিলো তারাও নেই। হঠাৎ চারপাশ কেমন থমথমে হয়ে গেল। মনোজ আর দেরি না করে গাড়ি চালাল। ব্যাপারটাতে নতুনত্ব তো কিছু নেই। রাত ন'টা দশটার মিউজিয়ামের পাশে সদর স্ট্রিটের মোড়ে যে মেয়েদের দেখা যায় তারা খুব গরিব। পুলিশের গাড়ি দেখলে দৌড়ে পালায়। একই জীবিকার এই রমণীরা দু'রকম নামে অভিহিত হবেন কেন? স্বৈরিণীর

ইংরেজি তো হুকার নয়। যদি স্ট্রিট গার্লরাই হুকার হয় তাহলে এই ধারা আমাদের দেশে আমদানি হয়েছে বৃটিশরা আসার পর থেকেই। ফলে এর উপযুক্ত প্রতিশব্দ এখনও তৈরি হয়নি। তবে আমাদের দেশে যারা রাস্তায় ঘুরে খদ্দের ধরে তারা কখনই আক্রমণাত্মক নয়। খদ্দের না চাইলে আগ বাড়িয়ে কথা বলে না। এই মেয়েটার দেখলাম সেসব জড়তা নেই। ফরিদাকে ওঁর বাড়িতে পেঁাছে দেবার সময় এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। (যে দেশে যৌনতা নিয়ে কোনো কড়াকড়ি নেই সে দেশে বেশ্যাবৃত্তিকে কারা উৎসাহ দেয় ?) ফরিদা বললেন, 'চোখ কান খোলা রেখে এদেশে ঘুরুন উত্তরটা পেয়ে যাবেন। এই যাদের আপনি দেখলেন তাদের দিনের বেলায় কোথাও খুঁজে পাবেন না। বেশ্যাবৃত্তির যে কয়েকটা স্তর এদেশে আছে এরা তার সবচেয়ে নিচুতলার। এভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এদের সঙ্গে কথা না বলাই ভালো। আমি সঙ্গে ছিলাম বলে আপনারা অল্পে ছাড়া পেলেন।'

মনোজ হাসলো, 'সিটিটা শোনেন নি? পুলিশের আসার আগাম খবর পেয়ে গিয়েছিলো ওরা।'

ফরিদাকে ওর বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিলাম। বললেন, 'যে ক'দিন আছেন, মাঝে মাঝে চলে আসবেন। মনোজ, আপনাকেও বলছি। আজ তো কবিতা শোনানোই হলো না। কথা দিন আসবেন।'

আমরা কথা দিলাম। যতক্ষণ ভদ্রমহিলা চোখের আড়ালে চলে না গেলেন ততক্ষণ মনোজ ইঞ্জিন বন্ধ রেখেছিলো। তারপর বললো, 'পুরো ব্যাপারটা বিশ্বাসের বাইরে, না?'

আমি তখন ফরিদার জায়গায় এসে বসেছি বুকে বেল্ট এঁটে, 'আমার জানাশোনা কোনো মেয়ে এভাবে কথা বলতে পারতো না। এভাবে মেশাটা অসম্ভব ছিলো।'

গাড়ি চালু করে মনোজ বললো, 'এখানে আপনার ওকে পছন্দ হচ্ছে, কিন্তু সমরেশ, কলকাতায় যদি ফরিদা আপনার সঙ্গে ঘোরে তাহলে আপনি প্রচণ্ড অস্বস্তিতে পড়বেন।'

মনোজের ছবিতে থাকবে নায়ক শৈবালকে একটি হুকার মেয়ে নাজেহাল করছে রাস্তায়। শৈবাল মানসিক বিপর্যস্ত হয়ে হুকারটির শিকার হয়ে পড়ছিলো। চিত্রনাট্যে দৃশ্যটিকে রাখতে এখন আমার কোনো অসুবিধে হবে না। ব্যাপারটা বলতেই মনোজ জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি কোনো বারবণিতার কাছে রাত কাটিয়েছেন?'

আচমকা এমন প্রশ্নে উত্তর দিলাম, 'তাহলে তো যে কোন লেখা লিখতে গেলে কল্পনাশক্তিকে বাতিল করতে হয়। বিভূতিভূষণ চাঁদের পাহাড় লিখতে পারতেন না।'

'বুঝলাম, কিন্তু প্রত্যেক ট্রেডের এমন কিছু শব্দ আছে যার ব্যবহারে সেটির পরিচয় প্রকাশ পায়। যেমন সোনাগাছিতে কেউ গেলে একজন বারবণিতা যদি জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি কি আজ রাত্রে আমার সঙ্গে থাকবেন', তাহলে মনে হবে কোনো ভুল নেই। প্রশ্নটি কিন্তু সোনাগাছির চরিত্র প্রকাশ করলো না। মেয়েটির

মুখের সংলাপ হওয়া উচিত, 'আমার ঘরে বসবেন ?' বসবেন শব্দটার মধ্যে ওরা সব কিছু বুঝিয়ে দেয়। না, না, যা ভাবছেন তা নয়। আমার কোনো ফাস্ট হ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স নেই, বই পড়ে জানা। অতএব নিউইয়র্কের হুকারদের সঙ্গে চৌরঙ্গীর মেয়েকে মেশাবেন না।' মনোজ সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা বাড়ছিল। গল্প উপন্যাস লিখতে গিয়ে অনেককেই দেখেছি চরিত্রগুলোর জীবন এবং পরিবেশানুযায়ী সংলাপ লেখেন না। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী যে ভাষায় কথা বলে মাছওয়ালীও সেই ভাষা বলে। মনোজের সঙ্গে এইসব কথা বলতে বলতে ফিরছিলাম। মাঝে মাঝে সোঁ সোঁ গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মনোজ বললো, 'চেয়ে দেখুন, আর একদল হুকার।'
সামনের রাস্তার মোড়ে জনা সাত আট কালো সাদা মেয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে, কেউ কেউ গলা তুলে গান গাইছে। গাড়িটাকে দেখামাত্র ওরা একসঙ্গে ফিরে তাকাল। মনোজ গাড়ি দাঁড় করাতেই এবার খুব স্বাস্থ্যবতী সাদা এবং কালো দুটো মেয়ে এগিয়ে এসে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'স্কিন আলাদা কিন্তু শরীর এক, তবু পছন্দ তোমার ওপর।'
মনোজ জিজ্ঞাসা করলো, 'দক্ষিণা কত দিতে হবে ?
'নট মাচ। রাত শেষ করে দেখা হচ্ছে তাই সুবিধে করে দিচ্ছি। আমাকে পঞ্চাশ দিও আর ঘরের জন্যে একশ। ছটার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে কিন্তু।'
'দেড়শ ডলার ? আরে ব্বাস। অত আমার পকেটে নেই।'
'ঠিক আছে, মেক ইট ওয়ান ফরটি।' মনোজের দিকে দাঁড়িয়ে কালো মেয়েটি কথা বলছিল। মনোজ বলল, 'ঠিক আছে শুধু ফর্টি। যে একশ' ডলার ঘরের জন্যে দেবে সেটা দিতে হবে না। আমার একটা খালি ফ্ল্যাট আছে।'
'সরি হিরো। আমরা নিজেদের জায়গা ছাড়া যাই না।'
'তাহলে পারলাম না।'
হঠাৎ মেয়েটি উগ্রমূর্তি ধরলো, 'ইয়ার্কি পেয়েছ ? এতক্ষণ কথা বলিয়ে পারব না বলছো ? ঠিক আছে, বিশটা ডলার ছাড়ো তারপর এখান থেকে তুমি যেতে পারবে।'
এতক্ষণ আমার পাশে দাঁড়ানো সাদা মেয়েটা কথা বলেনি। এবার সে বলল, 'হাই টুনা, লিভ দেম টু মি। আই উইল হুক দেম।' কালো মেয়েটা কাঁধ নাচাল, একটা অশ্লীল গালাগালি দিলো তারপর শরীর দুলিয়ে ফুটপাতে উঠে গেল। সাদা মেয়েটি এবার আমার জানলার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, 'ওর কথায় কিছু মনে করো না। বড্ড মাথা গরম। গত সপ্তাহে একটা খদ্দের ওকে ডিচ্ করেছে। তারপর থেকেই— যাক, তোমরা দুজনেই ঘুমাবে ?'
উচ্চারণ এত জড়ানো যে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল। মনোজ ওপাশ থেকে জবাব দিলো, 'দ্যাখো বাবা, আমরা কেউ ঘুমাতে আসিনি। আমার এই বন্ধু আজই প্রথম এদেশে এল। ও একটা স্ক্রিপ্ট লিখবে। সেই ব্যাপারে কথা বলতে চায়।'
'আচ্ছা।' মেয়েটি এক মুহূর্তে ভেবে নিল, 'কতো খরচ করবে ?'
'বিশ ডলার।'

'তাহলে সময়টা তোমরা ভুল পছন্দ করেছ। এখানে কারো সঙ্গ নিলেই আমাদের কমিশন দিতে হয়। আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো কথা বলা যাবে না। ইন ফ্যাক্ট এতক্ষণ কথা বলেছি বলে আমাকে জবাবদিহি দিতে হবে। দশ ডলার ছাড়ো।'
'তোমরা, তুমি কোথায় থাকো?'
'কোথাও না। দশ ডলার ছাড়ো।' মেয়েটি গাড়ির জানলায় সেঁটে কথা বলছিল। এমন সময় দুটো লোক যেন অন্ধকার ফুঁড়ে নেমে এল রাস্তায়, 'হাই জিনা, ইজ দেয়ার এনি প্রব্লেম?' ম্যানড্রেকের কমিক্স-এ লোথারকে যে সমস্ত চেন হাতে গুন্ডার সঙ্গে লড়তে হয় এ দুটোকে দেখতে ঠিক তাদের মতো। আমি চাপা গলায় মনোজকে বললাম, 'গাড়ি চালান।'
মনোজ কথাটায় কান দিলো না। জিনা বলল, 'ইয়েস। দে ওয়াণ্ট টু টক অ্যাবাউট এ স্ক্রিপ্ট।' ততক্ষণে লোক দুটো চলে এসেছে কাছে। একজন মনোজের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পা তুলে চিউইংগাম চিবোচ্ছে অন্যজন মনোজের জানলার পাশে, 'হোয়াটস দ্যাট?'
মনোজ বলল, 'নাইট লাইফ অফ নিউইয়র্ক-এর ওপর একটা ছবি হচ্ছে। আমরা চাই তোমাদের সাহায্য। অফ কোর্স উই উইল পে ফর দ্যাট।'
লোকটা মনোজকে দেখল, 'সাউথ আফ্রিকান?'
'না। ভারতীয়।' মনোজ হাসল।
লোকটা মাথা নাড়ল, 'কি ধরনের সাহায্য চাইছ?'
মনোজ চটপট উত্তর দিলো, 'এখানে স্যুটিং করবো। তোমরা ম্যানেজ করবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে ভালো অভিনেতা অভিনেত্রী থাকে তাহলে তাদের আমরা চান্স দেব।'
'কেন?'
'যাতে ব্যাপারটা খুব অথেণ্টিক হয়।'
এবার গাড়ির সামনে দাঁড়ানো লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, 'বস, আমি অ্যাক্টিং করতে চাই।'
'কত টাকা দেবে?'
'আমরা কথা বলে ঠিক করতে পারি।'
এইসময় জিনা কিছু বলতে গেল। কিন্তু তাকে ধমকে থামিয়ে দিলো লোকটা, 'আমাকে এই ব্যাপারটা বুঝতে দাও। যাও, ফুটপাতে গিয়ে দাঁড়াও, লুক ফর এ গুড বিজনেস।'
মেয়েটি রাগত ভঙ্গিতে চলে যেতে লোকটা বলল, 'এসব কথা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলা যায় না। পুলিশ খুব ঝামেলা করছে। তোমরা এক কাজ করো। বাঁ দিকের মোড়ে রবিন্সের পাব এখনও খোলা আছে। ওখানে গিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করো। মিনিট দশেকের মধ্যে আসছি। লোকটা ইশারা করতেই ওর সঙ্গী গাড়ির সামনে থেকে সরে দাঁড়াল।
মনোজ গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে খানিকটা এগিয়ে যেতেই সেই কালো মেয়েটা চিৎকার করতে করতে রাস্তায় নেমে এল, 'জন, দে আর লায়ার। ডোণ্ট বিলিভ দেম।'

আমরা ততক্ষণে মোড় পেরিয়ে গেছি। রবিন্সের পাব দেখতে পেলাম। মনোজ আবার বাঁ দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তা পালটালো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওরা যদি নম্বর লিখে রাখে।'

'লোকাল মাস্তান। পাড়ার বাইরে যাবে না। শুধু এই এলাকাটা কিছুদিন এড়িয়ে যেতে হবে। কিন্তু সমরেশ, আমরা তখন ধোঁয়া দেখে গিয়েছিলাম, এবার আগুনটাকেও দেখলাম, তাই না? মিউজিয়ামের সামনে দাঁড়ানো বাঙালি স্ট্রিট গার্লের সঙ্গে এদের পার্থক্য হলো এরা স্বাধীন নয়। এরা খদ্দেরকে হুক করবে এবং ভালো মালদার লোক হলে এদের নিয়োগকর্তারা তাদের ধ্বংস করবে। খদ্দের হুক করে এরা নিয়ে যায় নিয়োগকর্তাদের ডেরায়। সো দে আর হুকার।'

'পুলিশ জানে না?'

'পৃথিবীর সব দেশেই পুলিশের চরিত্র এক।' মনোজ হাসল, 'এরা ঘুষ নেয় না ট্রাক ড্রাইভারের হাতে হাত মিলিয়ে। কিন্তু আরও বড় কিছু করে। তবে বলতে পারেন এদের কর্তব্য সম্পর্কে এরা যতটা সজাগ তা আমাদের পুলিশের রপ্ত করা সম্ভব হবে কিনা জানি না।' আমরা ম্যানহাটন পেরিয়ে এসেছি ততক্ষণে। নদীর তলার সুড়ঙ্গ দিয়ে সোঁ সোঁ করে গাড়ি ছুটছে। ঘড়িতে এখন ভোর সাড়ে চারটে।

এই সময় রাস্তা ফাঁকা। চুপচাপ পেরিয়ে এলাম পথটা।

মনোজের বাড়ির সামনে পৌঁছে ও স্টার্ট বন্ধ করে দিলো গাড়ির। গাড়ি থেকে নেমে মনোজ বলল, 'একটু ঠেলবেন?'

গাড়ির কোনো গণ্ডগোল নেই অথচ ঠেলতে হবে কেন? দরজা খুলতেই প্রচণ্ড ঠান্ডা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তেই নাক বরফ। মনোজ বলল, 'এই ভোরে আর মহিলাটির ঘুম ভাঙাতে চাই না। ঠেলে গ্যারাজে ঢুকিয়ে দিই আসুন।'

দুজনে গাড়ি ঠেলে গ্যারেজে ঢুকিয়ে লনে পা দিতেই শিশির পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। নিউইয়র্কে ভোর হচ্ছে। এবার বিছানার জন্যে শরীর টিমটিম করছে। নিঃশব্দে দরজা খুলে মনোজ বলল, 'চুপচাপ আপনার ঘরে চলে যান। ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'ঘুম পাবে কিনা জানি না তবে এখন শুতে হবে।'

'ও জানলে চেঁচামেচি করবে এখন ফিরেছি বলে নইলে আপনাকে আজ কফি খাওয়াতাম।'

এই সময় একটা গাড়ি এসে থামল বাইরে। তারপরেই বেলের শব্দ। সমস্ত বাড়ি জাগিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। মনোজ দরজা খুলল। আপাদমস্তক মোড়া একটা লোক জিজ্ঞাসা করলো, 'সরি, আমি একটু অসময়ে এসে পড়লাম। সমরেশ মজুমদার এখানেই আছেন, তাই না?'

মনোজ বলল, 'আপনি?'

লোকটি টুপি খুলল, 'আমার নাম কামাল।'

৬

মনোজ চেয়েছিল আমাদের এই রাত কাবার করে ফেরাটা ওর স্ত্রীর অগোচরে থাক। কিন্তু ভোরবেলায় যে শব্দে বেল বাজল তাতে যে কোনো মুহূর্তে ওদের শোবার ঘরের দরজা খুলে যেতে পারে। এবং এখনও আমাদের পরনে যেহেতু বাইরে বেরুবার পোশাক তাই ভদ্রমহিলার কাছে কিছুই গোপন থাকবে না। কলকাতায় আমার এক পরিচিতকে দেখতাম স্ত্রী মনঃক্ষুণ্ণ হবেন ভেবে কোনো কাজই সাহস করে করতেন না। অথচ তাঁর খুব ইচ্ছে হতো একটু সাহসী হবার। কোনো কোনো মহিলা স্বামীর সঙ্গে খোলামেলা কথা বললে সব কিছু সহজ-ভাবে মেনে নেন। কিন্তু অনেকেই পারেন না। আর এসব ক্ষেত্রেই স্বামীদের কমপ্লেক্স তৈরি হয়, ওরা আরও লুকোছাপায় পড়ে যান। মনোজের অবস্থাটা বোঝার মতো সময় এখনও আসেনি। হয়তো ও চায়নি ওর স্ত্রীর ঘুম অসময়ে ভাঙাতে। কিন্তু ভাঙল। আমি কিছু বলার আগেই পাশের দরজা খুলল। ততক্ষণে সোফায় বসে পড়েছে মনোজ। বসে বলছে, 'আপনি কি এখন বস্টন থেকে এলেন।

'ইয়েস। একটা ট্রাক চালিয়ে চলে এলাম। কিছু মালপত্র কেনার ছিল, কিনে চলে যাব।' হাত বাড়াল কামাল। করমর্দন করে আমি ওকে নিয়ে সোফায় বসলাম। এখন আমি বা মনোজ পেছনের দিকে তাকাচ্ছি না। মনোজ যেন খুব সিরিয়াস, এমন ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করল, 'একটু বুঝিয়ে বলুন। আপনার সঙ্গে সমরেশের কথা হলো ঘণ্টা সাতেক আগে। আপনি বললেন, আসছি। বস্টন

থেকে নিউইয়র্কের দূরত্ব যা তাতে আমরা ভাবিনি আপনি আসবেন। আগেই কি এখানে আসার প্ল্যান ছিল?' কামাল মাথা নাড়ল, 'এটা আবার একটা কথা নাকি? সমরেশের ফোন পেয়ে মনে হলো চলে যাই। ব্যবসাও হবে ওর সঙ্গে আলাপটাও। সমরেশ, কদিনের প্রোগ্রাম?'
প্রশ্নটা এমন ভঙ্গীতে যেন বহুদিন পরে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে। সুনীল গাঙ্গুলি আমাকে বলেছিলেন কামালের সঙ্গে আলাপ হলে নতুন অভিজ্ঞতা হবে। শুরুতেই কথাটাকে সত্যি বলে মনে হচ্ছে। মোটামুটি আমার কথা বলতেই কামাল উঠে দাঁড়াল, 'যাক, হাতে কিছুদিন সময় পাওয়া গেল। তোমারটা নিয়ে তাহলে পরে ভাবব। আগে চা খাব। এই যে নমস্কার, আপনি মিসেস ভৌমিক? সাতসকালে ঘুম ভাঙালাম আপনার। কিচেনটা কোথায়?' মনোজের স্ত্রী যতই বিরক্ত হয়ে থাকুক এবার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মানে?'
'ভৌমিক? ভৌমিক ব্রাহ্মণ নাকি? আমি মুসলমান। কামাল। আপনার রান্নাঘরে ঢুকে চা বানালে আপত্তি আছে? জাত যাবে?' কামাল এগিয়ে গেল।
মনোজের স্ত্রী বলল, 'আপনি চা বানাতে যাবেন কেন?'
মনোজ বলল, 'আপনি বসুন, আমি বানাচ্ছি।'
কামাল ধমকে উঠল, 'আরে, আমার ইচ্ছে হয়েছে আর তোমরা ভদ্রতা করছ! আমি যেমন বাইরে থেকে এলাম তোমরাও মনে হচ্ছে বাইরে থেকে এলে। জামাকাপড় ছাড়ো, আমি চা বানাচ্ছি। এই তুমি চা খাবে?'
শেষ প্রশ্নটা মনোজের স্ত্রীর উদ্দেশ্যে। বেচারা আর উষ্ণতা ধরে রাখতে পারল না। সম্মতি আদায় করে কামাল রান্নাঘরে ঢুকল। মনোজ কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সে জানিয়ে দিলো আমেরিকার বাঙালিদের কিচেনে কোনো জিনিসটা কোথায় থাকে তা তার ভালো জানা আছে। মনোজ স্ত্রীর দিকে তাকাতেই সে মাথা নেড়ে শোওয়ার ঘরে ফিরে গেল। মনোজ আমাকে বলল, 'এক রাতে দু'বার শক্ সহ্য হচ্ছে না। একে ফরিদা তার ওপর কামাল।'
আমি তখন অবাক হয়ে কামালকে দেখছি। মনোজের কিচেন যে কোনো বঙ্গললনার আকাঙ্ক্ষার বস্তু হবে। কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে তিন পাশের দেওয়ালে র‍্যাকে রাখা সবরকম আধুনিক রান্নার ব্যবস্থার সুযোগ পাওয়ায় খাটুনি থাকে না বলা যায়। প্রায় আমার বয়সী লোকটা সেখানে তৎপর। অথচ মিনিট পাঁচেক আগেও ওকে চিনতাম না। এ বাড়ির মানুষগুলোকেও আগে দ্যাখেনি ও। কিন্তু এরই মধ্যে শুধু তুমি বলাই নয় চা বানাতে আরম্ভ করা হজম করতে অসুবিধে হচ্ছে। এই সময় শ্যামল নামল। ও সাতসকালেই কাজে বের হয়। রান্নাঘরে এক অপরিচিত লোককে দেখে সে তাজ্জব। কামাল ওকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই, চা চলবে? আর এক কাপ জল দেব?'
শ্যামল মাথা নেড়ে আমাদের দিকে তাকাল। বললাম, 'কামাল ওয়াহিদ, বস্টনে থাকেন। আমার ফোন পেয়ে চলে এসেছেন ট্রাক চালিয়ে।' শ্যামল, যে খুব কম কথা বলে সে না বলে পারল না, 'স্ট্রেঞ্জ!' চা নিয়ে এসে হাতে হাতে ধরিয়ে দিলে কামাল। তারপর মনোজকে জিজ্ঞাসা করল, 'এই, ওর নাম কি? ওকে ডাকো।

মনোজের স্ত্রী, বেরিয়ে এল পোশাক পাল্টে। ওদের বসার ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আমরা চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছি। গাড়ি থেকে নামবার আগে শরীর শুতে চাইছিল, এখন সেই ভাবটা কেটে গেছে ' মনোজ জানলার পর্দা সরিয়ে দেখল নিউইয়র্কে ভোর হচ্ছে। কামাল কথা বলে যাচ্ছিল। মিনিট পনেরোর মধ্যে আমরা জানতে পারলাম সে বস্টনে থাকে। আমেরিকার নাগরিক। একা। বিয়ে করেছিল কিন্তু সেটা টেকেনি। এইখানে মনোজের বউ প্রশ্ন করেছিল, 'আপনি বোধহয় বাড়িতে ঝামেলা করতেন ?

'তা বোধহয়। তবে ও যখন অন্য লোকের প্রেমে পড়ল তখন ওকে মুক্তি দিয়ে দিলাম। সেই সময় ও আমাকে যা বলেছিল সব টেপ করে রেখে দিয়েছি। মাঝে মাঝে এখনও বাজিয়ে শুনি। বিয়ে ভেঙে নতুন বিয়ে করে ওরা এদেশেই আছে। ওর আদি বাড়ি ঢাকায়। মিস্টার ওয়াহিদ প্রচুর সম্পত্তি রেখে মারা গেছেন। মাদাম ওয়াহিদকে সে মা বলতে রাজি নয়। বস্তুত, সে পৃথিবীতে কিভাবে জন্মেছে তা তার জানা নেই। কোনো মানুষেরই তা থাকে না। বড় হবার সময় তাকে যা জানিয়ে দেওয়া হয় তাই সে লালন করে। কিন্তু কামাল তাতে রাজি নয়। বোঝা যাচ্ছিল আত্মীয়দের সঙ্গে তিক্ততা থেকে সে এমন ভাবনায় পেঁছেছে। ধর্ম-টর্ম বিশ্বাস করে না সে। মৌলবীদের ওপর ভীষণ খাপ্পা। মৌলবীরা যে জোব্বা পরেন তা দিয়ে চারটে গরিব শিশুর শীতের পোশাক হয়ে যায়। হিন্দু ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামি ওর দুচক্ষের বিষ। এইসব কথা বলে-টলে কামাল উঠে দাঁড়াল, 'সমরেশ, তুমি ঘুমিয়ে নাও। আমি দুপুরে আসছি। তখন ভাত খাব। চলি।' যেমন এসেছিল তেমন বেরিয়ে গেল সে প্রায় আচমকা। আমরা কেউ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারিনি। মনোজের বউ শুধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল খানিক পরে, 'ভদ্রলোককে বিশ্বাস করা যায় তো ?' উত্তর দিতে তখনই পারিনি।

এ ধরনের জীবনযাত্রায় আমি কখনই অভ্যস্ত ছিলাম না। রাতের খাওয়া সেরে দশটা নাগাদ ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে দুজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একসময় আবিষ্কার করতাম অন্ধকারের পুঁজি আর হাতে নেই। শিশির পড়ার শব্দ শুনতে শুনতে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন ফর্সা হয়ে গেছে আকাশ, শীত যেন হায়েনা। তারপর মনোজের বানানো চা খেয়ে লম্বা ঘুম মাঝদুপুর পর্যন্ত। দুটো নাগাদ ব্রেকফাস্ট খেয়ে আলস্য। আড্ডা। সন্ধের পর স্নান সেরে 'লা-নার' খাওয়া। মনোজের স্ত্রী বলতো, 'ব্রাঞ্চ খেতে অনেককেই দেখেছি কিন্তু এ আবার কি ! লাঞ্চ এবং ডিনার কেউ একসঙ্গে খায় ?' আমার পিসিমা খেতেন। যে মহিলাটি দশে বিবাহিতা হয়ে সাড়ে দশে বিধবা সাইনবোর্ড নিয়ে আশি বছর পর্যন্ত আমার পিতা এবং আমাদের ঝক্কি সয়ে গেলেন তিনি ভাত খেতে বসতেন বিকেল চারটেয়। এর আগে তাঁর কাজ নাকি ফুরোতেই চাইত না। অত অবেলায় খাওয়ার পর রাতের খাওয়া সম্ভব ? প্রায়ই বলতেন, 'আলো চাল পেটে গেলে বড্ড ফোলে, বুঝলি। সেই সাড়ে দশ বছর থেকে খাচ্ছি তো।'

আমাদের এই নৈশজীবনে মনোজের স্ত্রীর সম্মতি ছিল না। যে কোনো মহিলাই

এতে আপত্তি করবেন। আমরা অবশ্য সেটাকেও উপভোগ করতাম। দুটো নাগাদ কামাল এসে আমার ঘুম ভাঙাল। প্লেন যাত্রার ক্লান্তি এবার সমস্ত শরীরে জেঁকে বসেছে। কামাল একেবারে আমার শোওয়ার ঘরে স্বচ্ছন্দ হয়ে বসে, 'এর বেশি খুব কিছু এ্যাড করে না। ওঠো।'

বাড়িটা এখন খুব নির্জন। মনোজ ও তার সন্তানদের সাড়া পাচ্ছি না। কামাল বলল, 'কাল ফরিদার ওখানে তোমরা আড্ডা মেরেছ ?'

চমকে উঠলাম। ফরিদার কথা কামাল জানল কী করে ?

কামাল বলল, 'খুব সিম্পল ব্যাপার। সকালে এখান থেকে ম্যানহাটনে গিয়ে মনে হলো ফরিদার সঙ্গে দেখা করে যাই। ও তখন ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে। ওর কাছেই শুনলাম। ও আমার সম্পর্কে শাশুড়ি।'

দুজন বাংলাদেশী মানুষের মধ্যে আত্মীয়তা থাকতেই পারে। কিন্তু এই যোগা-যোগ গল্প-উপন্যাসে লিখলে সাজানো বলে মনে হয়। ফরিদা কামালকে বলেছে আমাকে জানাতে যে তার খুব ভালো লেগেছে। আমি যেন তাড়াতাড়ি যোগা-যোগ করি।

বিকেল পর্যন্ত আমরা গল্পগুজব করলাম। আমার প্রোগ্রাম জেনে নিল কামাল। মার্কিন সরকার আমার ইচ্ছেমত সারা দেশে ঘুরতে দেবেন জেনে বলল, 'কোথায় কোথায় যাচ্ছ প্ল্যান করে আমায় জানিয়ে দিও। আমি সেখানকার বাঙালিদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেব। এ্যাই সমরেশ, আমেরিকায় এসে নিগ্রো মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না ?'

'আপত্তি নেই। বরং বলা যায় ছেলেবেলা থেকে আমাকে কালো মেয়েরা বেশি আকর্ষণ করে।'

'ঠিক আছে, জুলিকে তোমার কথা বলব।'

'কে জুলি ?'

'আমার এক বান্ধবী। একসময় বিয়ে করতে চেয়েছিল। এখন এক চার্চম্যানকে বিয়ে করেছে। দারুণ গান গায়। লস এঞ্জেলস-এ থাকে।'

'লস-এঞ্জেলস ? সে তো অনেক দূর !' এদেশে টেলিফোনের দৌলতে সব কিছু হাতের মধ্যে।

ইতিমধ্যে আমরা জেনে গেছি কামাল খুব রেস্টলেস। কোনো কারণে মায়ের ওপর ওর রাগ আছে। মেয়েদের বন্ধুত্ব ও পছন্দ করে। সুনীল গাঙ্গুলি নাকি ওকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখছেন। মনোজের ছবির কথা শুনে খুব উৎসাহিত সে। বলল, 'আমি একটা ছেলেকে পাঠিয়ে দেব বস্টন থেকে। ওর নাম ফুয়াদ চৌধুরি। ফিল্ম নিয়ে পড়াশুনা করেছে। ও ইন্টারেস্টেড হবে।' সেই বিকেলেই ট্রাক নিয়ে বস্টনে ফিরে গেল কামাল।

মনোজ গেল সাংসারিক কাজ করতে। কেনাকাটা দরকার। ও ফিরে এলে আমরা বেরুবো। একা ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগছিল না। টিভিতে এতগুলো চ্যানেল এবং এত রকমের ছবি দিনরাত দেখায় যে সময় কাটাতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু শরীর জুড়ে আলস্য বেশি বলেই ঘরে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। চাবিটা

সঙ্গে নিয়ে বাইরের লনে দাঁড়ালাম। সামনের সারিবন্ধ গাছের ছায়া মাখা চওড়া রাস্তাটা বড় নির্জন। তিন চারটে সাদা বাচ্চা সাইকেল চড়া শিখছে। দু'ধারে ছবির মতো কটেজ টাইপের বাড়ি। মনোজের লনে বোধহয় নিয়মিত হাত পড়ে না! কিন্তু পাশের কটেজটার বাগান চমৎকার। এক বৃদ্ধ সেখানে দাঁড়িয়ে পাতা ছাঁটছেন। আশির নিচে বয়স নয়। একটু কুঁজো দেখাচ্ছে। একটু বাদে ভেতর থেকে এক বৃদ্ধার গলা ভেসে এল। বৃদ্ধ গাছ কাটতে কাটতেই জবাব দিলেন। জড়ানো কথা। দেখলাম বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন। কাছা-কাছি বয়স। ওঁর হাতে কিছু ছিল। বৃদ্ধ সেটি নিয়ে দু'হাতে বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন। অন্তত মিনিট খানেক ওঁরা একত্রিত থাকলেন। এর আগে আমি কখনও ওই বয়সে পৌঁছে যাওয়া মানব-মানবীকে চুম্বনরত অবস্থায় দেখিনি। মনে হলো স্বর্গীয় দৃশ্য দেখছি। নরনারীর যৌবনের সঙ্গে চুম্বনের স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকে কিন্তু ওই যৌনচেতনাহীন চুম্বনের সৌন্দর্য এতকাল অনাবিষ্কৃত ছিল আমার কাছে। বৃদ্ধ মুখ সরিয়ে নিয়ে হাসলেন। বৃদ্ধা তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিতেই বুঝলাম পাইপ পাওয়ার আনন্দে বৃদ্ধ আদরটি করলেন। পাইপ ধরিয়ে ওরা এপাশে আসতেই আমাকে দেখতে পেলেন।

বৃদ্ধ বললেন, 'হেলো জেন্টলম্যান, ইউ আর মিস্টার— ?'

'মজুমদার। আমি মনোজের বন্ধু।'

'ও হ্যাঁ। বৃদ্ধা বললেন, 'তুমি কলকাতা থেকে এসেছ! তাই না?'

'আজ্ঞে তাই।'

'কদিন থাকবে এখানে?'

'আপাতত দিন পনের। তারপর জানি না।'

'কী কর তুমি?'

'লিখি। গল্প উপন্যাস।'

'আচ্ছা! সেটা খুব ভালো। একজন লেখকের সঙ্গে আলাপ করে ভালো লাগছে।'

'আমার খুব ভালো লেগেছে আপনাদের বাগানটা।'

'ধন্যবাদ। তবে আরও ভালো করা যেত। সামনের বছর যদি বেঁচে থাকি—।'

'ও জর্জ। স্টপ ইট।' বৃদ্ধের কথা থামিয়ে দিলেন বৃদ্ধা।

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, 'সত্যিকে সত্যি বলে নেবে। তাহলে দুঃখ পাবে না।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার স্ত্রী চান আমি অনেকদিন বেঁচে থাকি। যদি জিজ্ঞাসা করি কতদিন তাহলে কিন্তু সঠিক বলতে পারবেন না। আমি এখন আশিতে পৌঁছেছি। ও চাইতে পারবে না আরও পঁচিশটা বছর। আবার সামনের বছর আমি থাকব না এটাও মানতে নারাজ। আমি বলি কি মনকে তৈরি রাখার বয়সে আমরা পৌঁছে গিয়েছি, তাই না?'

প্রশ্নটা আমাকে করলেন কিন্তু কী উত্তর দেব আমি! জিজ্ঞাসা করলাম, প্রসঙ্গ ঘোরাতেই, 'এখানে আর কে থাকেন?'

বৃদ্ধা চটপট মুখ ঘোরালেন, 'আর কে থাকবে? আমরা দুজন।'

বৃদ্ধ হাসলেন, 'তোমার মনে আছে ডোরা, মিসেস বাউমিক একবার ওই প্রশ্ন

করেছিলেন। আমার ছেলেমেয়েরা সব নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে থাকে। তাদের সংসারও বড়।'

'আসেন না ওরা ?'

এবার বৃদ্ধা বললেন, 'কী করে আসবে ? উইলি থাকে শিকাগোয়। ও সময় পায় না। বব থাকে সানফ্রানসিস্কোতে। ব্যবসা করে। টেড মারা গেছে ভিয়েৎনাম ওয়ারে। ডলি অবশ্য নিউইয়র্কে থাকে। কিন্তু ওর স্বামীটা এত পাজি যে ওকে আসতে বারণ করে দিয়েছি আমি।'

বৃদ্ধ বললেন, 'তবে মাদার্স ডে-তে ওরা টেলিগ্রাম গিফ্‌ট পাঠায়। ইন্ ফ্যাক্ট উই ডোণ্ট ওয়াণ্ট দেম টু ডিস্টার্ব আজ।'

এতক্ষণ একরকম লাগছিল হঠাৎ স্রোতটা যেন ঘুরে গেল। প্রশ্নটা করতেই বৃদ্ধ বললেন, 'যদ্দিন শুধু ওরা আমাদের ছেলেমেয়ে ছিল তদ্দিন অসুবিধে ছিল না। যেই ওরা কারো স্বামী বা স্ত্রী, বাবা বা মা হয়ে গেল অমনি ওদের নিজস্ব একটা জগত তৈরি হলো। বেশি আসা যাওয়া করলে আমাদের জগতের সঙ্গে ওদের জগতের সংঘাত লাগবেই। তাছাড়া এককালে ওদের জন্যে অনেক করেছি এখন দুজনে একটু একা থাকতে চাই। তুমি বরং একদিন এসো চা খেতে তখন গল্প করব। এখনই টি ভি-তে একটা দারুণ সিরিয়াল দেখাবে। বাই।' বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ পাইপ টানতে টানতে ভেতরে চলে গেলেন।

এতকাল শুনতাম ইংলন্ড আমেরিকায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাঁদের সন্তানদের দ্বারা উপেক্ষিত। ভারতীয় বাবা মায়ের সঙ্গে তাঁদের বয়স্ক সন্তানদের সম্পর্ক নিয়ে বেশ গৌরব করতাম আমরা। সাহেবরা বৃদ্ধ হবার পর অসহায় অবস্থায় দিন কাটায় ওল্ড এজ হোমে আর তাদের ছেলেমেয়েরা ভুলেও তাকায় না বলে আধুনিক সভ্যতাকে দায়ী করতাম। কিন্তু আজ ওই বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে আমার আবার সেই ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল। চা বাগানে চাকরি জমানো টাকায় তিনি জলপাইগুড়িতে বাড়ি তৈরি করেছিলেন। বেশ বড়সড় বাড়ি। ইচ্ছে ছিলো চার ছেলে এবং নাতিনাতনি নিয়ে জমিয়ে থাকবেন। রিটায়ারমেন্টের পঁচিশ বছর পরে ওই বাড়িতে যখন তিনি এবং তাঁর বিধবা মেয়ে ছাড়া তৃতীয় প্রাণী নেই তখন আমায় লিখেছিলেন, 'আমার ছেলেমেয়ে নাতিদের মধ্যে একমাত্র তুমি আমাকে বুঝতে পার বলে মনে হয়। এই যে এখন আমরা একলা আছি এর চেয়ে সুখের আর কিছু নেই। এতকাল সবাই আমার আদেশ শুনতো। এখন সবাই আমাকে হুকুম করতে চায়। এটা সহ্য করা বড় কঠিন। একা থাকায় নিজের মতো ভালো থাকা যায়। হয়তো অর্থের অনটনে পড়তে হয় মাঝে মাঝে তবু সেটা ছেলের বউ বা নাতি নাতনিদের ভিন্ন ভাবনার সঙ্গে মানিয়ে চলার থেকে ঢের ভালো। সাহেবরা শুনেছি আঠারো পার হলেই ছেলেমেয়েকে চরে খেতে বলে। নব্বই বছরের এই বৃদ্ধ চাইছে এদেশেও ওটা চালু হোক। স্নেহের খাল কেটে অপমানের কুমির ডাকার কি কোনো মানে হয় ? তোমার কি অভিমত ?'

সেই বৃদ্ধের স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন পঞ্চাশ বছর আগে। বিধবা মেয়েকে নিয়ে

তিনি একা থাকতে চেয়েছিলেন শেষ সময়ে। এই স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মানসিকতার ফারাক কী ?'

নিউইয়র্কে সন্ধে হয় কিন্তু রাত যেন নামতেই চায় না। মনোজের সঙ্গে আমি আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরুলাম। ওর স্ত্রী বলেছেন অন্তত দুটোর মধ্যে ফিরতে। বাইরে কোথাও খেয়ে নেওয়া যাবে। আজও পেট্রল পাম্প থেকে সিগারেট কেনা হলো। বেশি তেল কিনলে এরা দেখছি পকেট ক্যামেরা উপহার দেয়। টাইম স্কোয়ারে যখন পৌঁছালাম তখনও আকাশে আলো। পার্কিং লটে গাড়ি রেখে পা বাড়াতে দুই সাহেবের একজন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ডাকলো, 'হেই মিস্টার, কাম হিয়ার।' সঙ্গে সঙ্গে মনোজ চাপা গলায় জানালো, 'যাবেন না, ভিখিরি।' অবাক হয়ে ভিখিরি দর্শন করলাম। একজন পাইপ খাচ্ছে অন্যজন কিছু চিবোচ্ছে। বয়স ষাটের ওপাশে। পরনের স্যুট ঈষৎ বিবর্ণ। কিন্তু একজনের টাই আছে। যে ডেকেছিল সে বলল, 'এই আমার বন্ধু, ওর কিছু টাকা দরকার। দুটো ডলার দিয়ে যাও তো।' খুব গম্ভীর গলায় এই হুকুমটা হলো। মনোজ বলল, 'থামবেন না। তাকাবেন না।'

অতএব এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এবার গালাগালি ভেসে এল। অশ্রাব্য ভাষায় আমাদের কৃপণ বলা হচ্ছে। মনোজকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কি রকম ভিখিরি ?'

মনোজ হাসল, 'ওই পর্যন্ত। আর এগোতে সাহস পাবে না। পুলিশ দেখলেই চুপ করে যায়। আর একদল আছে যারা চুপচাপ বসে ভিক্ষে চায়।'

আমেরিকার মতো বড়লোকদের দেশে ভিক্ষুক আছে ভাবতে খুব ভালো লাগছিল। মনোজ আমাকে জুতো পালিশওয়ালা দেখাল। সিংহাসনের মতো একটা চেয়ারে বসিয়ে জুতো পালিশ করছে। টাইম স্কোয়ার অনেকটা আমাদের চৌরঙ্গীর মতো। ফুটপাতে হাঁটা দায়। আর একটু এগোতেই নিওন সাইন চোখে পড়ল। 'লাইফ সেক্স', 'শেফ উইদ সেক্স', 'সেক্স গেম', 'শী অ্যান্ড ইউ'। দুই ফুটপাতে সিনেমা হলের মতো পর পর সাজানো উইন্ডো। আর সেখানে দাঁড়িয়ে নিগ্রো যুবকেরা হাঁকাহাঁকি করে খদ্দের ডাকছে।

ব্যাপারটা অনেকটা কলকাতার ফুটপাতে শোনা, 'কি চাই দাদা, একবার আসুন' বলে যে হাঁকাহাঁকি করে নির্দোষ বিক্রিবাটা চলে তার কথা মনে করিয়ে দেয়। মনোজ বলল, 'আগে এদেশে এইসব সেক্সশপগুলো বে-আইনি ছিল। তখন সুইডেন থেকে স্মাগল হয়ে আসতো। লোকে চোরাগোপ্তা দেখত। শেষ পর্যন্ত সরকার বিধি নিষেধ তুলে দিলো। প্রথম প্রথম বিশ ডলার লাগতো ঢুকতে। বেশির ভাগটাই ব্লু-ফিলম দেখাত। কিন্তু ঢোকার জন্যে লাইন পড়ত বিরাট। এখন বছর বারো পরে টিকিটের দাম পাঁচ ডলার। সকাল দশটায় যখন খোলে তখন ঢুকে পরদিন ভোরে বেরিয়ে এলেও কেউ তাড়িয়ে দেবে না। কিন্তু সারাদিনে বড় জোর পঞ্চাশ জন দর্শক হয়।'

'কেন ?' অবাক হয়ে বললাম, 'দাম কমলে দর্শক আসছে না কেন ?'

'দর্শক আসছে না বলেই দাম কমছে। যৌনতার একই দৃশ্য এখন আমেরিকানদের শুধু বিরক্তি উৎপাদন করে। লাইফ শো-তে ভিড় হয় না কিন্তু ভালো নাটকের

টিকিট তিনমাস আগে ফুল হয়ে যায়। যখন আগ্রহ ছিল তখন উন্মাদনা ছিল, আগ্রহ ফুরিয়ে গেলেই কেউ ফিরেও তাকায় না এক ট্যুরিস্ট আর বুড়ো মানুষ ছাড়া। সত্যি বলতে কি এই পর্নো এলাকা বেঁচে আছে ট্যুরিস্টদের দৌলতে। মনোজের কথা শেষ হতেই আমার একটা ছোট্ট উদাহরণ মনে পড়ল। শ্যামবাজারের থিয়েটারে প্রথম যখন ক্যাবারে নাচ চালু হলো তখন ভিড় দেখে সুধীজনেরা বলেছেন, দেশটা, দেশের সংস্কৃতি রসাতলে গেল। সবাই ভিড় করছে সেখানে। তখন পেশাদারী থিয়েটার মানেই ক্যাবারে নাচ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সময়টা এল যখন ক্যাবারে নাচের ভিড় সত্ত্বেও টিকিট বিক্রি হয় না। তিন মাসে নাটক উঠে যায়। অথচ মোটামুটি সামাজিক নাটকগুলোয় হাউস ফুল হয়। কলকাতায় যদি ব্লু-ফিল্ম দেখানোর সরকারী অনুমতি মিলতো তাহলে বছর পাঁচেকের মধ্যে ব্লু-ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি উঠে যেত।

পাঁচ ডলার মানে ষাট টাকা। দু'কিলো ভালো মুরগির মাংসের দাম। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে একটা কাঁচের দরজা পেলাম। সেটা ঠেলতেই প্যাণ্টি পরা এক টপলেস সুন্দরী আমাদের অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'ভেতরে বসার সুবন্দোবস্ত আছে।' চা-বাগানে মদেশিয়া রমণীদের আঙরাভাসা নদীতে স্নানরতা অবস্থায় দেখে আমার বালককালে কোনো অস্বস্তি হয়নি। কিন্তু এখন শরীর ঘিনঘিনিয়ে উঠল।

একাডেমির মতো একটা প্রেক্ষাগৃহ। কিন্তু আধা অন্ধকারে বুঝলাম দর্শকের সংখ্যা এই সুসময়েও জনাসাতেক। মঞ্চের পেছনে টাঙানো পর্দায় একটি ব্লু-ফিল্ম চলছে। আমরা চেয়ারে না বসে পেছনে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। ছবির দিকে তাকানো যায় না। দেখলাম প্যাণ্টি পরা টপলেস মেয়েরা ট্রের দড়ি গলায় ঝুলিয়ে ড্রিঙ্কস বিক্রি করার চেষ্টা করছে। এইসময় ছবি শেষ হলো। একটি মেয়ে উইংসের পাশ দিয়ে ঢুকল স্টেজে। যেন টায়ার্ড হয়ে নিজের ঘরে ঢুকেছে। স্টেজে একটা খাট পাতা রয়েছে। মেয়েটি সব জামাকাপড় বেমালুম খুলে দর্শকদের অঙ্গপ্রতঙ্গ দেখাল। তারপর একটি পুরুষ দ্বিতীয় উইংস দিয়ে প্রবেশ করে তার সঙ্গে শৃঙ্গার করতে লাগল। পৃথিবীর কুৎসিততম সেইসব দৃশ্য দর্শকরা দেখছে তন্ময় হয়ে। সব চুকে যাওয়ার পর আলো জ্বলতেই দেখলাম সাত জনের মধ্যে জনা পাঁচেক বৃদ্ধ আর দুজন আরব দর্শক বসে। মনোজ বলল, 'ওরা কিন্তু অভিনয় করল। আট ঘণ্টার চাকরিতে অন্তত আটবার দর্শকদের সামনে এই অভিনয় করতে হয়।'

মানুষ যখন যন্ত্র হয়ে যায় তখন শরীরের এই নির্মম সুখের খেলা অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারে। ওদের লক্ষ্য রাখতে হয় দর্শক যেন তাদের ভাঁওতা ধরতে না পারে।

কেউ যদি সত্যিকারের জীবনের নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ করে ফেলে তাহলে তার চাকরি যাবে। খুব ইচ্ছে ছিল ছেলেটির সঙ্গে কথা বলি। সে কত মাইনে পায়, এই দক্ষতা কোন অধ্যবসায়ে অর্জন করল। মনোজ জানাল, তাতে নাকি প্রাণসংশয় হতে পারে। ছেলেটি এবং মেয়েটি একটি র‍্যাকেটের পুতুল। সেই

র‍্যাকেট ওদের কথা বলতে দেয় না। বেরুবার আগে দেখলাম আরব যুবকরা পসারিণীদের সঙ্গে পাশের ছোট ঘরে চলে গেল। খোলা বাতাসে নেমেও মনের ঘিনঘিনে ভাবটা কিছুতেই কমছিল না। হৃদয় ছাড়া যৌনতা আমার কাছে গ্রহণীয় নয়। নিগ্রো টাউটদের চিৎকারে ভ্রূক্ষেপ না করে আমরা কিছুটা এগোতেই থিয়েটার পাড়ায় চলে এলাম। ডেথ অফ এ সেলসম্যান হচ্ছে একটায়। অভিনয় করছেন ডাস্টিন হফম্যান। ক্র্যামর ভার্সেস ক্র্যামার দেখেছি গ্লোবে। আমেরিকান ছবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় অভিনেতাকে স্টেজে অভিনয় করতে দেখার লোভ হলো। কিন্তু জানলাম তিন মাসের মধ্যে টিকিট পাওয়া যাবে না। আর একটি স্টেজে অ্যান্টনি কুইন করছেন 'জোবরা দ্য গ্রীক'। মনে পড়ল হাঞ্চ ব্যাক অফ নটরডোম আর গানস অফ নভোরন ছবি দুটোর কথা।

পাশেই অফ ব্রডওয়ে পাড়া। আমাদের গ্রুপ থিয়েটারের মতো পরীক্ষামূলক নাটক করে থাকেন এরা। কিন্তু করেন অত্যন্ত প্রফেশনাল ভঙ্গিতে। মনোজ এইরকম একটা নাটকে কিছুদিন অভিনয় করেছে ভারতীয় চরিত্রে। সেই গ্রুপ থিয়েটার পাড়ায় এসে জানলাম রোজ হাউস ফুল হয়ে যায়। ভালো লাগল মিনিট দশেক দূরে পর্নো থিয়েটার যখন মাছি তাড়াচ্ছে তখন এখানে দর্শক আসছেন বিপুলভাবে।

হাঁটতে হাঁটতে কতটা চলে এসেছিলাম খেয়াল নেই হঠাৎ মনোজ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল একটি দোকানের দিকে। এক মহিলা সম্ভবত তাঁর স্বামীর সঙ্গে কিছু কিনছিলেন। কিন্তু মহিলা সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি আসতেই তিনি সোজা এগিয়ে এলেন সামনে। ফর্সা, সুন্দরী, জিনস পরা মহিলাটি ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা তো ভারতীয়। খুব ভুল যদি না করে থাকি তাহলে বাঙালি। আপনি কি কখনও জলপাইগুড়িতে ছিলেন?'

রোমাঞ্চিত হলাম। নিউইয়র্কেও জলপাইগুড়ির নাম। স্বীকার করতেই জিজ্ঞাসা করলেন, এবার অবশ্য বাংলায়, 'যদ্দুর মনে হচ্ছে আপনার নাম সমরেশ মজুমদার?'

এবার পুলক মনেও। শুধু আমার বই নয়, এখানে আমার নামও জানে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাকে চিনতে পারলাম না তো?'

'সে কথাই বলছি। না চিনে কেন লিখতে যান।'

'মানে?'

'আপনি নাকি কি একটা বইতে আমাকে, আমাদের নিয়ে স্ক্যান্ডাল করেছেন? আমি পড়িনি। আপনার চেহারাটা অনুমান করেছিলাম। দেশ থেকে একটা চিঠিতে ব্যাপারটা জেনেছিলাম। ট্রাশ। সেই স্ক্যান্ডাল লিখেই কি আমেরিকায় এসেছেন? সিটু।' বলেই হনহন করে ফিরে গেলেন স্বামীর কাছে। গিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরলেন। আমি হতবাক। কে এ? স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। রম্ভা, উর্বশী না সীতা! কিন্তু যেই হোক মেয়েরা ফেলে আসা দিনের ছবি স্মৃতির আরশিতে দেখতে ভালবাসে না? কারণ, জ্ঞানত আমি কখনও মিথ্যে কথা লিখিনি।

৭

বিদেশে কিছুদিন থাকলেই বোঝা যায় পৃথিবীটা কত ছোট। বঙ্গসন্তানদের ভুলিয়ে রাখা খুব সহজ কাজ। একটু তোষামোদ করলেই তেনারা মিথ্যে কথাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করেন। বাঙালির ইতিহাস নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন না আমাদের কী ছিল কী হলো। আমাদের যে কিছুই ছিল না এইটেই এখন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। ভারতবর্ষ চিরকাল বিদেশীর দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে। মোগলরা পর্যন্ত আমাদের এক করতে পারেনি। ব্রিটিশরা দুশো বছর ধরে ধামাচাপা দিয়ে একত্রিত রেখেছিল। সেটা যে মন থেকে নয় তার প্রমাণ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অসম পাঞ্জাব থেকে শুরু করে পশ্চিমবাংলায় বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অথচ আমাদের কবি যখন লিখলেন 'ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' তখন কেউ প্রশ্ন করেনি 'আবার' মানে কবে শ্রেষ্ঠ ছিল? ব্যাপারটা ভাবলেই ভালো লাগত। তখন শিমুলতলায় গেলে বলা হতো পশ্চিমে গিয়েছেন। বিলেত ফেরত মানুষ দ্রষ্টব্য ছিলেন। আজও যদি কেউ আমেরিকা ইউরোপ যায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাশভাগ মানুষ বিস্ময়ে তাকায়। কিন্তু লন্ডনের যাতায়াত ভাড়া যে তিনবার বম্বে যাতায়াতের চেয়ে কম সেটা জানা থাকে না তাঁদের। বলা যায় সত্তরের আগে থেকে কিছু শিক্ষিত মানুষের আনাগোনা বাড়ল বিদেশে। এখন তো জলভাত। কলকাতার ফ্ল্যাটে বাঙালি যে গলায় ঝগড়া করে তা নিউইয়র্কেও হয়। মনোজ বলেছিলো, 'আপনি এখানে এসেছেন তা অনেকে জেনে গেছে।'

'কী করে জানল ?'

'আপনার কামালের কৃপায়। সবাই বলছে ব্যাপার কী কবে বসবে ?'

মনোজকে আমি বারংবার নিষেধ করেছিলাম এ ব্যাপারে। কিন্তু নিউইয়র্কে বাঙালিদের কয়েকটা আড্ডা আছে, ওকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হয়। বোঝা যাচ্ছে ইচ্ছে থাকলেও সামনের শনিবার ব্যাপারটা এড়ানো যাবে না। এ ব্যাপারে যা শুনলাম তা চমকপ্রদ। এঁদের যখন ছুটি হয় তখন আকাশে সূর্য-দেব বহাল থাকেন। কিন্তু সোম থেকে বৃহস্পতি কাউকে নেমন্তন্ন করলেও তিনি আসবেন না। উইক এন্ড ছাড়া বেরুবার কথা ভাবতে পারে না এরা। অথচ কাজের দিন বিকেল থেকে ঘণ্টা পাঁচেক বাড়িতে বসে থাকলেও বেরুবার সময় পরের দিনের অফিসের দোহাই দেবেন। জানি না এই কারণেই হয়তো এখানে দুর্গাপুজো দুই সপ্তাহ ধরে শনি রবিবারে হয়। যেহেতু শনি রবি ছুটি তাই শুক্র এবং শনিবারে এঁরা সামাজিকতা করতে বের হন। দেখা যাবে ডায়েরির পাতায় এক একজন প্রায় তিন চার সপ্তাহের ওই ছুটির দিন আগাম বুকড্ হয়ে আছেন। মনোজ আমাকে আশ্বস্ত করল, যাঁরা আসছেন তাঁরা মোটামুটি গল্প উপন্যাস পড়েন, দেশের হালফিল খবর রাখেন এবং কেউ কেউ পত্র-পত্রিকায় লেখেনও।

পৃথিবীটা ছোট হয়ে গেলেও বাঙালি বাঙালিতেই আছে তা নিউইয়র্কে গেলে চমৎকার বোঝা যাবে। যে ছিল পাড়ার পটলদা, রকে বসে আড্ডা মারত, কোনো মামাকে ধরে একটা চাকরির স্বপ্ন দেখত সে-ই আমেরিকায় পৌঁছে রীতি-মত সাহেব হয়ে আমেরিকানদের চেয়েও বেশি আমেরিকান হয়ে যেত। মনোজের উপন্যাস অনুযায়ী যে চিত্রনাট্য শুরু করেছি তাতে এইরকম এক প্রৌঢ় চরিত্র বাড়িতে লুঙ্গি পরে থাকেন কিন্তু কলিং বেল বাজলেই ঝটপট স্যুট পরে হ্যালো বলে দরজা খোলেন। মেয়েকে নির্দেশ দেন, 'দ্যাখো, যদি বিয়ে করতেই হয় তো কোন বাঙালিকে করবে যে দেশে ফিরবে না। সেরকম না পেলে আমেরিকান ফেয়ার স্কিন। বাট কোনো কালুয়াকে নেভার।' কালুয়া মানে নিগ্রো যারা এখন আমেরিকার অর্ধেক জনতা। সাদা আমেরিকানরা তাদের কালো সতীর্থদের যতটা এড়িয়ে না চলে বাঙালিরা তার বহুগুণ সেই মানসিকতা দেখায়।

চিত্রনাট্যের কাজ চলছে দুপুরে। মাটির তলার ঘরে শুয়ে বসে আমি আর মনোজ লিখছি। সামনে একটা টি ভি খোলা। এতরকমের ছবি একসঙ্গে দেখার অভিজ্ঞতাও অসাধারণ। কামাল প্রায়ই ফোন করে বস্টন থেকে। জুলি নামের সেই নিগ্রো মেয়েটি যে লসএঞ্জেলসে থাকে তার টেলিফোন নম্বর দিয়েছে আমাকে। চিত্রনাট্যের এক জায়গায় আমি আবার আটকালাম। নিউইয়র্কে কোন বাঙালি মেয়ে একা কিভাবে থাকে তা জানা নেই। এখানকার বাড়িওয়া-লারা কি একা মেয়েকে ফ্ল্যাট দেয় ? মনোজ উঠে পড়ল, 'চলুন'।

এখন দুপুর আড়াইটে। আমাদের ব্রেকফাস্ট সবে হয়েছে। আকাশে অবশ্য সূর্য-দেব বিন্দুমাত্র কঠোর নন। গাড়িতে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় যাচ্ছি বলুন তো ?'

মনোজ বলল, 'একজন ভদ্রমহিলার কাছে যিনি এ মাস পর্যন্ত একা আছেন।'
'এ মাস পর্যন্ত মানে ?'
'আগামী মাসে ওর বিয়ে। বিয়ে মানে নিজেই বিয়ে করছেন। ভদ্রমহিলা ডিভোর্সি।' আগাম কৌতূহল আজকাল আর প্রকাশ করি না। ঈশ্বর সর্বত্র এতো রহস্য মজুদ রেখেছেন যে আগে থেকে ভেবে লাভ কী। বেরুবার আগে মনোজ টেলিফোন করেছিল ওপাশ থেকে সাড়া পায়নি। কিন্তু ওর ধারণা মিনিট চল্লিশেক যেতে লাগবে এবং এর মধ্যে মহিলা ফিরে আসবেন। শ্যামবাজার থেকে গড়িয়াহাট যেতে যে সময় লাগে ওখানে তার বারোগুণ রাস্তা একই সময়ে যাওয়া যায়। লিখতে লিখতে ফার্স্ট হ্যান্ড অভিজ্ঞতার সন্ধানে উঠে যাওয়ার কথা আগে কখনও ভাবতে পারতাম না। মনোজের সিগারেট খাওয়া বারণ। কিন্তু আমি আসার পর সেটা কমের দিকে নেই। মনোজ বলল, 'একসময় নিউইয়র্কের বাঙালি সমাজ এই মহিলাকে কনডেম করেছিল। ডিভোর্সের পর সবাই চেয়েছিল ও দেশে ফিরে যাক। এমন কি ওর বাবা মা কলকাতা থেকে ওকে সেইকথাই লিখেছিলেন কিন্তু ও ফেরেনি। তখন বঙ্গললনারা তাঁদের স্বামীদের ওপর নজর রাখতো যাতে ওর সঙ্গে না মেশে। একা লড়ে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। আমার চরিত্রটা ওকে ঘিরেই।'
প্রায় মিনিট পনের যাওয়ার পর ডান দিকে তাকাতে অন্তত হাজার পাঁচেক গাড়ি দেখতে পেলাম। সংখ্যাটা বেশিও হতে পারে। এতো গাড়ি এখানে কেন ? অফিস পাড়া তো এটা নয়। মনোজকে জিজ্ঞাসা করতেই বলল, 'ওটা রেসকোর্সে যারা গিয়েছে তাদের গাড়ি।'
'রেসকোর্সটা কোথায় ?'
'ওই যে স্টেডিয়ামের মতো দেখছেন, ওটা।'
অন্তত সিকি মাইল দূরে স্টেডিয়াম গোছের একটা কিছু। হঠাৎ মনোজ জিজ্ঞাসা করল, 'হাতে সময় আছে, যাবেন ? আপনার প্রথম উপন্যাস তো দৌড়। কলকাতার মাঠের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিউইয়র্কের রেসকোর্সের কতটা মিল দেখুন না।' ও গাড়ি ঘোরাল।
সেটা ছিল তিয়াত্তর সাল। সাহিত্যিক হিসেবে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় তখন বেশ খ্যাতিমান। ওঁকে ঘিরে আমরা কয়েকজন তরুণ লেখক রাণীগঞ্জ কোল হাউসে শিল্পী নিতাই দের অফিসে রোজ বিকেলে আড্ডা মারতাম। নিতাইদা মাঝে মাঝে রেসে যেতেন। এক শনিবার বরেনদার আগ্রহে আমরা ওঁর সঙ্গ নিলাম। সেকেন্ড এনক্লোজারে গিয়েছিলাম। তিরিশ টাকা হেরেছিলাম। খুব সঙ্কোচ এবং ভয় ছিল, যদি কেউ দেখে ফেলে। সেদিনই প্রথম রেসের বই দেখেছিলাম। যে জিনিসটি আমাকে আকর্ষণ করেছিল তা হলো ঘোড়ার নামগুলো। রয়েল চ্যালেঞ্জ কোনো ঘোড়ার নাম হতেই পারে কিন্তু ল্যাপিস ল্যাজলি ? আমরা ঢুকেছিলাম সেকেন্ড ক্লাশে। গিয়ে জেনেছিলাম ঘোড়াদেরও ক্লাশ আছে। বি ক্লাশ থেকে ফাস্ট ক্লাশ। যত ওপরের ক্লাশে ঘোড়া উঠবে তত তার দাম বাড়বে। জিতে জিতে প্রমোশন পেয়ে ঘোড়ারা ওপরের ক্লাশে ওঠে। কিন্তু এসবের বাইরে যেটা

আমার চোখে পড়েছিল তা হলো রেসকোর্সের দর্শক। বাঙালির ছেলের ঘোড়া-রোগ ধরলে শুনেছি সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। প্রথম দিনেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যিনি পঞ্চাশ বছর ধরে রেসে আসছেন। মাসে একশ টাকার বেশি খেলেন না। হারলে ওই অঙ্কই। বলেছিলেন, 'এটাই আমার রিক্রিয়েশন হে। যে জিততে আসবে সে পানি পাবে না যে এই অঙ্কভিত্তিক খেলাটাকে আনন্দ পাওয়ার জন্যে নেবে তার মতো খুশি কেউ নেই।'
নিতাইদার সঙ্গে কিছুদিন মাঠে গিয়ে একটা টাকাও না খেলে মানুষ দেখেছি। রেসের মাঠে যা হয় তার বাইরে সম্ভবত দশগুণ কান্ডকারখানা চলে। কত পরিকল্পনা এবং হ্যাঁ, ষড়যন্ত্রও। যতক্ষণ না শেষ রেসের ঘোড়াগুলো খাঁচা থেকে না বের হয় ততক্ষণ রেসের মাঠে একটা ক্লাশলেস জনতা তৈরি হয়ে থাকে। এই জনতা কোনো অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা ভাবে না, সামাজিক স্ট্যাটাস নিয়ে মাথা ঘামায় না। কেরাণী এবং কোটিপতির মধ্যে ওই ক'ঘণ্টায় চমৎকার আঁতাত তৈরি হয়ে যায়, ড্রাইভারের কাছে টিপস নেয় অধ্যাপক। এই মানুষগুলোকে নিয়ে গল্প লিখলাম দেশে, 'রাজার খেলা।' হঠাৎই মনে হলো রেসকোর্সের জকির জীবন আমাদের আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রার প্রতীক। যাহোক, বঙ্গসন্তান রেসে যায় তা মুখ ফুটে বলে না আজও, যদিও রেস একটি সরকার স্বীকৃত জুয়া। দেখলাম বিখ্যাত গায়ক, সাহিত্যিকও মাঠে আসছেন। এবং তাঁদের সঙ্গে রেস নিয়ে আলোচনা করছেন যাঁরা তাঁদের শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। পরে বোম্বে দিল্লি মাদ্রাজে যখন গিয়েছি তখন সেখানকার রেসকোর্স-গুলোতে ঢুঁ মেরেছি। দেখেছি জনতার চরিত্র এক।
মনোজ গাড়ি পার্ক করে কয়েক পা এগোতেই একটা বাস এসে দাঁড়াল সামনে। এটি যাবে একেবারে রেসকোর্সের দরজায়। রেসকোর্সের নিজস্ব বাস। টিকিট লাগে না। পার্কিং, লট থেকে মেইন গেট পর্যন্ত যাওয়া আসা করে। জানলাম রেস শুরু হয়েছে ঘণ্টা দুয়েক আগে।
দশ ডলারে দুটো টিকিট গেট কেটে পার হলাম। ভারতবর্ষের রেসকোর্সগুলোর সামনে হকাররা রেসবুক বিক্রি করে। এখানে কেউ নেই। হঠাৎ দেখলাম এক বুড়ো নিগ্রো বেজার মুখে উল্টোদিক থেকে আসছেন। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনিই জিজ্ঞাসা করছেন, 'এর আগে এখানে এসেছ?' মনোজ মাথা নেড়ে না বলতেই, 'আশা করি আমার মতো ভাগ্য তোমাদের হবে না' বলে রেসবুকটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। মানুষটি যে খুব হেরে গেছে বোঝা যাচ্ছিল। সামনেই লিফট। সেটায় উঠে রেসের বই খুলে দেখলাম কিছুই বুঝছি না। কলকাতার মতো লেখা নয়। তবে রেস হয়ে গেছে চারটে। আরও তিনটে বাকি। নিগ্রো ভদ্রলোক প্রথম চারটে রেসে যে যে ঘোড়া জিতেছে তাদের নামের পাশে টিক দিয়ে রেখেছেন। একটা নাম দেখে ভালো লাগল, কিং অশোক। নিউইয়র্কের মাঠে কিং অশোক জিতেছে যার মালিক আরবের কোনো শেখ!
লিফট আমাদের নিয়ে এলো একটা বড় কাফের দরজায়। সেখানে টুলে বসে লোকজন পানীয় পান করছে আর রেসের বই দেখছে। সেটা ছাড়িয়ে একটু

এগোতেই হাওড়া স্টেশনের মতো বিশাল প্ল্যাটফর্ম দেখতে পেলাম। ওপরে ইলেক্‌ট্রিক বোর্ডে পরের রেসের ঘোড়াগুলোর দর জ্বলছে নিভছে। ওপাশের কাউন্টারে লোকে টিকিট কিনছে লাইন দিয়ে। একজনকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম মাঠটা কোথায় যেখানে ঘোড়ারা দৌড়ায় তখন সে এমনভাবে তাকালো যেন উজবুক দেখছে। কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে একটা বিশাল চাতালের ওপর উঠে আসামাত্র চোখ জুড়িয়ে গেল। কলকাতার রেসকোর্স ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মাঠ। কিন্তু এও বা কম কি। সবুজে ছেয়ে আছে। এখন ঘোড়াদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে। মনোজ বলল, 'এলাম যখন তখন একটা ঘোড়া খেলা যাক।' আমার মাথায় কোনো ঘোড়া সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। মনোজ পাশে দাঁড়ানো এক সাদা বুড়িকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন ঘোড়া জিতবে ?'
বুড়ি খিঁচিয়ে উঠল, 'সেটা যদি আমি জানতে পারতাম তাহলে ফ্রান্সে সামার ভিলা করতাম।' অকাট্য যুক্তি। মনোজ বললো, 'তাহলে এক নম্বরটা খেলি। দশ ডলার। আপনাতে আমাতে।' মনোজ চলে গেল টিকিট কাটতে। কলকাতা শহরেই একশ' টাকা কখনও খেলিনি বিদেশে এসে ওই টাকা খোয়াবো ? অবশ্য ভাগে পঞ্চাশ পড়বে। কিন্তু এখানে তো ডলার গোনাগুন্তি। জনতার দিকে তাকালাম। সংখ্যা বলতে পারব না। সাদা কালোয় মেশামেশি নেই। কলকাতার মতো ক্লাশলেস ক্রাউড বলা যাচ্ছে না। টিকিট নিয়ে এলো মনোজ। কম্প্যুটার পাঞ্চ করে দিয়েছে। রেস শুরু হলো। আমাদের এক নম্বর এলো অনেক পেছনে। দ্বিতীয় রেসেও দশ ডলার হারলাম আমরা এক নম্বর খেলে। মনোজ বললো, 'অনেক হয়েছে। এবার চলুন। আর বাড়িতে ফিরে এই ঘটনাটা গল্প করবেন না।'
বেরিয়ে আসছি। হঠাৎ বইটার দিকে নজর পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। নিতাইদা বলত প্রথম রেসে যে ঘোড়া জেতে তার ট্রেনার মালিক এবং জকি যদি শেষ রেসে কোনো ঘোড়ায় একত্রিত হয় তাহলে তার জেতার সম্ভাবনা নব্বুই ভাগ। প্রথম রেসে কিং অশোক জিতেছে। শেষ রেসে যে দশটা ঘোড়া ছুটছে তাদের একজনের নাম মোনালিসা। মালিক সেই আরবের শেখটি, ট্রেনার এবং জকিও কিং অশোকের। নিতাইদার কথা কি সত্যি হবে ? ওরা কি ডাবল করবে। সঙ্কোচে মনোজকে বললাম কথাটা। মনোজ বলল, 'দূর ! কলকাতার নিয়ম কি এখানে খাটে ? আর পয়সা নষ্ট করব না।'
কিন্তু আমি আরও দশ ডলারের ঝুঁকি নিলাম। লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে নিয়ে এলাম। স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে যখন ঘোড়াগুলো যাচ্ছে তখন মোনালিসাকে দেখতে পেলাম। সাত নম্বর। ধবধবে সাদা।
হঠাৎ মনোজ পাঁচ ডলারের নোট এগিয়ে দিলো, 'রাখুন। এক যাত্রায় আর পৃথক ফল হয় কেন ! পনের পনের করে হারলাম। তিরিশ ডলারে দুটো জিনসের প্যান্ট অথবা দু বোতল শিভাস্‌ রিগ্যাল কেনা যেত।' রেস শুরু হলো। আগের দুটোতেও দেখেছি যে ঘোড়া প্রথমে এগিয়ে যায় সে অবশ্যম্ভাবী হারে। তিন চারশো গজ যাওয়ার পরেই পেছনের গুলো তাকে টপকে যায়। অর্থাৎ

জিততে হলে প্রথমদিকে তিনচার নম্বরে থাকতে হবে। মনোজ বলল, 'বেরিয়ে চলুন সাদা ঘোড়া প্রথমে ছুটছে।'

মন খারাপ হয়ে গেল। মোনালিসা নাম্নী ঘোড়াটি সবার আগে ছুটছে। চারশো গজ যাওয়ার পরেই পেছন থেকে একটা ধূসররঙা ঘোড়া ওকে ধরে ফেলল। এখন পাশাপাশি ছুটছে ওরা। দর্শকরা চেঁচাচ্ছে। অবিকল কলকাতার মতো। কিন্তু মোনালিসা হাল ছাড়ছে না। সমানে লড়ে যাচ্ছে। বাঁক ঘুরে ওরা জোড়া তীর হয়ে ছুটে গেল উইনিং পোস্টের দিকে। পেছনের ঘোড়াগুলো নাগাল পেল না। শেষ মুহূর্তে বুঝতে পারলাম মোনালিসা জিতেছে। মনোজ উজ্জ্বল মুখে বলল, 'সমরেশ, আমবা জিতেছি।' বলতে না বলতেই ইলেকট্রনিক বোর্ডে মোনালিসার নাম জ্বলজ্বল করে উঠল। আমাদের উত্তেজনা দেখেই সম্ভবত সেই বৃদ্ধা ছুটে এলেন, 'তোমরা কি মোনালিসা খেলেছ ?'

মনোজ খুশিতে মাথা নাড়তেই বৃদ্ধা চিৎকার করে উঠলেন, 'পঁচিশের দরের ঘোড়া খেলে তখন আমার সঙ্গে রসিকতা করছিলে ? কোন ঘোড়া জিতবে ? কেন আমাকে বলতে কি হয়েছিল ?' মনোজ বলল, 'ম্যাডাম, বিশ্বাস করুন আমরা আন্দাজে খেলেছি।' অসন্তুষ্ট বৃদ্ধা বকর বকর করতে করতে চলে গেলেন। পঁচিশের দর ? আমরা হাতে পেলাম দুশো তিরিশ ডলার। তিন রেসে প্রত্যেকের পনের করে খরচ হয়েছিল। সেটা ফিরিয়ে নেবার পর দুশো ডলার রইল লাভের খাতে। দু'হাজার টাকার বেশি। মনোজ বলল, 'এই টাকাটা দিয়ে সবাই মিলে আনন্দ করা যাক সমরেশ। আপনার আপত্তি আছে ?'

বললাম, 'বিন্দুমাত্র নয়।' পার্কিং লটের দিকে আসবার সময় বারংবার নিতাইদার কথা মনে পড়ছিল। চোখের দৃষ্টি প্রায় হারিয়ে নিতাইদা ছবি আঁকার কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন। টালিগঞ্জের এমন একটা জায়গায় যেখানে আমাদের পরিচিত কেউ যায়নি। শুনেছি খুব আর্থিক সংকটে আছেন এখন। কিন্তু আমাদের পকেটে যে দু'শো ডলার এলো লস্ কভার করার পর সেটা নিতাইদারই দান। রেস এমন একটা অঙ্ক যা পৃথিবীর সর্বত্র প্রযোজ্য।

ম্যাকডোনাল্ডের মিল্কসেক আমার খুব প্রিয়। জানি ওই জমাট ঠাণ্ডা চকোলেট মেশানো ক্ষীর ক্ষীর দুধ খাওয়া মানে ওজন বাড়ানো তবু লোভ সামলাতে পারতাম না। রেসকোর্স থেকে বেরিয়ে গাড়ি নিয়ে মণিকা সেনের বাড়িতে যাবার পথে ম্যাকডোনাল্ডে নেমে ওটা খেয়ে নিলাম। মনোজের মুখে শুনেছি আমেরিকার বাঙালীদের বাড়িতে অসময়ে কেউ গেলে কিছু খাওয়ানো হয় না। এটা অসময় কিনা জানি না তাই রিস্ক নিলাম না। ম্যাকডোনাল্ড হলো সেই সুন্দর খাবারের দোকান যেখানে আমাদের মতো অভাগারা সস্তায় খেতে পারে। প্রতি ছ'ঘণ্টা অন্তর এদের সেলসম্যান এবং টেবিল বয় পাল্টায়। আর এরা বেশিরভাগই এশিয়ার দেশগুলো থেকে আসা ছাত্র।

ভদ্রমহিলার নাম মণিকা সেন। বিয়ের পর মিত্র হয়েছিলেন এখন আবার সেন।

লিফটে সাততলার ফ্ল্যাটে ওঠার আগেই মনোজ এই খবরটুকু দিয়েছিল। বোতামে চাপ দেওয়ার কয়েক সেকেন্ড বাদে দরজা খুলল। দেখলাম মধ্য তিরিশের এক স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী মহিলা দাঁড়িয়ে, 'আরে মনোজ, কি খবর? এসো। আসুন।' ভদ্রমহিলার পরনে একটা জিনসের প্যান্টের ওপর জ্যাকেট। এটা এদেশের মেয়েদের অভ্যস্ত পোশাক, মাঝে মাঝে জরুরিও।

মনোজ বলল, 'তোমায় ফোন করেছিলাম। বেজে গেল। তাই গেট ক্র্যাস করতে হলো।'

'আমি এইমাত্র ফিরেছি। গেট ক্র্যাস আবার কি! বসো।'

'আমার বন্ধু সমরেশ মজুমদার। তুমি কলকাতা ছাড়ার পর লেখা শুরু করেছে। আমার ছবির স্ক্রিপটটা ও লিখে দিচ্ছে। তুমি ওর লেখা পড়নি!'

'সত্যিকথা। খুব অশিক্ষিত হয়ে গেছি। আমার চরিত্রটা কেমন লাগছে!'

'আপনার চরিত্র?'

'বাঃ! ওটাতো আমি।'

মনোজের নায়িকা লড়াই করেছে এখানকার প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে। নিউ-ইয়র্কের বাঙালি সমাজ ওকেও এক ঘরে করেছিল একমাত্র শৈবাল ছাড়া। লিফটে ওঠার আগে আমি বুঝতে পেরেছিলাম মনোজ চরিত্রটি বানায় নি। টিয়ার কাছেই যাচ্ছি আমি। তবু ভেবেছিলাম কোনো ভদ্রমহিলাকে একটু ব্যবধান রেখে কথা বলা উচিত। তাই বিস্ময় দেখিয়ে ছিলাম।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'মনোজের সাহস আছে তাই লিখেছে। ও আপনাকে কিছু বলেছে?'

'বিশেষ কিছু নয়।'

'তাহলে আপনি আসলেন কেন?'

'আপনাকে দেখতে।'

'বলুন কি দেখতে চান?'

'এই ফ্ল্যাটে একা থাকেন আপনি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপত্তি আছে?'

'আরে না না। এভাবে বলছেন কেন?'

'একা থাকার পর উড়ো ফোন আসতো। কেউ কেউ জ্ঞান দিত। অবশ্যই সবাই বাঙালি।'

'আমি দুঃখিত, কিন্তু আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন।'

[ম]ণিকা সেন কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকালেন, 'সরি, আমাকে ভুল বুঝবেন না।' মনোজ এবার হাসল, 'ব্যস। উত্তেজনা শেষ করো এবার। তোমার খবর ভালো?'

'তুমি জানো না?'

'জানি।'

'খুশি?'

'আশ্চর্য! বিয়ে করছো তুমি? খুশি হওয়ার কথা তোমার।'

মণিকা সেন এবার আমার দিকে তাকালেন, 'আচ্ছা সমরেশবাবু, আপনি তে
লেখেন, প্রেমের সংজ্ঞা ঠিকঠাক বলতে পারেন ?'

'অসম্ভব। স্বয়ং ঈশ্বরও বলতে পারবেন না।'

'ঠিক কথা হলো না। মানুষ অনেক রকমের প্রেম করে। এই ধরুন, যদি বলি
আমি মনোজকে খুব চাইতাম। ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতাম। ওর জীবনযাত্রা
কথা আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করতো। কিন্তু যখন জানলাম নিজের সংসা
ছেড়ে মনোজের বেরিয়ে আসা সম্ভব নয় তখন ওর পারিবারিক শান্তির জন্যে
নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। তখন আমার প্রেম কি মরে গেল ? না, না, মনোজে
নাম আমি উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করলাম, ওর দিকে তাকাবেন না। কিন্তু
বলুন, প্রেম মরে গেল ? আমি বাকি জীবন ওকে নিজের মতো করে ভালবেসে
যেতে পারি। কিন্তু তাই বলে যদি এরপরে অন্য পুরুষ আমার জীবনে আসে
এবং তার ব্যবহার, রুচি দৃষ্টিভঙ্গী খাবাপ না লাগে তাহলে তার সঙ্গে একটা
সম্পর্ক তৈরি হতে পারে যা বিয়েতে গিয়ে পরিণতি পেতে পারে। এবং সেই
মুহূর্তেও কিন্তু আমি মনোজকে আমার মতো করে ভালবেসে যেতে পারি
অবশ্যই আমি এমন কাজ করব না যাতে আমার স্বামী আঘাত পান। আপনি
এটা মানেন ?'

'মানি।'

'মন রাখার জন্যে বলছেন ?'

'না।'

'তাহলে আপনার সঙ্গে আমার জমবে।'

'ফ্ল্যাটটা পেতে আপনার কোনো অসুবিধে হয়নি ?'

'এটা কলকাতা নয় মশাই। এজেন্সি পয়সা নিয়ে বাড়ি দিয়েছে।'

'কোনো অসুবিধে হয়নি ?'

'এখন পর্যন্ত নয়। আপনি কি জানেন আমি বিয়ে করছি ?'

'জানি।'

'বিয়ের পর এই ফ্ল্যাট আমি ছেড়ে দেব। একজনের পক্ষে ঠিক ছিল।'

'টিয়াকে কিন্তু কিছু নিগ্রোরা রেপ করেছিল।'

'মনোজ তাই লিখেছে টিয়া যদি বিবাহিতা হতো তাও রেপড্ হতে পারত। আবা
যারা রেপ করে তারা একটি সুন্দর নারীদেহ ভোগ করতে চায়। একা মেয়ে
পাওয়া সহজ তাই মনোজ ও কথাটা লিখেছে। টিয়া বিবাহিতা হলে এবং ও
স্বামী বাইরে গেলেও একই ব্যাপার হতে পারত।'

'একলা মেয়ের জন্যে লোকের আগ্রহ বেশি থাকে না ?'

'থাকে। তবে আমেরিকায় কম।'

'আপনি কি অসুবিধায় পড়েছেন ?'

'টিয়া যা পড়েছিল। মনোজ তো আমাকে নিয়েই লিখেছে। স্বামী অন্য মেয়ে
সঙ্গে শুচ্ছে। বান্ধবীদের পাওয়ার জন্যে তাদের স্বামীদের সঙ্গে শুতে বলছে
অতএব ক্ল্যাশ লাগল। কলকাতার গন্ধ তো যায়নি শরীর থেকে। ঝামেলা বাড়ে

ডতে শেষ পর্যন্ত ডিভোর্স। আলাদা হলাম। চাকরি করি না। থাকার য়গা নেই। যারা এতদিন ঘনিষ্ঠ ছিল তারাও আমাকে রাখতে বিব্রত হলো। লকাতা থেকে বাবা মা লিখলেন ফিরে যেতে। একদিন সবাই ঈর্ষা করেছিল মাকে। আমেরিকায় প্রবাসী পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে বলে। এখন তারাই বে বামন হয়ে চাঁদ ধরতে গেলে এই দশা হবেই। বাঙালি কারো ভালো দেখতে রে না, দুর্দশা দেখলে খুশি হয়। মাথা নিচু করে ফিরে যেতে চাইলাম না। থম দিকে কি না করেছি। রেস্টুরেন্টে চাকরি, সেলসেও। পড়েছি সেই সঙ্গে। রপর একটা ভালো গোছের কাজ জুটে গেল। প্রথমদিকে যে হোটেলে ছিলাম খানে মাণ্টা নামের একটা মেয়ে ছিল? সে বলত, 'জানো মণিকা, প্রতিটি য়েই একটা রাত্রে বেশ্যার জীবন যাপন করে। যে রাত্রে তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রতে ইচ্ছে করে না কিন্তু বাধ্য হয় সেই রাত্রে সে তো বেশ্যা।' মেরী বলে কটা মেয়ে আমার রুমমেট ছিল। সে বলত, 'একটা পুরুষ আমার শরীরে র শরীর প্রবেশ করানো মাত্র আমি কেন অসতী হব? সেও তো সমান অসৎ। মার শরীর চাইছে সে প্রয়োজন মেটাচ্ছে। কিন্তু আমার প্রিয়জন চাইলে মার মন তার ডাকে সাড়া দেবে। কথাগুলো মাথার মধ্যে নানান ছবি াঁকতো। কিন্তু বিশ্বাস করুন কোন ছবিটা সত্যি সেটাই ধরতে পারতাম া।'

ণিকা সেনের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগছিল। বুঝতে পারছিলাম দ্রমহিলা কিছুটা কমপ্লেক্সে ভুগছেন। কিন্তু ওর চোখে জীবনটা এখন যেভাবে চ্ছ হয়ে এসেছে তা অনেক মেয়ে কল্পনা করতে পারবে না। মণিকা এখন কে বিয়ে করতে যাচ্ছেন তিনি ওঁর প্রয়োজন মেটাবেন এবং নিরাপত্তা দেবেন। ন্তু এর বিনিময়ে তিনি মণিকার কাছে আনুগত্য চাইতে পারেন। সে ব্যাপারে ণিকা ওঁকে কখনও ঠকাবেন না। কিন্তু স্বামীর কাছে অপমানিত হবার পর কলা হয়ে যে বিবাহিত পুরুষকে মণিকা ভালবেসেছিলেন, তাঁকে তিনি চিরকাল নের মণিকোঠায় জীবন্ত রাখবেন। মণিকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মনোজ, মাত্র নাদশেক মানুষকে নিমন্ত্রণ করব আমার বিয়ের পার্টিতে। তোমাকে ইচ্ছে করে াদ দিয়েছি।'

ন্যবাদ।' মনোজ বলল।

ণিকা বললেন, 'কতদিন আছেন আমেরিকায়?'

ানি না।'

একটা অনুরোধ করব?'

লুন।'

াপনার চিত্রনাট্যে শৈবালের সঙ্গে টিয়ার বিয়ে দিয়ে দেবেন।'

সাকি। কেন?'

টিয়া বেঁচে যাবে?' মণিকা হাসলেন, 'বাঙালি মেয়ে লাথি ঝাঁটা খেলেও ভাল-সার মানুষের বুকে মাথা রাখলে যে সুখ পায় তা কোথাও পাবে না। আমার থা রাখবেন আপনি।'

'ভাবব। এইটুকু বলতে পারি।'

মণিকা একটু বাদে বেরুবেন। ভাবী স্বামী, যিনি আমেরিকান, তাঁর সঙ্গে ডিনার করতে যাবেন। আমরা চুপচাপ নিচে নেমে এলাম। বিদায় নেবার সময়েও মণিকা মনোজের সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেননি। বরং ওর স্ত্রী এবং বাচ্চাদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

নিচে নেমে আমি মনোজকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই ও বলল, 'এবার আপনি টিয়াকে বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। লিখতে অসুবিধে হবে?'

বললাম, 'না। কিন্তু মনোজ, সেই ভাগ্যবানটা কে?'

'আমি জানি না।' মনোজ জবাব দিলো।

গাড়িতে ওঠার পর মনোজ আজ তেমন কথা বলছিল না। এর মধ্যে রাত বেড়েছে নিউইয়র্কে অন্ধকার নেমেছে। মনোজ বলল, 'চলুন ম্যানহাটনে যাই।'

'বাড়িতে চিন্তা করবে না?'

'আমি ফোন করে দেবো।'

সেই রাত্রে আমরা অকারণ শুধু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছিলাম। কেন ঘুরেছিলাম তা আজও আমার কাছে ব্যাখ্যাহীন। রাত দু'টো নাগাদ মনোজ বলল, 'খুব তেষ্টা পেয়েছে। চলুন একটা ফ্যামিলি পাবে যাই।'

'ফ্যামিলি পাব?' শব্দ দু'টো আমার কাছে নতুন।

'চারপাঁচটা ব্লকের মানুষ যে পাবে আড্ডা দেয় তার নাম ফ্যামিলি পাব। সবাই সবাইকে চেনে। আজ শুক্রবার। সবাই আড্ডা দিচ্ছে।'

মনোজ আমাকে যেখানে নিয়ে এল সেটা একটা লম্বাটে রেস্টুরেন্ট। লম্বা লম্বা টুলে বসে আছে খদ্দেররা। টি. ভি. চলছে। খুব শান্ত পরিবেশ। কাউন্টারের সামনে লম্বা টুলে আমরা বসলাম। বারম্যান এসে বলল, 'দিস ইজ চার্লি। তোমাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারি?'

মনোজ বলল, 'আমাকে একটা কোক দাও আর আমার বন্ধুকে হুইস্কি।'

আমেরিকায় যারা গাড়ি চালায় তাদের মদ খাওয়া নিষেধ। ধরা পড়লে প্রচুর ফাইন। আমি বাঁদিকে তাকালাম। ঠিক আমার পাশের টুলে এক স্বর্ণকেশী কাউন্টারে মাথা রেখে ঝুম মেরে পড়ে রয়েছেন।
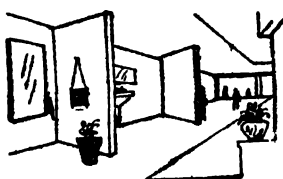
৮

মাতাল মহিলা বড় একটা দেখা যায় না। চা-বাগানে মাইনের দিনে কিছু বৃদ্ধা মদেশিয়াকে অবশ্য দেখেছি হাঁড়িয়া খেয়ে টঙ্ হয়ে মদের ভাঁটি থেকে লাইনে ফিরে যেতে টলতে টলতে। সেটা ছেলেবেলায় খুব স্বাভাবিক মনে হতো। কলকাতায় যেসব বাঙালি মহিলা মদ্যপান করেন তাঁরা কখনই মাতাল হন না। বড় জোর সামান্য টিপসি। আর হলেও হাতে গোনা যায়। আমার সৌভাগ্য হয়নি তাঁদের দর্শন পাওয়ার। রামচন্দ্র সেন বলতেন, 'বাপু হে, মেয়েদের পেটে ঈশ্বর শুধু লিভার রাখেননি। তার সঙ্গে রেখেছেন একটি ব্লটিং পেপার। সেটা যেমন সমস্ত দুঃখ কষ্ট শুষে নেয় তেমনি অ্যালকোহলও। লঙ্কা ছাড়া কোনো কিছুতেই সেই বস্তু ঘায়েল হয় না। মদ খেয়ে যে মেয়ে মাতালনী হবে সে মেয়ে পদবাচ্যই নয়।' এ ব্যাপারে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন কিন্তু কলকাতায় যেসব মহিলাদের আমি মদ খেতে দেখেছি তাঁরা মুখভঙ্গীতে লেবুর জল খাওয়ার চেহারাটা ধরে রাখতে পারেন।

কিন্তু এখন আমি হলফ করে বলতে পারি আমার পাশের টুলে যে স্বর্ণকেশী বসে থাকার চেষ্টা করেছেন কাউন্টারে মাথা বেখে তিনি আর নিজের মধ্যে নেই। ওঁর মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না বিপরীত দিকে ফিরিয়ে রাখায় কিন্তু শরীর নড়ছে না, পরণের স্কার্টে যে রঙের বাহার তাও যেন স্থির হয়ে রয়েছে। মাতালনীদের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা অনুচিত ভেবে আমি মনোজের সঙ্গে কথা বলছিলাম। আমরা যখনই কথা বলি তখন ঘুরে ফিরে চিত্রনাট্যের প্রসঙ্গ আসে।

আমি ওর উপন্যাসের ডালপালা ছেঁটে ছিমছাম নাটকে নিয়ে এসেছি গল্পটাকে। অনেক লেখক শুনেছি এ কারণে পরিচালকের ওপর খুব অসন্তুষ্ট হন কিন্তু চিত্রনাট্য যে ফিল্মের প্রয়োজনে লেখা হয়, সাহিত্যের কার্বনকপি নয় এটা তাঁরা খেয়ালে রাখেন না। মনোজ কিন্তু একটুও প্রতিবাদ করেননি। আমাদের বিতর্ক হচ্ছিল ছবির শেষ নিয়ে। আমরা একমত হচ্ছিলাম না।

হঠাৎ আমার বাঁ দিকের কাঁধে মৃদু টোকা দিলো কেউ। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম স্বর্ণকেশী সোজা হয়ে বসতে চেষ্টা করছেন। তাঁর কোমর থেকে উর্ধ্বাঙ্গ ফণা তোলা কেউটের মতো দুলছে। কিন্তু চোখ আধবোজা, এটুকুই ফারাক। কোনো সাহায্য দরকার ভেবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়েস'?

উনি জড়ানো ইংরেজিতে শুধালেন, 'আপনি কি পাকিস্তানি?'

গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে মনোজের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, 'সেরেছে'।

পরক্ষণেই দ্বিতীয়বার টোকা, 'দেন ইউ আর বাংলাদেশী।'

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'না ম্যাডাম, আমি ভারতীয়।'

'ইন্ডিয়া? ইন্ডিয়ান?' চোখ ছোট হয়ে এলো মহিলার, 'হুইচ পার্ট অফ ইন্ডিয়া?' ভালো লাগল। এ তাহলে ভারতবর্ষের ম্যাপটা দেখেছে। খোঁজ খবর রাখে। বললাম, 'ক্যালকাটা। ওয়েস্ট বেঙ্গল। নট বাংলাদেশ।'

এবার এক দৃষ্টিতে, যদিও সেই দৃষ্টি পূর্ণ নয়, দেখতে দেখতে সামান্য দুলে তিনি প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, 'আই হেট ইউ।'

আমার কানে যেন গরম জল ঢুকল। আমি কি ঠিক শুনেছি? মনোজের দিকে তাকালাম। সে পাবের দেওয়ালে টাঙানো টি ভি দেখছে। অত আস্তে উচ্চারণ ওর পক্ষে শোনা সম্ভবও নয়। আমি স্বর্ণকেশীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পার্ডন?'

হঠাৎ যেন সেই পাবের ভেতর এক ডজন গ্লাস ভাঙ্গল। স্বর্ণকেশী তাঁর গলার শিরা ফুলিয়ে পরিষ্কার চিৎকার করলেন টেনে টেনে, 'আই-হেট-ইউ!' মুহূর্তেই পাব-এর ভেতর ঠান্ডা নৈঃশব্দ্য নেমে এলো। সূচ পড়লেও যেন শোনা যাবে। ততক্ষণ মনোজের হাত আমার কাঁধে চলে এসেছে, জিজ্ঞাসা করছে, কি হয়েছে? সমস্ত খদ্দেরদের নজর এখন আমাদের দিকে। আমি এখন যাকে বলে দিশেহারা। কি বলব বুঝতে পারছি না। একটা হিম আতঙ্ক এখন আক্রমণ করেছে আমাকে। আর যিনি ওই আর্ত চিৎকারটি করলেন তিনি এখন শঙ্খচূড়ের মতো দুলছেন চোখ বন্ধ করে। কপালে তখন আমার ঘাম জমেছে।

ইতিমধ্যে বারম্যান ছুটে এসেছে। ব্যাকুল গলায় সে জিজ্ঞাসা করছে, 'হোয়াট হ্যাপেন্ড? হেই ডোরা, 'হোয়াট হ্যাপেন্ড?' স্বর্ণকেশী কোনো জবাব দিলেন না। সেই একই ভাবে দুলতে লাগলেন। এবার বারম্যান আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? কি করেছ তুমি'?

আমি কোনোরকমে বোঝাতে চাইলাম, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এই মহিলাকে জীবনে দেখিনি। আমি কেন ওর ঘৃণা পেতে যাব তাও জানি না।'

বারম্যান এবার, কথাটাকে অবিশ্বাস করেই, জিজ্ঞাসা করল, 'হেই ডোরা!'

এবার স্বর্ণকেশী ঠোঁট খুললেন, 'আই হেট হিম।' গলার স্বর তার মাঝারি পর্দায়।
'বাট হোয়াই? কি করেছে তোমার?' বারম্যান আরও ঝুঁকল কাউণ্টারের ওপাশ থেকে।
'বিকজ হি ইজ ইণ্ডিয়ান। বেঙ্গলি। ফ্রম ক্যালকাটা।'
'মাই গড। ডু ইউ নো হিম?'
'নো। বাট দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার।'
এবার মনোজ মুখ খুলল, 'লুক। আমি জানতাম এটা খুব রেসপেক্টবল ফ্যামিলি পাব্। এখানে একজন মহিলা সম্পূর্ণ বিনা কারণে এভাবে অপমান করবেন ভাবতে পারিনি। আমি কি তোমাদের কাছে এর ব্যাখ্যা চাইতে পারি?'
সঙ্গে সঙ্গে বারম্যান ছুটে এলো মনোজের সামনে, 'আই অ্যাম সরি। বাট শী ইজ ড্রাঙ্ক। কিন্তু ওর এই কাজটা আমি সমর্থন করছি না।' বলে আবার মহিলার সামনে ফিরে গিয়ে কড়া গলায় বলল, 'আমার খদ্দেরকে অপমান করার কোনো অধিকার তোমার নেই। এখনই এই পাব্ থেকে চলে যাও। কুইক।'
স্বর্ণকেশী চোখ খুলল না। কিন্তু বলল, 'না, আমি যাব না। আমি মদ খাব।'
'তুমি যদি না যাও তাহলে আমি ডোরম্যান্‌কে ডাকব। ডোরা—'
মহিলা তবু উঠছেন না। বারম্যান তালি বাজাতেই স্বাস্থ্যবান দারোয়ান এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। হঠাৎ মেয়েটির মুখ দেখতে পেলাম আমি। মদ খেলে কেউ কেউ কাঁদে। কিন্তু মেয়েটির ঠোঁটে এতো ঘৃণা কেন? মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলাম। বললাম, 'উনি যদি এই ব্যবহার আর না করেন তাহলে ওকে চলে যেতে বাধ্য না করলেই খুশি হব।'
কথাটা শুনে বারম্যান যেন একটু স্বস্তি পেল। ইশারায় দারোয়ানকে চলে যেতে বলে আমার দিকে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিলো, 'দিস ইজ চার্লি'। ডোরাকে আমি বছর দু'য়েক চিনি। পাশের ব্লকেই থাকে। খুব ঠাণ্ডা মেয়ে। আসে, ড্রিঙ্ক করে, চলে যায়। কোনোদিন ঝামেলা করেনি। আমি বুঝতে পারছি না আজ কি হলো। লুক ডোরা, এঁরা খুবই ভদ্রলোক। তোমার সঙ্গে পালটা খারাপ ব্যবহার করল না। হ্যাভ এ নাইস টাইম।' বারম্যান চলে যেতেই পরে আবার স্বাভাবিক আবহাওয়া ফিরে এলো। এবার আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম স্বর্ণকেশী ডোরা বিড় বিড় করে বলছে, 'কিন্তু আমি তবু ঘৃণা করি।' সঙ্গে সঙ্গে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু কেন?'
'বিকজ ইউ আর বেঙ্গলি, ফ্রম ক্যালকাটা। চোখ না খুলে জবাবটা দিলো ডোরা। এবার আমি গল্পের গন্ধ পেলাম। কলকাতার বাঙালি বলে মেয়েটা আমাকে ঘেন্না করছে। অর্থাৎ উপলক্ষ্য। হাত নেড়ে চার্লিকে ডাকলাম। চার্লি ছুটে এলো। আর একটা ভোদকা উইদ টনিক নিজের জন্যে আর কোক বললাম মনোজের জন্যে। তারপর চার্লিকে বললাম, 'ডোরাকে বল সে কিছু খাবে কিনা, আমার খরচে অবশ্যই।'

চার্লি মানুষটি দেখলাম মজার। এক চোখ টিপে হেসে চাপা গলায় বলল, 'ওর যা অবস্থা তাতে আর খাওয়ালে তোমাকে ক্যারি করতে হবে।'
ডোরা সম্ভবত কথাগুলো শুনতে পেল না কারণ সে সমানে দুলে যাচ্ছে। পান করতে করতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মনে হচ্ছে তুমি কোনো বাঙালিকে চেন ?'
'ইয়েস। অবশ্যই চিনি। চিনি বলেই তো ঘেন্না করি।' ডোরা তখন চোখ খুলছিল না।
'কি নাম তার ?' কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছিল।
'নাম ? সেন। পি সেন।'
সেই মুহূর্তে পি সেন নামক এক বঙ্গ সন্তানের জন্য খুব দুঃখিত হলাম। তিনি কি এমন কান্ড করেছেন যে তামাম বাঙালি জাতির উদ্দেশ্যে ডোরা ঘেন্না বর্ষণ করছে। পি থেকে তো অনেক কিছু হতে পারে। পি সেন নামে একজন মানুষকেও তো ইদানীং আমি চিনি না। আমি আরও খবরের আশায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'মিঃ পি সেন কি করেন ?'
'কি আবার করবে। আমার সঙ্গে চাকরি করত। ইউ এন-এ।'
মনোজ এতক্ষণ আমাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছিল। এবার বলল,'সমরেশ, আপনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একজন কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলছেন।'
মাথা নেড়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'করত মানে ? এখন করে না ?'
'নাঃ। সেন দেশে ফিরে গেছে। আশ্চর্য ! আমি কলকাতায় গিয়েও একদিনেও ওকে বের করতে পারলাম না। আই হেট হিম।' ডোরা চোখ খুলল, 'এই যে মশাই, এসব কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন ? আমি কোনো বাঙালির সঙ্গে কথা বলি না।'
'মদ পেটে পড়লে পৃথিবীর সবদেশের মানুষ এক হয়ে যায়, জানেন, না ?'
'হয় ? সত্যি ?' খুব সন্দেহের চোখে তাকালো ডোরা।
মনোজ মাথা নাড়ল। তারপর মার্কিন ইংরেজিতে বলল, 'এটা পুরোন প্রবাদ।'
'অ। তাহলে ঠিক আছে। আমরা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি'। তোমরা অবশ্য মুডটাই নষ্ট করে দিয়েছ।'
'আপনি কলকাতায় গিয়েছিলেন ?'
'বললাম তো। বারো ঘণ্টা ছিলাম।'
'মিস্টার সেনকে খুঁজতে ?'
মাথা নাড়ল ডোরা। জানি না কতক্ষণ সময় লেগেছিল তবে ফ্যামিলি পাব্ খুলে বন্ধ হয় ভোর চারটে নাগাদ। সেই বন্ধ হবার সময় এলে চার্লি যখন বলেছিল, বড্ড ঘুম পাচ্ছে হে, তোমরা এবার বাড়ি যাও তখন কথা থামাতে হয়েছিল। শেষের দিকে ডোরার নেশা ফিকে হয়ে এসেছিল। সব কথা এক সঙ্গে শুনতে পাইনি। বারংবার জিজ্ঞাসা করে যেটুকু জেনেছি তা হলো এইরকম।
ডোরা চাকরি করে ইউনাইটেড নেশনসে। বয় ফ্রেন্ড ছিল কিন্তু তারা কেউ স্বামী হবার যোগ্য নয়। এই সময় একটি ভারতীয় ছেলে যার নাম পি সেন এলো ওদের অফিসে। হ্যান্ডসাম, অন্তত ছ'ফুট লম্বা। ব্যবহার খুব ভালো। হেসে কথা

বলে। প্রথমদিনের আলাপেই ওকে খুব ভালো লেগে গেল ডোরার। মাঝে মাঝে ক্যান্টিনে একসঙ্গে লাঞ্চ করত। তারপর মাস তিনেকের মাথায় পর পর দু'দিন স্বপ্ন দেখল সে। সেন তার সঙ্গে স্বামী হিসেবে বাস করছে। ওর মনে হলো বিয়ে যদি করতেই হয় তো এমন মানুষকেই করা উচিত। কিন্তু তখনও প্রেমের কথা বলেনি ওরা। ডোরা লাঞ্চের সময়, অফিস থেকে বেরুবার সময় ওকে ঠারেঠুরে ইঙ্গিত করতে লাগল। (সে শুনেছিল ভারতবর্ষের মানুষেরা এখনও বউকে দরজা বন্ধ করে চুমু খায় তাই সেন সেই সব ইঙ্গিতে সাড়া না দেওয়ায় খুব অবাক হয়নি। তবে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে আপত্তি করেনি।

এক উইক এণ্ডে সেনকে নেমন্তন্ন করল তার ফ্ল্যাটে। ডিনার খাওয়াবে। খুব পরিশ্রম ও যত্ন করে রান্না বান্না করে চমৎকার সেজেগুজে নিল। সেন এলো ঠিক সময়ে। ডোরা ভেবেছিল সেন ফুল নিয়ে আসবে, আসেনি। বসার ঘরে বসে কথা বলতে বলতে ডোরা ঠিক করল ডিনারের পর সে সেনের কাছে প্রস্তাব দেবে বিয়ের। কিন্তু ডিনারের দেরি ছিল। অতএব ডোরা সেনকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি খাবে বল ?'

সেন খুব বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলো, 'যা তোমার ইচ্ছে।'

ডোরা বলল, 'না। তুমি কি খাবে ?'

সেন আবার জবাব দিলো, 'যা দেবে।'

ডোরা একটু বিরক্ত হলো, বলল, 'আমার কিচেনে কফি চা আছে। এনি সফ্ট ড্রিঙ্কস দিতে পারি। আর হুইস্কি এবং ভোদকা পাবে ; রাম অল্প একটু। কি খাবে ?'

সেন আবও নির্লিপ্ত গলায় বলেছিল, 'যা তোমার ইচ্ছে তাই দাও।'

ডোরা উঠে এসেছিল। মনে মনে বিরক্ত হয়েছিল। একটা পুরুষ মানুষের কোনো পছন্দ নেই ? অন্তত খাওয়াব ব্যাপারে ? বলতে পারত না কফি দাও অথবা হুইস্কি ? সে ইচ্ছে করেই ট্রেতে তার বাড়িতে যা ছিল তা সাজিয়ে সেনের সামনে নিয়ে এসে বলেছিল, 'আমার ইচ্ছে এসব তুমি খাবে।'

সেন অবাক হয়ে বলেছিল, 'এই সব আমাকে খেতে হবে ?'

জেদে মাথা নেড়েছিল ডোরা, 'হ্যাঁ, সব।'

তারপর অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল। সেন এক এক করে সব কটা কাপ আর গ্লাস খালি করল। প্রতিবাদ করতে গিয়েও করেনি ডোরা। তারপর সেন বলেছিল, 'আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছে, কোথাও শুতে পারি।' নিজের বেডরুমটা দেখিয়ে দিয়েছিল ডোরা। সেখানে জুতো খুলে শুয়ে পড়েছিল সেন। ডোরা বাইরের ঘরে ফিরে এসেছিল। ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল হয়তো কিন্তু তার স্বামীর নিজস্ব পছন্দ থাকবে। সে তাই চেয়েছিল সেনের কাছে। একটু বাদে ডিনার দেবার সময় ওই কথা বুঝিয়ে বলা যাবে। জেগেছিল যতক্ষণ ততক্ষণ ডোরা ঘরে গিয়ে দেখে এসেছে অকাতরে ঘুমাচ্ছে সেন। মায়া হয়েছিল বলে ডাকেনি। শেষ পর্যন্ত নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছিল বাইরের ঘরের সোফায়। ঘুম ভাঙল যখন তখন ঘড়িতে সাতটা। ধড়মড় করে উঠে বসে ডোরা দেখল সামনে

একটা চিরকুট অ্যাসট্রে চাপা দেওয়া রয়েছে, সেন নেই। চিরকুটে লেখা ছিল, 'তোমার আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ।' রাগে অপমানে কেঁদে ফেলেছিল ডোরা।

পর পর দু'দিন অফিসে আসেনি সেন। এলো যখন তখন এমন ভঙ্গী করত যেন ডোরাকে চেনে না। একদিন করিডোরে ধরেছিল সে ওকে, জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সেদিন না বলে চলে এলে কেন?' সেন জবাব দিয়েছিল, 'তুমি ঘুমাচ্ছিলে তাই বিরক্ত করিনি।'

'তোমার কোনো নিজস্ব পছন্দ নেই?'

সেন হেসেছিল, 'না। নেই।'

সেদিন থেকে আর কথা বলেনি ডোরা। যে মানুষের পছন্দবোধ নেই সে আর যাই হোক সভ্য মানুষ নয়। সেন সম্পর্কে সে এমন বীতস্পৃহ হয়েছিল যে ওর খবরই রাখতো না। সেন যে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইণ্ডিয়ায় ফিরে গিয়েছে তা অবশ্য জেনেছিল। এর বেশ কিছুদিন পরে ডোরা ভারতীয়দের ব্যাপারস্যাপার জেনেছিল। যেকোনো ভারতীয় কারও বাড়িতে গিয়ে মুখ ফুটে পছন্দ জানায় না। কারণ সে যে জিনিসটা চাইবে তা নাও থাকতে পারে গৃহকর্তার। তাই তিনি তাঁর সাধ্যমত যা দেবেন তাই গ্রহণ করে অতিথি। কিন্তু সেনকে সে জানিয়ে দিয়েছিল তার কাছে কি কি মজুদ ছিল। তা থেকে একটা পছন্দ করে নিতে পারত সেন। তবু বুকের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধত ডোরার। এর বেশ কিছুদিন পরে অফিসের কাজে সিঙ্গাপুরে যেতে হয়েছিল ওদের একটা দলকে। ফেরার সময় ডোরা ইচ্ছে করে কলকাতায় একদিনের স্টপ ওভার নিয়েছিল। থেমে থেমে ডোরা যে ভাষায় ওর অভিজ্ঞতা বলেছিল তা হলো অনেকটা এইরকম।

এয়ারপোর্ট থেকে খোঁজ খবর নিয়ে ক্যালকাটার একদম হার্টের একটা হোটেলে গিয়ে উঠেছিলাম। খুব বড় নয়, মিউজিয়াম ছিল পাশেই কিন্তু নট ব্যাড। আমি হোটেলের রিসেপশনে সেনের ঠিকানাটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ওকে কি করে পাব? রিসেপশন বলল এলাকাটা এতো দূরে যে আমার একার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। ওরা আমাকে বলল, হোটেলেই অপেক্ষা করতে, টেলিফোনে যোগাযোগ করবে। সেই বিকেলের ফ্লাইটেই আমার কলকাতা ছাড়ার কথা। পনের মিনিট অন্তর ঘর থেকে রিসেপশনকে ইন্টারকমে জিজ্ঞাসা করছি, 'সেনের লাইন কি হলো?' প্রতিবার ওরা বলেছে, লাইন পাওয়া যাচ্ছে না। হয় এনগেজড নয় অন্যকিছু। শেষ পর্যন্ত আমি রেগে বললাম, আপনারা টেলিফোন কোম্পানিকে কমপ্লেন করে বলুন লাইনটা পাওয়া জরুরি। রিসেপশন বলল তাতে কোনো লাভ হবে না ম্যাডাম। ক্যালকাটা টেলিফোনস এইরকমই। দুপুরে হঠাৎ গরম শুরু হলো। ঘরে থাকতে পারলাম না। কারণ জানতে চাইলে রিসেপশন বলল, লোডশেডিং শুরু হয়েছে ম্যাডাম। পাওয়ার কাট। এখন এদিকে কোনো আলো জ্বলবে না, পাখাও ঘুরবে না। আঁতকে উঠলাম, 'সেকি! তোমরা এসব মেনে নিয়েছ? কেস করা উচিত।' রিসেপশন এমনভাবে হাসল যেন আমি পাগল। বলল, 'এখানে এই রকমই হয়ে থাকে ম্যাডাম। বরং এখানে আমাদের জেনারেটার

চলছে, আরাম করে বসুন। আর হ্যাঁ, আপনার ওই টেলিফোনের লাইন পাওয় যাচ্ছে না। অন্তত একশ বার ডায়াল ঘুরিয়েছি।'

সুতরাং আমি ঠিক করলাম, আর নয়, এয়ারপোর্ট ফিরে যাব। আমার সঙ্গীর নিউ দিল্লিতে অপেক্ষা করছে। হোটেল থেকেই ট্যাক্সি ঠিক করলো। কিন্তু একটু এগিয়েই ওই গরমে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। ড্রাইভার বলল, সামনে মিছিল যাচ্ছে। দেখলাম হাজার হাজার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায় চুপচাপ। যেন কারও কোনো কাজ নেই। আর পিঁপড়ের মতো মানুষেরা রাস্তা আটকে যাচ্ছে চিৎকার করতে করতে। প্রায় একঘণ্টা ওইভাবে রইলাম। ট্যাক্সির মিটার উঠছে। ভয় হচ্ছিল সাত তাড়াতাড়ি বেরিয়েও শেষ পর্যন্ত ফ্লাইট না মিস করি। ড্রাই-ভারকে জিজ্ঞাসা করলাম। 'এসব কি ব্যাপার, তোমরা কেন প্রতিবাদ করছো না ? কত মানুষ এখন বিপদে পড়ে যাবে।'

ড্রাইভার হেসে বলেছিল, 'এখানে এইরকমই হয়ে থাকে ম্যাডাম।' প্রায় শেষ মুহূর্তে এয়ার পোর্টে পৌঁছাতে পেরেছিল ডোরা। গল্প শেষ করে সে বলেছিল, 'তোমরা বাঙালি ইন্ডিয়ান, তোমাদের কোনো পছন্দ করার শক্তি নেই, তোমাদের প্রতিবাদ করার মেরুদণ্ড পর্যন্ত নেই। তোমরা সবসময় আত্মসমর্পণ করো। অতএব তোমাদের ঘৃণা করে আমি কিছ অন্যায় করেছি বলে মনে হয় না।'

ডোরা আমাদের সঙ্গে বেরুল না। চার্লি আর এক ভদ্রলোককে অনুরোধ করলো ওকে পৌঁছে দিতে। চার্লি বলল, জেন্টলমেন, তোমাদের আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এই উইকটা আমার রাত্রে ডিউটি। ইচ্ছে হলে চলে এসো।' নিউইয়র্কে ভোর হতে তখনও দেরি। রাস্তার আলোগুলো ইতিমধ্যে হলদে হয়ে গিয়েছে। মনোজের পাশে বসে নিউইয়র্কের আর এক প্রান্তে ফেরার সময় আমার মনে তেমন কোনো অপমানবোধ কাজ করছিল না। বাঙালি হিসেবে ঘৃণিত হয়েও নয়। কারণ ইতিমধ্যে আমরা জেনে গেছি সভ্য মানুষের জন্যে নিম্নতম যে স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের পাওনা তা পাওয়ার যোগ্যতা আমরা অর্জন করিনি। পাশ্চাত্যের মানুষেরা নিজেদের হিসেবমত আমাদের সঙ্গে চললে হোঁচট খাবেনই।

ওয়াশিংটনে যাওয়ার দিন ঘনিয়ে আসছিল। সরকারি কর্তারা মনোজের ঠিকানায় টেলিফোন করে জানিয়েছেন নির্দিষ্ট দিনে আমি যেন ওখানে হাজির হই। নিউইয়র্ককে চার রাতে যত দেখেছি দিনে তার এক দশমাংশ দেখিনি। চিত্র-নাট্যের কাজ প্রায় শেষ। এইসময় বোস্টন থেকে ফুয়াদ এলো। সঙ্গে একজন সাদা চামড়ার লোক। রোগা উজ্জ্বল চেহারার বাংলাদেশী তরুণ ফুয়াদ চৌধুরি কথা বলে ধীরে। বলল, কামাল ভাই আপনাদের কথা আমাকে বলেছেন। আমি বস্টনের কলেজে ফিল্ম পড়াই। কিন্তু আমারও অনেকদিনের বাসনা এখানে একটা বাংলা ছবি করি। আপনাদের কাহিনীটা কি ?'

মোটামুটি বুঝিয়ে বলা হলো। দেখলাম বেশ উত্তেজিত ফুয়াদ। বলল, 'রাজী। তবে একটা কথা। আপনারা বাংলাদেশের কয়েকজন শিল্পীকে ডাকুন। ইন্ডিয়া বাংলাদেশ মিলে শিল্পী হলে দুটো সুবিধা। বাংলাদেশী সরকারের যা আইন

তাতে আটকাবে না ছবি ওখানে দেখানোর। আর ইণ্ডিয়াতে মানুষেরা পরিচিত শিল্পীদের দেখতে পাবে।' এই কথা বলে ফুয়াদ সংগীর সঙ্গে ভালো আলাপ করিয়ে দিলো। বছর তিরিশের যুবকটির নাম সাইমন স্কট। বাড়ি কানাডার টরোণ্টোয়। সেখানে অ্যাসিস্টেণ্ট ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করে। বলল, 'কানাডায় পুরো দায়িত্ব পাওয়া অসম্ভব। সেখানে পুরোনরা যদ্দিন না অবসর নিচ্ছে তদ্দিন কেউ বিশ্বাস করে কাজ দেবে না। ফুয়াদের কাছে আমি তোমাদের পরিকল্পনার কিছুটা শুনেছি। আমি সাজেস্ট করছি ছবিটা তোমরা কানাডায় করো।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এতে কি লাভ হবে আমাদের?'

সাইমন বলল, 'কানাডায় কোনো নাগরিক যদি ছবির প্রযোজনায় টাকা লগ্নী করে তাহলে সেই টাকার ওপরে শতকরা দুশো ভাগ ট্যাক্স মকুব।'

'দুশো ভাগ মানে?'

'পরপর দু'বছর, একশ ভাগ করে।'

মনোজ বলল, 'কানাডিয়ান প্রযোজক পাব কি করে। এখানে আমরা বন্ধুবান্ধবদের কাছে টাকা তুলছি। কানাডায় তো সেরকম কেউ নেই।'

সাইমন হাসল, 'ব্যাপারটা কঠিন নয়। আমার পরিচিত অনেক কানাডিয়ান আছেন যাদের স্টেটসে বিজনেস আছে। তোমরা তাকে টাকা দিয়ে দেবে। সে ওখানে তার হোয়াইট টাকা ছবিতে ঢেলে ট্যাক্স মকুব করে নেবে।'

'কিন্তু এর ফলে তো ভদ্রলোকই প্রোডিউসার হয়ে যাবেন।'

'নট দ্যাট। তোমরা যে টাকা ওকে এখানে দেবে তার বদলে উনি ছবির ইণ্টারন্যাশনাল রাইট তোমাদের লিখে দেবেন। ভদ্রলোকের লাভ ট্যাক্স বেঁচে যাওয়া।'

মনোজের আপত্তি ছিলো প্রস্তাব মানতে। কারণ নিউইয়র্ক আর টরেণ্টোর চেহারা এবং মানুষজন এক নয়। গল্প নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সাইমন যদি তার নিজস্ব ক্যামেরার কাজ আমাদের দেখায় তাহলে ওকে একটা সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। ফুয়াদ ছবিটির টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসার হিসেবে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। সময় বেশি নেই। আগামী বছর ছবিটির কাজ শুরু করা হবে। সাইমন জানাল নিউইয়র্কের ফিল্ম টেকনিশিয়ান গিল্ড খুব শক্তিশালী। ওদের লোক নিয়ে কাজ না করলে স্যুটিং বন্ধ করে দিতে পারে। মনোজ বলল, ব্যাপারটা জানি। কিন্তু গিল্ডের একজন প্রোডাকসন্স বয়ের আট ঘণ্টার মজুরি ছয়শো ভারতীয় টাকা। এতে হলিউডি ছবি হয় কিন্তু দশ লাখ টাকার ছবি হয় না। আমার ছবির বাজেট জানিয়ে ওদের সেক্রেটারিকে চিঠি দিয়েছিলাম। মনে হয় আলোচনা করে এ ব্যাপারে একটা কিছু সুরাহা হবে।'

সেই দুপুরটা আমরা এমন মশগুল ছিলাম যে মনে হচ্ছিল ছবি শুরু হয়ে গেল বলে। ফুয়াদ আর সাইমন যাওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল এখন থেকে প্রতিমাসে একবার করে মিটিং-এ বসবে। আমার কাজ দেশে ফিরে গিয়ে ওখানকার ব্যবস্থা করা। স্যুটিং-এর আগে টিম নিয়ে আবার নিউইয়র্কে আসতে হবে আমাকে।

সেদিন বিকেলে মনোজ একটা ফোন পেল। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর সে টেলিফোন ছেড়ে বলল, 'সমরেশ, চলুন, মনে হচ্ছে টাকা পয়সার প্রব্লেম সলভ্ হয়ে যাবে।'

'কি রকম ?, আমি হেসে বলেছিলাম, 'আপনার তো কোনো প্রব্লেম ছিল বলে জানি না।'

'না-না। আসলে ডকুমেণ্টারি করে কিছু তো ঢুকিয়েছি। তাই নিউইয়র্কের পরিচিতদের কাছে আবেদন করেছিলাম যদি তাঁদের কেউ প্রোডিউস করেন। এখানে টাকা আছে একমাত্র ডাক্তারদের। বাঙালি ডাক্তার কম নেই। চলুন। মনোজ চটপট তৈরি হয়ে নিল, 'কেউ না করলে আমি নিজেই করব। আমি কখনও হার স্বীকার করি না।'

মনোজ আমাকে বলেনি কার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। শহরের অন্য প্রান্তের যে পাড়ায় আমাদের গাড়ি ঢুকল তার চেহারা দেখেই মালুম হলো জব্বর বড়লোকরাই এ তল্লাটে বাস করেন। বাড়িগুলো যেমন তার চারপাশের লন এবং বাগানও দ্রষ্টব্য। নির্জন এক গেটের সামনে দাঁড়াতেই জেমস বণ্ডের ছবির মতো গেটের ভেতর লুকিয়ে রাখা একটি যন্ত্র জানতে চাইল, আমরা কারা ? মনোজ গলা তুলে নিজের পরিচয় দিতেই গেটটা আপনা আপনি খুলে গেল। বিশাল লন ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেছে। কোনো মানুষের চিহ্ন নেই। আমরা ঢোকামাত্র গেট বন্ধ হয়ে গেল। পাহাড়ি পথ বেয়ে আমরা বাড়িটার সামনে উপস্থিত হলাম। দরজাটা খুলে গেল দু'পাশে সরে গিয়ে। ভেতরে পা দিতেই মেঝেটা হঠাৎ আমাদের নিয়ে ওপরে উঠতে লাগল লিফটের মতো। অবাক হয়ে মনোজকে জিজ্ঞাসা করলাম। ব্যাপারটা কি ?' মনোজ হাসল, 'ধনীদের নিরাপত্তা দরকার। তাছাড়া লোকাভাবও এভাবে সমাধান করা যায়। ওপরে উঠে দেখলাম এক দক্ষিণী ভদ্র-লোক তার পোশাকে অপেক্ষা করছেন। আমাদের দেখে সবিনয়ে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। সোফা বা চেয়ার নয়, মাটিতে মোটা গদি ও তাকিয়ার ব্যবস্থা। ভদ্রলোক ইংরেজিতে জানিয়ে গেলেন, ম্যাডাম এখনই আসবেন। আমি দেখলাম এই ঘরে বৈভবের বাড়াবাড়ি নেই। মনোজ জানাল, 'এই মহিলার স্বামী বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। ডলারে কোটিপতি বললে কম বলা হবে। ষাট বছর বয়সে হঠাৎই হৃদয়যন্ত্র বন্ধ হয়ে মারা যান। একটিমাত্র ছেলে ওদের।'

এইসময় মহিলা এলেন। ফর্সা, স্থূলকায়া প্রৌঢ়া শাড়ি পরেছেন কালো রঙের এবং তা বয়স হলেও চামড়াকে উজ্জ্বল করেছে। মাথার চুলে কিঞ্চিৎ সাদা ছোঁওয়া। হেসে বললেন, 'মনোজ আমি ভেবেছিলাম তুমিই ফোন করবে। কি খবর, কতদূর এগোলে ?' কথা হচ্ছিল ইংরেজিতে। মনোজ বলল, 'চিত্রনাট্যের কাজ শেষ। ইনি সমরেশ, কলকাতার লেখক, ইনি লিখেছেন।'

'ভালো। কিন্তু এক লক্ষ ডলারে ছবি করবে কি করে ? তোমাকে পরে বাজেট বাড়াতেই হবে।'

'আমি তো আপনাকে সম্ভাব্য খরচের একটা লিস্ট দিয়েছি।'

'দেখেছি। আমার মনে হয়েছে অন্তত দেড় থেকে পৌনে দু লক্ষ ডলার দরকার

হবে। তুমি বাজেটটা আর একবার রিভাইজ কর।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার বন্ধু ছবি করবে কাউকে টাকা না দিয়ে। আর বোম্বে থেকে ডাইরেক্টররা এসে আমাকে বাজেট দেয় দশ লাখ ডলারের। সিমি গাড়োয়াল যে ছবিটা করেছে তার বাজেট অনেক বেশি। যা হোক, আমি ছবিটা প্রোডিউস করতে পারি। কিন্তু মনোজ, তুমি স্ক্রিপ্টের একটা ইংরেজি ট্রানশ্লেসান আমাকে দেবে। মিস্টার এন্ড মিসেস সোমই তো ছবির মূল চরিত্র?'
শেষ প্রশ্নটা আমার দিকে তাকিয়ে। বললাম, 'সেই সঙ্গে ওদের ছোট মেয়ে।'
'ও হ্যাঁ, তাইতো, দেখুন বোম্বের অনেকেই আমাকে ছবি প্রোডিউস করতে বহুবার অনুরোধ করেছে। কিন্তু যে জগত ছেড়ে আমি এসেছি সেখানে ফিরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু এই ছবির গল্প আমাকে আকর্ষণ করছে। মনোজ, আমি মিসেস সোম করতে চাই।'
'কিন্তু আপনি তো বাংলা বলতে পারবেন না।'
'আমি কিছু জানি। আমাকে তিন মাস সময় দাও, আমি পারব।'
মনোজ হাসল, 'দেখা যাক।' কিন্তু বুঝতে পারলাম সে আপোস করতে রাজি নয়। ম্যাডাম বললেন, 'প্রবাল সোমের বয়স যা অশোককুমারকে মানায় না?'
'উনি করলে তো চমৎকার হতো। তবে ওঁর বয়স হয়ে গেছে।'
'তুমি ওকে জানো না। মেকআপ নিলে অশোককুমার এখনও পঞ্চাশে নেমে আসবেন।' ম্যাডাম কথা শেষ করতে একটি যুবক ঘরে ঢুকল। ছিপছিপে, লম্বা, চশমা চোখের ছেলেটিকে দেখে ভালো লাগল। সে মনোজকে দেখে বলল, 'হ্যালো, সেই ফিল্ম? আচ্ছা তোমাদের ছবিটার গল্প বল তো?'
ম্যাডাম বিরক্ত হলেন, 'তোমার কি দরকার? ডাক্তারি পড়ছ তাই পড়ো।' ছেলেটি বলল, 'ও মাম, তুমি যা ছবি করেছ তা দেখে—। ইনফ্যাক্ট এত গাছের ডাল ধরে গান গাওয়া, পাহাড়ে দৌড়ানো, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নাচ—হরিবল্। এসব আছে তোমার ছবিতে?'
ছেলেটি বিদ্রূপের গলায় প্রশ্ন করল। তারপরে ঘটনা একটু অন্যরকম। মনোজ ওকে ছবির বিষয় বোঝাতে আরম্ভ করল। ভারতবর্ষের বাপরা মেয়ের ওপর রেগে গেলে শুধু প্রহার করতেই জানেন শুনে ছেলেটি অবাক হলো। সে স্বীকার করল মাত্র দু'বার দেশে গিয়েছে। গল্পটি শুনতে শুনতে সে ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছিল। ইতিমধ্যে ম্যাডাম উঠে গিয়েছেন। মনোজ থামলে ছেলেটি বলল, 'এই ছবিটা করা দরকার। আমেরিকার ইন্ডিয়ান সেকেন্ড জেনারেশনকে ঠিক ধরেছ তুমি। আমরা না আমেরিকান না ইন্ডিয়ান। কিন্তু মাকে ও চরিত্রে নিও না। মা কোনোদিন নিম্নবিত্ত বাড়ির বউ-এর মন বুঝতে পারবে না। তাছাড়া বাংলা বলবে খুব খারাপ। মা যদি টাকা না দেয় আমি দেবো।'
মনোজ হাসল, 'দাঁড়াও, ভাবি একটু।'
ছেলেটি বলল, 'ভাবার কিছু নেই। মা চিরকাল গাছের ডাল ধরে গান গেয়েছে। আমি তোমার এই ছবির সঙ্গে যুক্ত হতে চাই।' বিদায় নেবার সময় ম্যাডাম এলেন। মনোজ তাঁকে ইংরেজি অনুবাদ পাঠিয়ে দেবে বলে কথা দিলো।

ফেরার পথে মনোজ জিজ্ঞাসা করল। 'ভদ্রমহিলাকে চিনতে পারলেন ?'
বললাম, 'খুব চেনা চেনা লাগছিল কিন্তু ঠিক প্লেস করতে পারছি না।'
মনোজ হাসল, 'দেহপট সনে নাট সকলি হারায়।' ইনি সেই বিখ্যাত দক্ষিণী নাচিয়ে ভগ্নীদের একজন। ফিল্মেও নাম করেছিলেন। রাজকাপুরের সঙ্গে। যিস দেশ মে গঙ্গা বহতি হ্যায়। লাস্ট ছবি সম্ভবত 'মেরা নাম জোকার।'
তৎক্ষণে আমি চেঁচিয়ে উঠেছি, 'পদ্মিনী ? এতো পাল্টে গিয়েছেন ?'
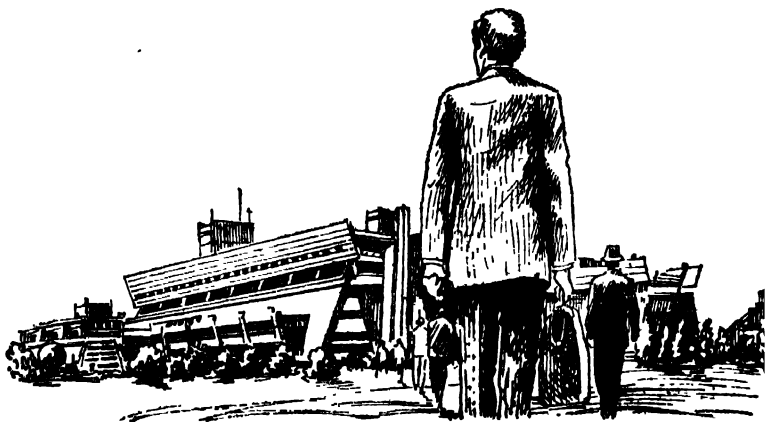
৯

নিউইয়র্কে থাকার সময়টা হু হু করে ফুরিয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে প্রচুর মানুষ দেখলাম এবং বাঙালিও। শনিবার রাত্রে তাঁরা এলেন। পরপর কয়েকটা গাড়ি এসে থামল মনোজের বাড়ির সামনে। প্রথমে ভবানী মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী আলোলিকা। ভবানীবাবু মিশুকে মানুষ। বড় চাকরি করেন। আলোলিকা কবিতা লেখেন। পরিবর্তন পত্রিকায় নিউ ইয়র্কের খবর পাঠান। মোটা সোটা, মিষ্টি ব্যবহারে মানিয়েছে চমৎকার। কলকাতার সাংস্কৃতিক জগতের হালফিল খবর ওঁর জানা। এলেন সুজয় আর শমিতা দাশগুপ্তা। সুজয় কথা বলেন টিপে টিপে, অত্যন্ত মার্জিত ভঙ্গীতে। কয়েক মিনিটেই বোঝা যায় ভদ্রলোকের পড়াশোনা আছে ব্যাপক। শমিতা মিষ্টি চেহারায় ছিপছিপে সুন্দরী। হাসেন ভালো এবং সেটা বুঝে সুঝে। শমিতা কবিতা লেখেন। সুজয় অঙ্ক নিয়ে গদ্য লেখালেখি করেন। এল ধ্রুব কুণ্ডু। ওর নাম আমি শুনেছি কলকাতায়। বুধ সন্ধ্যার নাটকে অভিনয় করেছে ধ্রুব। এবং ওই সংস্থার পরিচিত মানুষদের ঘনিষ্ঠ। বেশ ডানপিটে ধরনের, বেপরোয়া, রাত গভীর হলে এবং সঙ্গে মহিলা না থাকলে দুঃসাহসী হয়ে ওঠেন এই পরিচয় পরে আমরা পেয়েছিলাম। ধ্রুব কথা বলেন বেশি। প্রথম প্রথম একটু কায়দা করার চেষ্টা থাকে ওঁর কথাবার্তার পরে নিছক আড্ডাবাজ হয়ে যান। ওর স্ত্রী দারুণ সেজেগুজে একটি গম্ভীর পুতুলের মতো বসেছিলেন একপাশে। ঘণ্টা তিনেকের আড্ডায় কথা বলেছেন তিনটের বেশি নয়। কিন্তু ওঁকে দেখে আমার একবারেও মনে হয়নি চুপ করে থাকাটাই ওঁর

স্বভাব। মানুষের মন তো নানান কারণে খারাপ থাকে। এবং সবশেষে এল ফরিদা।

ফরিদাকে যে নিমন্ত্রণ করেছে মনোজ তা আমাকে বলেনি। কলিং বেলের আওয়াজ পেয়ে মনোজের স্ত্রী দরজা খুলেছিল। আমি ফরিদার গলা পেলাম, 'উঃ, টিউব থেকে নেমে হাঁটছি তো হাঁটছি। আপনি মিসেস ভৌমিক ? আমি ফরিদা। এখন থেকে তুমি বলব, কেমন ?'

ঘরে ঢুকে আমাদের দিকে তাকিয়ে ষোড়শীর মতো সলজ্জ হাসলেন ফরিদা। মনোজ সবার সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিলো। এবার ফরিদার নজর পড়ল আমার ওপর, 'একি অবিচার সমরেশ। আমি তোমার জন্যে যাকে বলে চকোরের মতো পথ চেয়ে থাকি রোজ আর তুমি আমাকে ভুলেই গেছ ?'

বুঝতে পারলাম সব কটি মুখ আমার দিকে ফিরল। হালকা করার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কবিতা লেখা কেমন চলছে ?'

'আমি লিখে যাব। মৃত্যু পর্যন্ত। তোমাদের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় না ছাপলে না ছাপুক।' ফরিদা হাসল। আলোলিকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কবিতা লেখেন ?'

ফরিদা বলল, 'একশবার লিখি। এই এক গ্লাস পানি দাও তো।' শেষটা মনোজের স্ত্রীর উদ্দেশ্যে। আমি হেসে বললাম, 'পানিটা জিভে আটকে আছে না ?'

ফরিদা মাথা নাড়ল, থাকবেই তো। মুসলমানের মেয়ে।

বেশ বুঝতে পারলাম ফরিদা আসার পর আমাদের আড্ডার সুর কেটেছে। সবাই কেমন অস্বচ্ছন্দ। ভবানী একমাত্র কথা চালাচ্ছিলেন। মদ্যপান এবং খাওয়া-দাওয়া চলছিল নীরবে। এর মধ্যে ফরিদা অনুমতি নিয়ে সিগারেট ধরিয়েছেন। ভবানী বললেন, 'ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি পুরুষ না নারী এই বিতর্কের শেষ হবে না।' সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা বলে উঠলেন, 'শ্রেষ্ঠ হয়ে লাভ কি, ঈশ্বর যা কিছু সুবিধে তা দিয়েছেন ছেলেদের। পরজন্মে যেন ছেলে হয়ে জন্মাই।'

ভবানী বললেন, 'সব মেয়ে যদি ছেলে হয়ে জন্মায় তাহলে পৃথিবীর অবস্থা কি হবে !'

ফরিদা এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এবার সিগারেট নিভিয়ে বললেন, 'কিন্তু কোনো কোনো পুরুষ নারী হয়ে জন্মাতেই চেয়েছেন।'

ভবানী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরকম ?'

লজ্জা লজ্জা মুখ করে ফরিদা বললেন, 'একটু শ্ল্যাং হয়ে যাবে। অবশ্য এ আপনাদের পৌরাণিক গল্প। আমি বানিয়ে বলছি না। রাজার নাম ভুলে গিয়েছি। ভদ্রলোকের ছেলেপুলে ছিল না। বরুণের পুজো করে তিনি একশ পুত্রের পিতা হলেন। তাই দেখে ইন্দ্র গেলেন ক্ষেপে। তিনি রাজাকে জব্দ করতে চাইলেন। একদিন মৃগয়া করতে করতে ক্লান্ত রাজা এক সরোবর দেখে সেখানে স্নান করতে গেলেন। ইন্দ্রের বদমায়েশিতে রাজা স্নান করে উঠে দেখলেন তিনি নারী হয়ে গেছেন। নারী রাজা মনের দুঃখে বনে গেলেন।

সেখানে এক সন্ন্যাসীর কাছে থেকে গেলেন স্বামী-স্ত্রী হয়ে। তাতে তার একশ সন্তান হলো। নারী রাজা সেই একশ ছেলেকে নিয়ে ফিরে গেলেন রাজধানীতে। প্রথম পক্ষের ছেলেদের সঙ্গে দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেদের আলাপ করিয়ে দু'শ-জনের ওপর রাজ্যভার দিয়ে বনে ফিরে গেলেন তিনি। ইন্দ্র দেখলেন তার ষড়যন্ত্রে কোনো কাজ হচ্ছে না। তিনি দশ ভাইবোনের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন এমন যে তারা মারামারি করে মারা গেল। এবার ইন্দ্র দেখা দিলেন নারী রাজাকে। নারী রাজা তাঁর উপাসনা করলেন। সন্তুষ্ট ইন্দ্র বললেন, 'দুটো বর দেব। তার একটা হিসেবে তুমি যেকোনো একশ ছেলের জীবন চাইতে পার।' নারী রাজা বললেন, 'তাহলে আমার গর্ভে সন্ন্যাসীর ঔরসে যে একশ সন্তান তাদের ফিরিয়ে দিন।' অবাক ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তোমার ঔরসে জাত সন্তানদের চাও না?'

'প্রথমেই চাই না। কারণ মা হবার আনন্দ আমি বুঝেছি।'

ইন্দ্র দ্বিতীয় বর চাইতে বললে নারী রাজা বললেন, 'পরজন্মে যেন নারী হিসেবে জন্মাই।'

'সে কি? কেন?' ইন্দ্র আরও অবাক।

নারী রাজা বললেন, 'পুরুষ হিসেবে যৌনসুখের স্বরূপ জেনেছি। কিন্তু নারী হিসেবে যা পেয়েছি তার তুলনা নেই।' গল্পটা বলে ফরিদা আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি পড়নি?'

মাথা নেড়ে জানালাম পড়েছি। কিন্তু এই গল্প আড্ডাটা ভেঙে দিতে সাহায্য করল। মহিলারা যাওয়ার আগে বারংবার বলে গেলেন, 'আমেরিকা ঘুরে দেশে ফেরার আগে আমি যেন অবশ্যই তাদের বাড়িতে যাই।' মধ্যরাতে গাড়িগুলো যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন ফরিদা জনে জনে জিজ্ঞাসা করেছিল তারা কেউ ম্যানহাটনে যাবে কিনা। ওদের রাস্তা উল্টো জেনে বেচারা খুব নিরাশ হলো। শেষ পর্যন্ত মনোজকে বলল সে, 'ফকির মানুষের অসুবিধে এই। রাত বেশি হয়ে গেলে বাড়িও ফিরতে পারে না। টিউব বন্ধ। আজ এখানেই থেকে যাই। তোমরা তো রাত জাগতে পারো। এসো গল্প করে রাত কাবার করি।'

মনোজের স্ত্রী বলল, 'একি কথা! রাত জাগবেন কেন? আপনাকে আমি আমার শাড়ি দিচ্ছি। চেঞ্জ করে নিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমি এই ঘরে বিছানা করে দিচ্ছি।'

ফরিদা বলল, 'কিছু মনে করো না লক্ষ্মীবোন, আমি অন্যের শাড়ি পরতে পারি না।' আমার বিছানা হলো আজ রাতের জন্যে নিচের বাঞ্ছিত ঘরে। ফরিদা চলে গেল শুতে। মনোজের স্ত্রীও। আমরা দু'জনে কথা বলছিলাম। মনোজ জিজ্ঞাসা করল, 'যাবেন নাকি চরতে?'

আমি বললাম, 'না। আজ ঘুমাবো।'

এই সময় ফরিদা বেরিয়ে এল। পরণে শাড়ি নেই। আমার শালটা জড়িয়েছে ওপরে, পরনে পেটিকোট। এসে বলল, 'পুরুষ মানুষের গায়ের গন্ধ বিছানায়। ঘুম আসল না'।

জিজ্ঞাসা কবলাম, 'একি পোশাক ?'
ফরিদা বিরক্ত হলো, 'কেন ? অন্যায়টা কি ? আপনারা গেঞ্জি পাজামা লুঙ্গি পরে মেয়েদের সামনে বসতে পাবেন আর আমরা পেটিকোট পরে থাকলেই দোষ ? আমার পা পর্যন্ত ঢাকা না ?'
একটু বাদেই আমবা সাহিত্য সঙ্গীত নিয়ে মশগুল হয়ে গেলাম। ফরিদা আমাদের কিছু গান শোনালেন। আইরিশ লোকগীতির সুরে বাংলা গান। গলাটি মিষ্টি তবে অনুশীলন নেই। এর ফাঁকে ছোট্ট একটা দৃশ্য দেখলাম। যেহেতু ফরিদার পেছনে ঘটেছিল তাই ওর জানা হলো না। মনোজের স্ত্রী বেরিয়ে এসেছিল শোওয়ার ঘর থেকে। ফরিদার পোশাক দেখে বিরক্তিতে ওর মুখ বেঁকে গিয়েছিল। একটুও কথা না বলে সে ফিরে গিয়েছিল ঘরে। আমি বাজি রাখতে পারি অনেক রাত সে ঘুমায়নি। আমরা যখন শুতে গেলাম তখন রাত প্রায় শেষ।
অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমানো হলো না। মনোজ এসে জানিয়ে দিলো আমার টেলিফোন এসেছে। মাটির তলার ঘরে শুয়ে রিসিভার তুলে জানলাম ওয়াহিও থেকে কবি তনুশ্রী ভট্টাচার্য ফোন করেছেন। ব্যাপারটা বেশ চমকপ্রদ। আমেরিকায় যেসব বঙ্গ ললনা আছেন তাঁদের দুই-তৃতীয়াংশ সম্ভবত কবিতা লেখেন। তবে তনুশ্রী এঁদের সবার থেকে এগিয়ে। ওঁর কবিতা দেশে ছাপা হয়। তনুশ্রী বললেন, 'এসে অবধি নিউ ইয়র্কে বসে আছেন। কবে আসছেন ওয়াহিওতে। এসে দেখুন ভালো লাগবে। প্রচুর টিউলিপ ফুটেছে চারধারে।' তনুশ্রীর কবিতায় দেখেছি টিউলিপদের কথা থাকে খুব। ওকে জানালাম, সুযোগ পেলেই চলে যাব। ও আমাকে বলল, 'যেখানেই থাকুন মাঝে মাঝে ফোন করবেন। পয়সা না থাকলে ক্ষতি নেই, বলবেন আমি দিয়ে দেব।' পরে জেনেছি এইভাবে ওদেশে টেলিফোন করা সম্ভব। রিসিভার তুলে নম্বর ঘুরিয়ে বলতে হয় যে আমার টেলিফোনের দামটা ওই নম্বর দেবে। অপারেটর সেই নম্বরে ডায়াল করে সম্মতি নিয়ে কানেকশন করে দেয়। পকেট খালি থাকলে ব্যবস্থাটা খুব উপকারে আসে।
সকালে মনোজের এদিন ঝামেলা ছিল। ফরিদা বলল, 'কি গুডি বয়ের মতো গাড়িতে চেপে শহর দেখে যাচ্ছেন। আমার সঙ্গে চলুন। হাঁটুন, টিউব নিন।' মনোজের সঙ্গে কথা বলে ফরিদাকে নিয়ে বেরুলাম। বুঝলাম ওর স্ত্রীর ভালো লাগল না এটা। মনোজ বলেছিল বাড়ির পেছনের রাস্তায় গেলেই বাস পাওয়া যাবে টিউব স্টেশনেযাওয়ার। মনোজ এও বলেছিল যদি ফিরতে অসুবিধে হয় তো যেকোনো পাবলিক ফোনে থেকে আমায় ফোন করবেন। মিনিট তিনেকের মধ্যেই বাস পেলাম। কলকাতার প্রাইভেট কোম্পানির লাক্সারি বাসগুলো একে দেখে আর গর্বিত হবে না। ড্রাইভারের সামনে দিয়ে উঠে ফরিদা ব্যাগ খুলছিল। কোনো মহিলাকে ভাড়া দিতে দেওয়াটা আমার অভ্যেসে নেই অতএব কয়েন কুড়িয়ে বাড়িয়ে এক ডলার আশি সেণ্ট গর্তে ফেললাম। এই ভাড়ায় বাসের শেষ স্টপ পর্যন্ত যাওয়া যাবে। কিন্তু কুড়ি টাকায় দু'জনের বাসের টিকিট হচ্ছে

ভাবতেই মন খারাপ হয়ে গেল। পাশাপাশি বসে ফরিদাকে সেকথা বলতেই ও খিলখিলিয়ে হেসে উঠল, 'টাকার হিসেব করছেন কেন? ধরে নিন এক টাকা নব্বুই পয়সায় দু'জনে শ্যামবাজার থেকে গড়িয়াহাট যাচ্ছি।'
'আপনি কলকাতায় শেষ কবে গিয়েছেন?'
'ঢাকা যাওয়ার পথেই যাই। দু'বছর আগে গিয়েছিলাম। তাছাড়া, কলকাতার বাসে মাঝ পথে উঠে এমন পাশাপাশি প্রেমিক প্রেমিকার মতো বসতে পারতেন?' আবার হাসল ফরিদা।
'আপনি চটপট বেশ বলতে পারেন তো!'
'যদি বুঝতাম আপনি প্রেম করার জন্যে তৈরি তাহলে কি বলতে পারতাম?'
টিউব স্টেশনে ঢুকতেও মাথা পিছু নব্বুই সেণ্ট। যথা ইচ্ছা তথা যাও। বলতে দ্বিধা নেই, নিউ ইয়র্ক তো বটেই পরে লণ্ডন কিংবা প্যারিসে টিউবে চেপে মনে হয়েছে আমাদের এই কলকাতার টিউব অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন, স্টেশনগুলো ঢেব বেশি সুন্দর। মাটির তলায় দুবার ট্রেন পাল্টে আমরা ফরিদার কথামত যেখানে উঠে এলাম সেটা যে নিউ ইয়র্কের আর এক প্রান্ত। ফরিদা জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়ি ফিরতে পারবেন তো?'
আমার নিজেরই সংশয় ছিল। যে ব্যস্ততায় ট্রেন পাল্টানো হয়েছে তাতে স্টেশন না গুলিয়ে ফেলি। এখন কাজের সময়। নিউ ইয়র্কের অফিস যাত্রীরা আজ ছুটিতে। দিনের বেলায় বেশির ভাগ মানুষ শহরের প্রান্তে গাড়ি রেখে টিউবে চেপে শহরে আসেন। পার্কিং ফি বড্ড বেশি। ফুটপাতের লোকজন আছে। আছে হকারও। তবে তাদের মধ্যে নিগ্রোরাই বেশি। এ্যাব্রাহাম লিঙ্কন দেখলে কতখানি খুশি হতেন জানি না, কারণ আজও আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পদে কোনো নিগ্রো নির্বাচিত হয়নি। কিন্তু নিগ্রোদের প্রতাপ কম নয়। তারা যখন কাউকে বকে তখন মোটেই আঙ্কল টমের কথা মনে পড়ে না। ফরিদার বাড়িতে পৌঁছে মনে হলো এখন ওর ওপর তলার ফ্ল্যাটে সময় না কাটিয়ে একটু ঘুরে ফিরে দেখা যাক। ফরিদার ক্লাস নেই আজ। কোনোমতে আবার আসব বলে বিদায় নিলাম ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ এলোমেলো হাঁটার পর চারপাশের সাহেব-মেমের ভিড় দেখে ক্রমশ বিরক্তি এলো। এভাবে একা একা হাঁটা যায়?'
চওড়া ফুটপাতের শেষে একটা বাড়ির চাতালে বসে সিগারেট খাচ্ছিলাম। আমার সামনেই দু'টি নারী-পুরুষ পথ হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে পরস্পরকে চুম্বন করে যাচ্ছিল। পরস্পরকে আকাঙ্ক্ষা করার সবরকম নিদর্শন ওরা রাখছিল। অথচ কেউ ওদের ঘুরেও দেখছে না এবং তখনই কাণ্ডটা ঘটল। একজন বৃদ্ধা দুই হাতে দুটো ভারী ব্যাগ নিয়ে আসছিলেন। এবং শুকনো ফুটপাতে তিনি বিদিকিচ্ছিরি আছাড় খেলেন। দিদিমার চোখ যুবক-যুবতীর ওপর ছিল কিনা বলতে পারব না। কিন্তু মহিলা উঠতে পারছেন না। যন্ত্রণায় ছটফট করছেন ফুটপাতে শুয়ে। অথচ কেউ ওঁর দিকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে যাচ্ছে না। ব্যস্ত মানুষেরা যাওয়ার সময় একবার চেয়ে দেখছে শুধু। প্রেমিক প্রেমিকারা এগিয়ে গিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে চলে গেল।

কলকাতার অত্যন্ত ঘৃণ্য সমাজ-বিরোধীও এইরকম দৃশ্য দেখলে সাহায্য করতে ছুটে যায়। আমরা ভদ্রলোকরা গা বাঁচিয়ে তা দেখি। কিন্তু বৃদ্ধার বয়স আমাকে তৎপর করল। ওঁর কাছে গিয়ে নিচু হতেই ওপাশ থেকে এক নিগ্রো আমায় ডাকল। কাছে যেতেই বলল, 'তোমার আবেগ চেপে রাখ। ফোন করে দেওয়া হয়েছে। যাদের কাজ তারা করতে আসছে।'
আমি বললাম, 'কিন্তু ওঁর কষ্ট হচ্ছে।'
'তুমি কি ডাক্তারি শাস্ত্রটা পড়েছ ?'
'না।'
'তাহলে কোন অধিকারে ওর গায়ে হাত দিতে যাচ্ছ ? ধর, ওর একটা হাড় জখম হয়েছে, তুমি এমনভাবে তুললে যে সেটা সারাজীবনের জন্যে ভেঙে গেল। এ দেশে নতুন ?'
উত্তর দেবার আগেই এ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। বৃদ্ধা বড় জোর মিনিট পাঁচেক ফুটপাতে শুয়েছিলেন। এ্যাম্বুলেন্সের লোকেরা ওঁকে সযত্নে তুলে নিয়ে গেল। নিগ্রো প্রৌঢ়টি বলল, 'কারো দুর্ঘটনা ঘটলে হাত লাগিয়ে সাহায্য করতে গিয়ে অপকারই করে ফেলা হয় অনেক সময়। কোত্থেকে আসছ তুমি ?'
'ভারতবর্ষ। ওখানে এতো তাড়াতাড়ি এ্যাম্বুলেন্স আসত না।'
লোকটির সঙ্গে আমার জমে গেল। বিশাল চেহারার নিগ্রোটি কেরানির চাকরি করে। আজ ছুটি, সময় কাটাতে বেরিয়েছে। ওকে আমি ভারতীয় সিগারেট খাওয়ালাম। দু'জনে গল্প করতে করতে পথ হাঁটছি। ও আমার চেয়ে ঢের লম্বা। গল্পের বিষয় বস্তু মজার। ও জানতে চাইছিলো ভারতবর্ষের মানুষরা কেন ইংরেজি বলে ? কৌতূহল মিটিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ও কোথায় থাকে ? লোকটার নাম সিডনি। সিডনি বললো, 'হার্লেম।'

হার্লেমের কথা আমি জেনেছি অনেককাল। নিউ ইয়র্ক শহরের এক প্রান্তে নিগ্রোদের নিজস্ব এলাকার নাম ওটা। খুন জখম অহরহ ঘটে। একদিন মনোজের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মনোজ বলেছিল, কোনো বঙ্গ সন্তান ভুলেও ওই চত্বরে যায় না। হার্লেমের পুলিশও কালো। সাদারা যায় বাধ্য হলে। পৃথিবীর যাবতীয় নেশা, অপকর্মের ঘাঁটি ওটা।
সিডনি হার্লেমে থাকে শুনে আর একবার মুখটা দেখলাম। সিগারেট টানতে টানতে হাঁটছে। কেরানির চাকরি করে। এই লোকটা কি হার্লেমে রোজ মার-পিট করে ? হঠাৎ সিডনি দাঁড়িয়ে পড়ে একটা দেওয়ালের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। পার্কিং প্লেসের গায়ে লম্বা দেওয়াল উঠে গিয়েছে। সেই দেওয়ালে বিশাল ছবি এঁকেছেন শিল্পী। বিমূর্ত শিল্পের চমৎকার প্রকাশ। ক্ষুধার্ত একটি শিশু সমস্ত বিশ্বের সামনে নতজানু হয়ে রয়েছে। সিডনি বলল, 'এইটে আমার এক বন্ধুর কাজ।'
জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওকে কি কোনো কোম্পানি আঁকতে বলেছিল ?'
'না না। এখানকার তরুণ শিল্পীরা পয়সার অভাবে হল ভাড়া নিয়ে একজি-

বিশন করতে পারে না। ওরা তাই খালি দেওয়াল বেছে নেয়। প্রায় মাস দুয়েক ধরে বিনা পারিশ্রমিকে ওই ছবিটা এঁকেছে সে। যদি কোনো সহৃদয় সমজদার এই ছবি দেখে ওর খোঁজ খবর নিয়ে অন্য ছবি কিনতে যায় এই আশায়।'

কলকাতা শহরে বছর দুয়েক আঁকতেই পয়সা দিয়ে আকাডেমি ভাড়া নিয়ে প্রদর্শনী করতে দেখেছি অনেককে। মনে হলো এই সব শিল্পীদের কলকাতায় নিয়ে গেলে আমাদেরই উপকারে লাগতো। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার বন্ধু কি কালো?'

'হ্যাঁ। আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকি। ছবি আঁকা ছাড়া ও একটা রেস্টুরেন্টে ডিস ধোওয়ার কাজ করে। খুব মজার লোক।'

তার মানে হার্লেমে শিল্পীরাও থাকে। একটু গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। তাই শেষতক আমি জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম, 'কিছু মনে করো না হার্লেম সম্পর্কে অন্য গল্প শুনেছি।'

'ঠিকই শুনেছ।' সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো সিডনি।

'তুমি বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাইছি?'

'আরে হ্যাঁ। খুন, মারামারি, নেশা, ড্রাগস। এসব তো হয়েই থাকে। তাই বলে লোকে ছবি আঁকবে না কেন? কবিতা লিখবে না কেন?'

'তোমার জানাশোনা কবি আছে ওখানে?'

'আমি কবিতা লিখি।' প্রায় বুক টান করেই বলল সিডনি। আজকাল কবিতা লেখার জন্যে লবঙ্গ লতিকা হবার প্রয়োজন হয় না মানি কিন্তু তাই বলে এই মানুষটি কবিতা লেখে তা দেখলে কে বুঝবে? জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার কবিতার বই আছে?'

'পয়সা কোথায় যে বই ছাপাবো? পাবলিশার্সরা তো পাত্তাই দেবে না। অবশ্য আমার কিছু কবিতা নিয়ে সাইক্লোস্টাইল করে ফোল্ডার বানিয়ে নিয়েছি।'

'আহা দেখলে ভালো হতো?'

'তোমার কবিতা ভালো লাগে? বেশ তো, আমার বাড়িতে চলো। আমার বউ-এর আজ ডিউটি চলছে। কফিটা আমিই তোমাকে খাওয়াবো।'

হার্লেমে গিয়ে কোনো বিপদে পড়লে কি মনোজের সাহায্য পাওয়া যাবে? সিডনিকে দেখে তো ভয়ংকর কিছু মনে হচ্ছে না। তাছাড়া, কবিরা কি ছিনতাই-বাজ হয়। আর সম্পত্তি বলতে পাশপোর্ট, কিছু ডলার আর প্রাণটুকু ছাড়া সঙ্গে কিছু নেই। নেবে কি? সামনের একটা দোকান থেকে কিছু কেক কিনে সিডনির সঙ্গে বাসে উঠলাম।

হার্লেমে নেমে ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকালাম। খুব শান্ত, যে কোনো ভদ্র জায়গার মতো মনে হচ্ছে। সিডনি বলল, 'তোমাকে বাড়িতে এনেছি শুনলে আমার বউ খুব চটে যাবে।'

'সেকি কেন? তাহলে গিয়ে দরকার নেই।' আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

'না, না। ওর দোষ নেই। হাজার হোক তুমি উটকো মানুষ। কিছুই জানি না, তাই। ও বলে আমার নাকি কান্ডজ্ঞান নেই। তা হঠাৎ যদি এসে পড়ে বলো

অনেকদিনের আলাপ।'
বলতে চাইলাম অনেকদিনের আলাপ থাকলে তোমার বউ তো আমার নাম শুনবে। ততক্ষণে আমি সিডনিকে অনুসরণ করেছি। বড় রাস্তা থেকে গলিতে ঢুকে মনে হলো কলকাতার রাজাবাজারের ভেতর কিংবা মার্কুইস স্ট্রিটে এসে পড়েছি। কালো শিশুরা কিলবিল করছে। অর্থনৈতিক দুরবস্থার ছাপ সর্বত্র। বিশাল চেহারার নিগ্রো পুরুষরা অলস ভঙ্গীতে আড্ডা মারছে। মাতলামো করছে কেউ কেউ। একটিও সাদা আমেরিকানকে দেখতে পেলাম না। দুশো বছরের শাসনে সাদাদের সঙ্গ পেলে যে স্বস্তি পাই কালোদের সঙ্গে তা পাই না। ক্রমশ আমার ভয় ভয় করতে শুরু করল। যেভাবে গলিতে ঢুকছি তাতে একা বেরুতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। অথচ এখান থেকে ফিরেও যাওয়া যায় না। জনাকীর্ণ এক দোতলা বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠে সিডনি তালা খুলল। ইলিয়ট রোডে এইরকম ঘব আমি প্রচুর দেখেছি। ড্রইং-রুম ডাইনিং-রুম বেডরুম। পাশেই কিচেন এবং টয়লেট। একটা আঁশটে গন্ধ ঘরে। চেয়ার টেনে বসতে বলে জানলা খুলল সিডনি। তারপর আমার সামনে এসে বলল, 'তোমার নাম-টাই জানা হয়নি।'
প্রায় চারবারের চেষ্টায় নামটার কাছাকাছি উচ্চারণ করতে পারল। আমি কেক-গুলো দিয়ে বললাম, 'তোমার ছেলেমেয়েদের দেখছি না, ওদের জন্যে।'
সিডনি অবাক হলো, 'কি কান্ড। তুমি যখন কিনলে তখন ভাবলাম নিজের জন্যে কিনছো' আমাদের জন্যে গিফট এনেছ ? ধন্যবাদ। কিন্তু ছেলেমেয়েদের দিতে পারছি না সাম, কারণ ওরা নেই, মানে হয়নি। তোমাকে সাম বলে ডাকছি।'
কেকের প্যাকেটটা টেবিলে রেখে ও দুটো গ্লাস আর একটা বোতল বের করল। আমার চেনাজানা কোনো মদের নাম ওই বোতলে লেখা ছিল না। অনেকটা ঢেলে একটা গ্লাস আমাকে দিয়ে বলল, 'তাহলে আমার কবিতা তুমি শুনবেই ?'
পৃথিবীর সব দেশের কবি এবং গায়ক সম্ভবত শুরুর দিকে এক ধরনের ভণিতা করে থাকেন। এই সময় তাদের মুখ বেশ লজ্জিত লজ্জিত দেখায়। সিডনিকেও দেখাল।
'কবিতা শুনব বলেই তো এতদূরে এলাম।'
'আমি খুব ভালো পড়তে পারি না যদিও।' সিডনি গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে ওর কবিতাব সাইক্লোস্টাইল ফোল্ডারের পাতা খুলল। মুখের কাছে সেটাকে নিয়ে গিয়ে সে পড়া শুরু করল,

'আমার শিরায় যে রক্ত ঘোরে ফেরে
তা নাকি পুরুষানুক্রমে পাওয়া।
আমার চামড়ার রঙ দিয়েছেন পিতা পিতামহেরা।
আমার ঘাম কিন্তু আমারই
কেউ দেয়নি দিতেও পারে না।'

মুখ তুলল সিডনি, 'কেমন লাগল ?' মাথা নাড়লাম, 'চমৎকার।' 'মদটা খাও হে, মদ না খেলে কবিতা জমে ?'

জিভে নিয়েই বুঝলাম এ দ্রব্য বঙ্গ সন্তানদের জন্যে নয়। কিন্তু ওই আঁশটে ঘর, অদ্ভুত আসবাব, বাইরে কালো বাচ্চাদের চিৎকার এবং দুপুর পার হতে যাওয়া সময়টা একটা জাদু তৈরি করেছিল। আমি দুটো গ্লাস শেষ করলাম কবিতা শুনতে শুনতে। আফ্রিকার কোনো গ্রামের মাদলের সুর, দুশো বছর আগে জাহাজে ঠাসাঠাসি ক্রীতদাসরা, নোনতা ঘামে বাধ্য যৌনতা যা কিনা সাদা চামড়া প্রয়োজনে প্রজননের জন্যেই।

এইরকম অনেক কবিতার পাশাপাশি একটি—'মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে পৃথিবীর অন্য মানুষদের বাড়িতে যাই। তারা কেমন মদ খায়, কেমন গান গায়, কেমন কবিতা লেখে? তাদের সদ্যজাত শিশুর গালে ঠোঁট চেপে বলি বাছা বেঁচে থাকো ভালো থেকো।'

আমার কি নেশা হচ্ছে। আমার কেন এই কবিতা এতো ভালো লাগছে। কেন সিডনিকে প্রায় দেবদূতের মতো মনে হচ্ছে। আমি যখন দু'গ্লাসে তখন সিডনি পাঁচ পেরিয়ে গেছে। এখন বোতল শূন্য। সে হঠাৎ পড়া থামিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'দাঁড়াও আর একটা কিনে আনি।' আমার আপত্তি শুনল না সিডনি। আমায় একা বসিয়ে রেখে সে বেরিয়ে গেল। এই প্রথম মনে হলো লোকটা সত্যি কান্ড-জ্ঞানহীন। এক অজানা মানুষের কাছে ঘর রেখে দিয়ে কেউ এভাবে বেরিয়ে যায়? এই সময় আমি টেলিফোনটা দেখতে পেলাম। ঘরের দেওয়ালে ওটা ঝুলছে। মনোজকে ফোন করব? সিডনি কিছু মনে করবে না তো। দরজায় শব্দ হতে মুখ ফিরিয়ে যাকে দেখলাম সে প্রচন্ড বিস্মিত। মধ্য তিরিশেই বয়স। লম্বা, স্বাস্থ্যবতী, কাঁথার মতো সেলাই করা চুল, হাতে ব্যাগ, স্কার্ট পরা কালো যুবতী আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'সিডনি কোথায়?'

'একটু আগেই বেরিয়েছে। এখনই আসবে।'

'আপনি কে?'

'আমি একজন ভারতীয়। সিডনির কবিতা শুনছিলাম।'

'ভারতীয়! ওর সঙ্গে কবে আলাপ?'

উত্তরটা আমাকে দিতে হলো না। সিডনির গলা পাওয়া গেল পেছনেই, 'তোমাকে বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম সামের কথা। খুব ভালো কবিতা বোঝে। সাম, আমার বউ ডেইজি।'

ডেইজি ব্যাগ রাখল, 'যাক আমি ভাবলাম তোমাদের আজই পরিচয় হয়েছে।' কেক দেখে ডেইজি খুব খুশি। আমরা আড্ডায় জমে গেলাম। সিডনির কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। ডেইজি তাকে আর নিতে নিষেধ করছিল। কিন্তু মাতালদের সব সময় একটা জেদ চেপে থাকে। সিডনি বলল, 'আমার বউ দারুণ গাইতে পারে। ওর গান শোন।'

ডেইজি বলল, 'তুমি যদি এটাকেই শেষ গ্লাস কর তাহলে গাইব।'

সিডনি মাথা নাড়ল। ডেইজি উঠে গিয়ে একটা ছোট যন্ত্র বের করল। তার বোতাম টিপে সুর তুলতেই বাইরে তুলকালাম কান্ড শুরু হলো। উত্তর কলকাতার বস্তির সামনে যাঁরা থাকেন তাঁরা এই শব্দাবলীর সঙ্গে পরিচিত হবেন।

সিডনি হাত নেড়ে বলল, 'ঘাবড়িও না! দু-একটা ফালতু লোক মরতে পারে এই মাত্র। শোন একটা কবিতা, 'পৃথিবীর ওজন বাড়ছে। ওজন বাড়া মানেই চর্বি জমা। যা ক্রমশ রোগ আনবে। পৃথিবীর জগিং করা দরকার। ফালতু চর্বি ঝরাতে কেউ কেউ ছুরি কিংবা বুলেটে শান দিক।' এখন বেচারার কথা আর স্পষ্ট নেই। ডেইজি আমাকে ইশারা করল কথা না বলতে। এবং সে গান ধরল। আমি অবাক হলাম। এই কৃষ্ণা মেয়েটির গলা ভারি সুরেলা। আমাদের সন্ধ্যা মুখার্জির মতো। কৈশোরে স্বপ্ন দেখতাম সুচিত্রা সেনের মতো কোনো নারী সন্ধ্যা মুখার্জির গলায় আমার মাথার পাশে বসে জ্যোৎস্না রাতে গান গাইছে। ডেইজি গাইছিল, 'আমার শিরার রক্ত নাকি

পুরুষানুক্রমে পাওয়া

আমার গায়ের চামড়ার রঙ

পিতামহদের দেওয়া

আমার বুকের কান্না কিন্তু

নিজের করে নেওয়া।'

সিডনির কবিতার লাইন একটু অদলবদল করে নিয়েছে ডেইজি। বললাম, 'ভারী সুন্দর।' ডেইজি লজ্জা পেল। আমি বললাম, 'এবার উঠব। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের।'

ডেইজি বলল, 'ঠিক আছে। আপনার সঙ্গে পরে সিডনির মাধ্যমে যোগাযোগ করব।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার খুব আগ্রহ। সিডনি তো ঘুমিয়ে পড়েছে। আপনি একা যেতে পারবেন বাস স্টপে? দাঁড়ান, বাইরে ঝামেলা হলো, আমি আপনাকে এগিয়ে দিচ্ছি।

রাস্তায় নেমে দেখলাম চারপাশ থমথম করছে। ডেইজি বলল, 'কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা আমাকে অনুসরণ করুন।'

কোথাও পুলিশ দেখতে পেলাম না। বাস স্টপে এসে ডেইজি বলল, 'আবার দেখা হবে। সেদিন আমরা অনেক গল্প করব। মদ না খেলে সিডনির মতো মানুষ হয় না।'

বাসের সিটে বসে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। এই পথ চিনে সিডনির বাড়িতে যাওয়া অসম্ভব। সিডনিও কোনোদিন আমাকে খুঁজে বের করতে পারবে না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করলেও আমি সিডনির বাড়িতে যেতে পারব না।

কিন্তু তারপরেই মনে হলো এখন কি হবে? এই বাস থেকে নেমে আমি কুইন্সে যাব কি করে? সব পথই যে একরকম লাগছে।
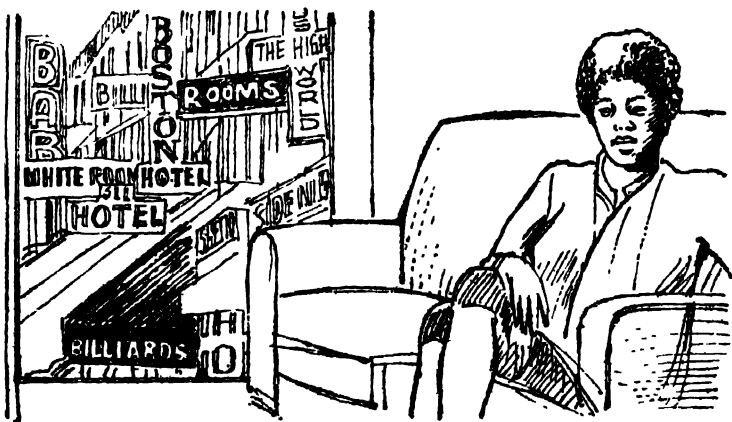
টাইমস স্কোয়ারের পেছনের দিকে বাস থেমেছিল। সেখানে নেমে ধর্মতলা স্ট্রিটের মতো জনতার ফুটপাত ধরে কিছুক্ষণ হাঁটলুম। এ রাস্তায় নিগ্রোদের ভিড় রয়েছে। কিন্তু তারা এখানে প্রায় অবহেলিত। বিকেল হয়ে এসেছে। মদ্যপান করলেও মানুষের খিদে পায়। একটা ম্যাকডোনাল্ডে ঢুকে কিছু পেটে পুরলাম। ম্যাকডোনাল্ডের দেওয়ালে টেলিফোন ঝোলানো। মনোজ বলেছিল অসুবিধে হলেই যেন ওকে ফোন করি। ও সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে। ইচ্ছেটা দমন করলাম। দেখাই যাক না। ম্যাকডোনাল্ডের টেবিল অনেকটা কফিহাউসের মতো। চট করে কেউ উঠিয়ে দেয় না। তার একটায় বসে রাস্তা দেখছি। ছুটির দিনেও ভিড় কম নেই। শুধু এই অঞ্চলেই গাড়িতে যেতে আসতে দেখেছি নিউইয়র্কের অনেক পাড়ার ফুটপাতে সারাদিনে গোনাগুনতি মানুষ চলে।
সন্ধ্যের মুখটায় ফুটপাত ধরে হাঁটছে। হঠাৎ একটা বড় দোকান চোখে পড়ল। প্রথমে মনে হয়েছিল দাবার বোর্ডের দোকান। পরে বুঝলাম এখানে দাবা খেলা হয়। ভেতরে গোটা বিশেক টেবিল পাতা। বোর্ড সাজানো। প্রতিটি টেবিলে একজন করে খেলোয়াড় অপেক্ষা করছে। এক ডলার থেকে কুড়ি ডলার টেবিল বিশেষে পাওয়া যাবে সেই টেবিলের খেলোয়াড়কে হারাতে পারলে। অনেকেই খেলছে। জিতছে কেউ কেউ। একটা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখে মনে হলো আহামরি কিছু নয়। বাল্যকালে জলপাইগুড়িতে যখন বৃষ্টি নামত, মাঠ-ঘাট কয়েকদিনের জন্যে একাকার হয়ে যেতো তখন বাইরে বেরুবার উপায়

থাকত না। পিতামহ মনে করতেন শুধু পড়াশোনা নয় একজন ছাত্রের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। তা সেসময় যখন ঘরবন্দী তখন তিনি দাবার বোর্ড নিয়ে বসতেন। শৈশবে দেখেছি চা বাগানের বাড়ির বারান্দায় হ্যাজাক জেবলে বন্ধুর সঙ্গে দাবা খেলতে তাঁকে। বন্ধু মারা যাওয়ার পর একাই বোর্ড সাজিয়ে তার হয়ে চাল দিতেন। কয়েকটা বর্ষাকালের সুবিধে পেয়ে খেলাটা একটু একটু করে শিখে ফেললাম। এবং একদিন হারিয়েও ফেললাম তাঁকে। তখন তিনি প্রবল উৎসাহে লুকানো চাল শেখাতে লাগলেন। কোনো বল না মেরে কি করে গজ মন্ত্রীর আক্রমণে প্রতিপক্ষের রাজাকে বশ করা যায়, কি করে প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দেওয়া যায়, নিজের বল খাইয়ে কি করে বড়ো আঘাত করা সম্ভব বুঝতে আরম্ভ করেছিলাম। তা সেই সময় বর্ষার দিনগুলো যেহেতু অস্থায়ী হতো তাই পোক্ত হতে পারিনি। একডলারের টেবিলে বসে পড়লাম। প্রতিপক্ষ বৃদ্ধ। ডলারটি নিয়ে গেল এক কর্মচারী। জিতলে প্রতিপক্ষ যে টোকেন দেবে তা দেখালে কাউন্টার থেকে দুটো ডলার পাওয়া যাবে। ওদের খেলোয়াড় নাকি সব সময় সাদা ঘুঁটি নেবে, এটাই নিয়ম। গজ মন্ত্রীর যুগ্ম আক্রমণ কাজে লাগল না। বৃদ্ধ এসব জানেন। অনভ্যাস আমাকে পরাস্ত হতে সাহায্য করল। বৃদ্ধ বলল, 'তুমি আর একবার চেষ্টা কর। আমার আর মোটেই বাসনা ছিল না। বৃদ্ধ খুব অনুরোধ করছিল। শেষতক বলেই ফেলল, 'আট ঘণ্টা শেষ হবে তিরিশ মিনিট পরে। মাত্র পাঁচজন খদ্দের পেয়েছি। ফরটি পার্সেণ্ট পাই আমি। দু'ডলারে এই বাজারে চলে?'

জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু আপনি যদি হেরে যান?'

মালিক পঞ্চাশ সেণ্ট কেটে নেবে। তবে হারি না। ব্যাপারটি জানো আমার চেয়ে ভালো খেলোয়াড় এক ডলারের জন্যে খেলবে কেন? কিন্তু বৃদ্ধের অনুরোধ রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। রাস্তায় এখন ঝকমকে আলো জবলছে। পর্নো হাউসগুলো ছাড়িয়ে কিঞ্চিত এগোতে বেশ ঘাবড়ে গেলাম। সারা মুখ চুলে বিচিত্র রঙ মেখে ফুটপাত জুড়ে শুয়ে বসে আছে গোটা পনের তরুণ-তরুণী। ছেলেদের পরনে জিনসের প্যাণ্ট আর মাথার চুল অর্ধেক কামানো। কানে বিশাল মাকড়ি। মেয়েদের বেশির ভাগ সাজ আরও উৎকট। ওদেরও কারো মাথার চুল সিকি ভাগ কামানো এবং বেঁচে যাওয়া অংশে হলদে রঙ করা। পরনে চামড়ার স্কার্ট। যেভাবে ওরা চিৎকার করে এ ফুটপাত ও ফুটপাতে বাক্যবিনিময় করছে তা দেখে ভয় পেতে হয়ই। বুঝলাম ভদ্রলোকেরা এই তল্লাটে আসছে না। আমাকে যেতে হলে ওদের টপকে টপকে যেতে হবে। কেউ কেউ যাচ্ছেও। ওরা ভ্রুক্ষেপ করছে না। পা সরিয়েও নিচ্ছে না। সেইভাবে যাচ্ছিলাম হঠাৎ একটি মেয়ে হাত উঁচিয়ে আমাকে থামাল, 'হেই মিস্টার, যদি আমার গায়ে তোমার পা লাগে তাহলে এখনই আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করব।' কথাটা শুনে তার সঙ্গীরা খুব হৈ হৈ করে উঠল, 'বিয়ের পর হনিমুনে যাবি কোথায়?' মেয়েটি ওদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে জবাব দিলো, 'ওর ব্যাঙ্কে।' কি মাথায় এসেছিল জানি না, হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তুমি বিয়ে করতে চাও?' মেয়েটি চোখ পাকিয়ে

তাকাল। পা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'যাও, চরে খাও।' হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। হঠাৎ ডাক শুনলাম কয়েক পা এগোতেই, 'হেই মিস্টার।' মুখ ঘুরিয়ে লোকটাকে চিনতে পারলাম, 'যদি কিছু মনে না কর তুমি আর তোমার বন্ধু আমার পাবে গিয়েছিলে না? আমি চার্লি।'
আমরা করমর্দন করলাম। চার্লি বলল, 'যাক, শেষ পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে মেয়েটির ভাব হয়ে গিয়েছিল বলে আমি খুশি! 'আই হেট ইউ' শুনলে আমিও চটে যেতাম। কিন্তু তুমি এই পাঙ্কটাকে চমৎকার ম্যানেজ করলে তো?' তোমাদের দেশে পাঙ্ক আছে?' হেসে জবাব দিলাম, 'এখনও আমেরিকা ওদের ওখানে রপ্তানি করেনি। এদের পুলিশ কিছু বলে না।
বলে না আবার! পুলিশের গাড়ি দেখলেই সটকে পড়ে। তুমি কোথায় যাচ্ছ?'
'কোথাও না। আমি হাঁটছিলাম।'
'চল, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি। আজ আমার ডে অফ।'
'এই পাঙ্কদের বাড়িঘর কোথায়?'
'সাধারণ মানুষদের মতনই। হিপিরা ছিল নিরীহ এরা শয়তান। কাজকর্ম করবে না, মাঝে বাড়িতে গিয়ে টাকার জন্যে মা বাবাব সঙ্গে ঝামেলা করবে। না পেলে জিনিসপত্র চুরি করে এনে বিক্রী করে দেবে। এটাই নাকি ওদের প্রতিবাদের রাস্তা। বদমায়েসি করলে পুলিশ ওদের মারে কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ হচ্ছে না। প্রত্যেকটার যৌনরোগ আছে। আবার এদের মধ্যে প্রতিভাবাপন্ন গায়ক আছে কয়েকজন। পাঙ্কমিউজিক রেকর্ড করেছে তারা। বিক্রিও হয়। তোমার ডাকনামটা কি যেন?'
হেসে বললাম, 'সাম।'
'ইয়া! সাম! আচ্ছা তোমার হাতে যদি সময় থাকে তাহলে আমার সঙ্গে এসো।' চার্লি যেদিকটা দেখাল সেদিকে একটি নাইট ক্লাবের সাইনবোর্ড। এখন সবে সন্ধে। নাইটক্লাব কখন খোলে? আমি তো পোশাকে তৈরিও নই। কিন্তু চার্লি সেসব শুনল না। ভেতরে ঢুকে খুব হতাশ হলাম। আমাদের ছোট ব্রিস্টলের মতো একটা মদ্যশালা কিন্তু একপাশে চেয়ার সাজানো রয়েছে ছোট ডায়াস ঘিরে। তার ওপর মাইক ড্রাম রাখা। কিছু মহিলা পুরুষ ইতিমধ্যে সেখানে বসে মদ্য পান করছেন। আমরা বসলাম। চার্লি দুটো বিয়ার নিল। নাইট ক্লাব সম্পর্কে আমার যা ধারণা ছিল তা পালটে দিয়ে এক আধা সুন্দরী পূর্ণ পোশাকে প্রকাশিত হয়ে গোটা পাঁচেক গান গাইলেন। তাঁর পর এক পুরুষ দায়িত্ব নিলে তিনি চটজলদি চলে এলেন আমাদের পাশে। এসে চার্লির হাত জড়িয়ে বললেন, 'তুমি একবারও হাততালি দাওনি।'
চার্লি হাসল, 'মনে মনে দিয়েছি ডার্লিং।'
মহিলা বললেন, 'দুষ্টু।' ইতিমধ্যে মহিলার মধ্যপ্রদেশ দেখে আমার বুঝতে অসুবিধে হয়নি ওঁর জীবনে পরিবর্তন এসেছে। চার্লি আলাপ করিয়ে দিলো, 'আমার বান্ধবী। আর এ হলো সাম, ফ্রম ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়া। সাম, নেক্সট উইকে আমরা যাচ্ছি জ্যামাইকা, হনিমুন করতে।' 'হনিমুন। এতদিন সময়

পাওনি বোধহয় ?' জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে মহিলা হেসে গড়িয়ে পড়লেন। চার্লি বলল, 'সময় পাবো না কেন ? কিন্তু বিয়েটা করছি আগামী সপ্তাহেই। বিয়ের পরের দিনই চলে যাব।'
কোনো মহিলার মধ্যপ্রদেশের দিকে সজাগ হয়ে তাকানো উচিত নয়। কিন্তু এতটা ভুল হবে বলে মনে হচ্ছে না তো। জিজ্ঞাসা করলাম, 'জ্যামাইকা কেন ?'
'ওখানে এক সপ্তাহ থাকলে চামড়া বেশ পুড়ে যাবে। ও চাইছে ওর বাচ্চার গায়ের রঙ যেন ফ্যাক ফেকে সাদা না হয়। জ্যামাইকার সূর্য হয়তো ওর বাচ্চা-টাকেও হেল্প করবে। শী ইজ এক্সপেক্টিং উইদইন থ্রি মান্থস। চার্লি খবরটা দিলো। বললাম, 'ওর বাচ্চা বলছ কেন, তোমারও তো।' চার্লি মাথা নাড়ল, 'না-না। ওর আগের স্বামীর বাচ্চা ও ক্যারি করছে। ডিভোর্স পেয়েছে দিন সাতেক হলো।' কথাগুলো বলে চার্লি মহিলাকে চুম্বন করল সভালবাসায়। চার্লি আর ওর ভাবী বউ আমাকে টিউব স্টেশনে পৌঁছে দিলো দশটার পরে। পই পই করে ওরা আমাকে বুঝিয়ে দিলো আমাকে কি করতে হবে। এই টিউব সরাসরি কুইন্স যাবে না। মাঝখানে দু'দুবার পালটাতে হবে টিউব। স্টেশন-গুলোর নামও ওরা বলে দিলো। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে টিউবে ওঠার পর মনে হলো ওদের ভাবী মিলিত জীবনের জন্যে একটা ছোট্ট অভিনন্দনও জানানো হলো না আসার সময়। প্রথম স্টেশনে ট্রেন পালটাতে অসুবিধে হয়নি। লোকজন ছিল অনেক। জিজ্ঞাসা করে হদিশ জেনে নিতে পেরেছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় স্টেশনে এসে হকচকিয়ে গেলাম। শুনসান চারধার। কোন প্ল্যাটফর্মে যেতে হবে কুইন্সের টিউব ধরতে তাই জানতে পারার লোক নেই। মাঝে মাঝেই এপাশ ওপাশ থেকে ট্রেন আসছে বেরিয়ে যাচ্ছে। এর কোনো একটা নিশ্চয়ই কুইন্সে যাবে। এই সময় আমি একজনকে আসতে দেখলাম। গায়ের রঙ সাদা আমেরিকানদের মতনই, বছর পঞ্চাশেক বয়স। হাঁটার ভঙ্গিতে বোঝা যায় খুবই ক্লান্ত। রোগা, গালভাঙা, জীর্ণ, একটি স্যুট শরীরে। ওকে দেখে এই রাত্রেও আমার বিজন ভট্টাচার্যের কথা মনে পড়ল। অনেক কাল আগে আমরা এক সকালে মুক্তাঙ্গনে নাটকের পোস্টার লাগাচ্ছি এই সময় বিজনদা এলেন একজনকে সঙ্গে নিয়ে। নবান্নের নাট্যকার এবং অভি-নেতা হিসেবে এই প্রবাদ পুরুষটিকে আমি প্রথমে চিনতেই পারিনি। পাজামা এবং মলিন পাঞ্জাবিতে মনে হয়েছিল একদা কম্যুনিস্ট পার্টি করা সৎ কোনো কমরেড যিনি নিজের জন্যে কিছু জমিয়ে রাখার কথা ভাবতে পারতেন না। উনি হাঁটছিলেন খুব ক্লান্ত ভঙ্গিতে। এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি নাটক আঁ ?' নাম জেনে বলেছিলেন, 'আমরা করছি গর্ভবতী জননী।' বলে একই ভঙ্গিতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তখন মনে হয়েছিল রসিকতা করেছেন পরে ভুল ভেঙেছিল। এই মানুষটির চেহারা ঠিক বিজনদার মতো। হাতে একটা ব্যাগ যা হরিপদ কেরানিরাই বহন করে থাকে। ব্যাগটা আধ ভর্তি। ইনি এমন এক-জন আমেরিকান যাঁর সঙ্গে কথা বলতে আমার কোনো সঙ্কোচ হলো না, 'আচ্ছা, কুইন্সে যাওয়ার টিউব কোথায় পাব ?'

ভদ্রলোক চশমার ফাঁকে এমন ক্লান্তভঙ্গিতে তাকালেন যেন এমন প্রশ্ন জীবনে শোনেননি। শেষে মাথা নেড়ে বললেন, 'আমিও ওদিকে যাচ্ছি। পাকিস্তানী ?'
'না। ভারতীয়। আমি নতুন এসেছি।'
'চাকরি পেয়েছেন ?'
'আজ্ঞে না, আমি চাকরি করতে আসিনি।'
'দেশে কি কর ?'
'লেখালেখি করি।'
'ওতে চলে যায় ?'
'মোটামুটি।'
'ধরো, এক কিলো আলুর দাম তোমাদের দেশে কত ?'
'তিরিশ সেন্টের মতো ?'
'মাই গড !' তারপর শুরু হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম জানা। বাড়িভাড়া কত লাগে ? শেষমেশ বললেন, মাসে তিনশো ডলার রোজকার করলে তোমার দেশে ঝি চাকর রাখা যায় বলছ ? আমি যদি যাই তাহলে এই বয়সে চাকরি পাব ? আমি বাহান্নতে পড়েছি ?'
বিরাট ধাক্কা খেলাম। কখনও কল্পনা করিনি কোনো আমেরিকান ভারতবর্ষে চাকরি করতে আসতে চাইবে শুধু ভালভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার জন্যে। মুখের দিকে তাকাতে মনে হলো বড় কষ্টে আছেন। এইসময় একটা ট্রেন আসতেই আমাকে ইঙ্গিত করে উঠে পড়লেন ভদ্রলোক। প্রায় ফাঁকা কামরা। হু হু করে ট্রেন ছুটছে। জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাগে কি নিয়ে যাচ্ছেন ? বললেন, 'পাঁউরুটি, মাখন, সংসারের টুকিটাকি জিনিসপত্র। যে চাকরিটা করি তাতে সংসার চলে না। আমার স্ত্রী কাজকর্ম করে না। বসে বসে খায়। তাই বিকেলে আর একটা কাজ আনঅফিসিয়ালি করি। খুব কম দেয়, কিন্তু দেয় তো।'
ভদ্রলোক মাথা নামালেন। চিবুক প্রায় বুকে ঠেকেছে। চোখ বন্ধ। চট করে মনে পড়ল ব্যারাকপুর কিংবা বনগাঁ লোকালে রাত ন'টা দশটায় এই রকম অনেক মানুষকে শিয়ালদা থেকে সস্তার বাজার করে ফিরতে দেখেছি। মানুষটির জন্যে বড় মায়া হলো। হঠাৎ তিনি মাথা তুলে সিটের গায়ে আঁটা স্টেশন ইন্ডিকেটার দেখলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'অনেকদিন পরে একজন ইয়ংম্যানের সঙ্গে পার্সোনাল প্রব্লেম নিয়ে কথা বললাম। ধন্যবাদ। তোমার স্টেশন এসে গিয়েছে। তৈরি হও।' ওঁর চিবুক আবার বুকে ঠেকল।
স্টেশনের বাইরে এসে মনে হলো একটা মৃত শহরে পা রেখেছি। হু হু হাওয়া বইছে। ঠান্ডায় দাঁতে দাঁত বাজনা তুলছে। দু'পকেটে হাত ঢুকিয়েও নিস্তার নেই। সামনের চওড়া রাস্তায় শুধু উজ্জ্বল আলো কিন্তু একটিও মানুষ নেই। মাঝে মাঝে তীব্র গতিতে গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। ফরিদার সঙ্গে একা এই স্টেশনে এসেছিলাম বাসে। এখন বাসও চোখে পড়ছে না। হেঁটে গেলে কতটা এবং কোন পথে গেলে মনোজের বাড়িতে পৌঁছাবো তাও বুঝতে পারছি না। শুধু মনে আছে আমরা যখন বাস থেকে নেমেছিলাম তখন স্টেশনটা বাঁ দিকে

ছিল। তাহলে এখন ডান দিকে হাঁটলে কেমন হয় ?
নির্জন চওড়া রাস্তায় একা হাঁটছি। এদিকের যেকোনো বাড়ি ঘরই এক চেহারার। মনোজের বাড়ির সামনের রাস্তাটার নাম মনে আছে, নম্বরটা এত বড় যে খেয়াল করতে পারছি না। রাস্তাটায় পৌঁছে গেলে কি আর বাড়িটা চিনতে পারব না ?
সেই রাত্রে বাড়ি ফিরেছিলাম ঠিকই কিন্তু একা নয়। আমেরিকান পুলিশের সাহায্য নিয়ে। মনোজই এসে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। ওর বাড়ির দশ মিনিটের মধ্যে পাক খাচ্ছিলাম। বাড়িতে ওঠার পর মনোজ বলেছিল, 'করেছেন কি ? সারাদিন একদম উধাও ? চিন্তায় মাথা খারাপ হবার যোগাড়। তার ওপর ফরিদাটা সব গোলমাল করে দিলো।'
'ফরিদা ? সে আবার কি করল ?' গাড়ির উত্তাপ আমার ভালো লাগছিল। মনোজ বলল, 'আপনি ওর ওখানে দুপুরে ঘুমাচ্ছিলেন ?'
'না তো ! ফরিদা বলেছে ?'
'হ্যাঁ। বলল ডেকে দিতে পারবে না। তা কথাটা আমি সরলভাবে মিসেসকে বলে নিরুদ্বিগ্ন করতে চাইলাম। উলটে ভীষণ চটে গেল। ফরিদাকে ও পছন্দ করছে না। আপনি কেন ওর ফ্ল্যাটে গিয়ে ঘুমাবেন ? কিছুক্ষণ পরে ফরিদাকে ফোন করে বলল আপনাকে ডেকে দিতে। তখন ফরিদা জানাল, আপনি ওর ফ্ল্যাটেই যাননি। তখন রসিকতা করছিলো। উলটে আপনার খবর পাওয়া যাচ্ছে না বলে উদ্বিগ্ন হলো। কিন্তু মুশকিল হলো ফরিদার এই দ্বিতীয় স্টেট-মেণ্টটাও মিসেস বিশ্বাস করছে না।' মনোজ খুব সিরিয়াসলি বলছিলো। একটু ঘাবড়ে গেলাম, 'তাহলে কি হবে এখন ?'
'কি আর হবে। আপনি যদি গিয়ে থাকেনও তাহলে ওর রাগ করার কি আছে ? আমার সঙ্গে এই নিয়ে একচোট হয়ে গেল।' মনোজ ওর বাড়িতে পৌঁছে গেল।
দরজা খুললেন মনোজের স্ত্রী। দেখলাম শ্যামলও জেগে বসে আছে। বললাম, 'অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু সত্যি সত্যি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম।'
মনোজের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় ?'
'আপনাদের বাড়ির কাছেই। সারাদিন হার্লেমে এক নিগ্রোর সঙ্গে ছিলাম। লোকটা কবি।' শ্যামল বলল, 'বাঃ। তাহলে তো দিনটা চমৎকার কেটেছে। কবিতা শুনেছেন ?'
'হ্যাঁ। দাঁড়াও বলছি। মাঝে মাঝে মনে হয় পৃথিবীর অন্য মানুষদের বাড়িতে যাই। তারা কেমন মদ খায়, কেমন গান গায় ? তাদের সদ্যজাত শিশুর গালে ঠোঁট চেপে বলি বাছা বেঁচে থাকো, ভালো থাকো।'
মনোজ হাততালি দিলো। শ্যামল মাথা নেড়ে ওপরে উঠে গেল। আর মিসেস ভৌমিক কি করবেন বুঝতে না পেরে ভেতরে চলে গেলেন। তখনই ফোন বেজে উঠল। মনোজ রিসিভার তুলে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমায় ডাকল, 'আপনার ফোন।'

রিসিভার তুলে হেলো বলতেই ফরিদা চেঁচিয়ে উঠলো, 'কোনো মেয়ের পাল্লায় পড়েছিলে? উঃ, কি চিন্তাই না হয়েছিল। দ্যাখো বাবা, দেশের ছেলে দেশে ফিরে যাও। গিয়েছিলে কোথায়?'
'হার্লেমে।'
'তাহলে ঠিক আছে।'
'মানে?'
'ওখানে যদি কোনো মেয়ের প্রেমে পড় তাহলে দারুণ সেবা পাবে।' বলে ফোন রেখে দিলো।
সেই রাত্রে বিছানায় শুয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। অনেককাল আগে আমি একবার অবালকোচিত অপরাধ করেছিলাম। পিতৃদেব খুব ক্ষিপ্ত হয়ে আমায় প্রহার করেছিলেন। পিতামহ বাড়ি ফিরে সেকথা শুনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন পিতৃদেবকে, 'তুমি ওর কাছে সঠিক ঘটনাটা জানতে চেয়েছিলে প্রহার করার আগে? কেন ও কাজটা করেছিল?' পিতৃদেব জবাব দিতে পারেননি। পিতামহ আমার প্রতি তারপর অনাবশ্যক স্নেহ দেখাননি। কিন্তু কথাটা মনে লেগে গিয়েছিল। আজ নতুন করে মনে পড়ল। মিসেস ভৌমিক আমাকে একবারও সঠিক কারণ জিজ্ঞাসা করেননি। হয়তো তাঁর বিশ্বাস আছে আমি সত্য গোপন করতাম। কলকাতায় সুধীজনেরা দেখেছি বানানো গল্প সত্যি বলে ভাবতে ভালবাসেন। এবং সেই গল্প অন্য কারো কাছে করার সময় আরও একটু বানিয়ে ফেলেন নিজের অগোচরেই। ফরিদার মানসিকতা অর্জন করতে ক'জন মেয়ের পক্ষে সম্ভব হবে জানি না কিন্তু বিপরীত ভাবনা ভাবতে পারার মতো মেয়েব অভাব আমাদের দেশে নেই। মাঝরাতে কিংবা শেষরাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল টয়লেট যাওয়ার প্রয়োজনে। দরজা খুলে অন্যমনস্ক হয়ে টয়লেটের কাছে পেঁছে বসার ঘরের সোফার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। মনোজ সেখানে উপুড় হয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। অথচ ও আমার সামনেই বেডরুমে ঢুকেছিল। ওর বেডরুমের আরাম কি ড্রইং রুমের সোফার চেয়ে কম? কোনোদিন জিজ্ঞাসা করতে পারিনি।
নিউইয়র্কে এসে এই প্রথম মধ্যাহ্নভোজন করলাম বেলা এগারটায়। স্যুটকেস গাড়িতে তুলে যখন লনে দাঁড়ালাম তখন বাড়ির সবাই পেছনে। হঠাৎ মনে হলো আমি যেন নিজের বাড়ি থেকেই বেরুচ্ছি। এবং মন খুব খারাপ হয়ে গেল। আদৌ যেতে ইচ্ছে করছিল না এমনকি পাশের বাড়ির বুড়িও আমার দিকে জুলজুল চোখে তাকিয়ে।
মিসেস ভৌমিক বললেন, 'রোজ একবার ফোন করবেন ন'ইলে চিন্তায় থাকব। আর দেশে ফেরবার আগে কিছুদিন এখানে থাকা চাই।'
মনোজ গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, 'একেই বলে স্ত্রী চরিত্র। গতরাত্রে আপনার ওপর ক্ষেপে গিয়েছিল আর আজ দেখুন। যাক কাজের কথা বলি, আমেরিকায় যেখানেই থাকুন অসুবিধে হলেই আমার এ্যাকাউন্টে ফোন করে জানাবেন।'
স্টেশনে পেঁছে মনোজই টিকিট কেটে দিলো, জোর করে। আমার স্যুটকেস বয়ে

নিয়ে গেল যে পর্যন্ত বিনা টিকিটে যাওয়া যায়। তারপর বলল, 'এনজয় ইওর-সেল্ফ। ইতিমধ্যে আমি আপনার স্ক্রিপ্‌ট ধরে সটাডিভিসন করতে শুরু করি। নেমে যান।'

ভারী স্যুটকেস হাতে নিয়ে চলন্ত সিঁড়িতে পা রাখতেই সেটা আমাকে তর তর করে নিচে নামাতে লাগল। মুহূর্তে মনোজ চোখের আড়ালে। আর আমি আমার চিরকালীন নিঃসঙ্গতা রোগে আক্রান্ত হলাম। বুকের মধ্যে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ভার চেপে বসেছিল। এখন থেকে আমি একা। কারো সঙ্গে মনের কথা বলতে পারব না। স্যুটকেস টেনে টেনে চলছি প্ল্যাটফর্ম ধরে। পাশেই একটা লম্বা ট্রেন দাঁড়িয়ে যার সবকটা দরজা বন্ধ। এবং টিউবট্রেনের মতো দেখতে নয়। একদল রেলের অফিসার দাঁড়িয়েছিলেন প্ল্যাটফর্মে, টিকিট দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কোন ট্রেন ওয়াশিংটন যাবে? ভদ্রলোক যেন আঁতকে উঠলেন, 'আরে তুমি করছ কি, এই ট্রেন এখনই ছেড়ে যাবে আর তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ।'

'ট্রেনের দরজা যে বন্ধ।'

ভদ্রলোক বিনা বাক্যব্যয়ে দরজার পাশের সুইচে চাপ দিতেই ওটা খুলে গেল। ওপরে উঠে মনে হলো রাজধানী এক্সপ্রেসের চেয়ারকার এর কাছে তৃতীয় শ্রেণীর। কম্পার্টমেন্ট-এ লোক আছে। অন্তত জানলার সিট খালি নেই। অতএব একটায় বসে সিগারেট ধরাতে যেতে একজন যাত্রী খুব ভদ্রভাবে বললেন, 'এটা ননস্মোকিং কম্পার্টমেন্ট।'

চটপট সিগারেট প্যাকেটে ঢোকালাম। ননস্মোকিং থাকলে স্মোকিংও নিশ্চয়ই থাকবে। এই সময় ট্রেনটা ছাড়ল। স্যুটকেস টেনে টেনে করিডোর দিয়ে একটার পর একটা কম্পার্টমেন্ট পার হচ্ছি। সবকটাতেই সিগারেটের ওপর লাল ক্রশ। এয়ারকন্ডিশন্ড গাড়িতে যখন ঘেমে উঠেছি তখন স্মোকিং কম্পার্টমেন্ট খুঁজে পেলাম।

কম্পার্টমেন্টটা একদম ফাঁকা। জানলার পাশে বসার পর নিজেরই অস্বস্তি হচ্ছিল। মনোজ বলেছে বটে আমেরিকানরা সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু তাই বলে এই অবস্থা হবে ভাবতে পারিনি। মনের সুখে সিগারেট ধরালাম। এই-ভাবে একা একা সিগারেট খেতাম ক্লাশ টেনে। তিস্তার চরে কাশবনের আড়ালে বসে সবাইকে লুকিয়ে।

নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটনে ট্রেনে যাওয়ার বুদ্ধিটা মনোজের, ভাড়া প্লেনের থেকে সামান্য বেশি হলেও দেশটা দেখতে পাবেন।'

ওয়াশিংটনের ওয়াশিংটন হাউস হোটেলে আজ আমাকে রিপোর্ট করতে হবে যদি আমেরিকান সরকারের আতিথ্য নিতে চাই। আগামীকাল সকালে ওঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। দুপুরে ওঁদের দপ্তরে বসে ঠিক হবে কোথায় কোথায় আমি যেতে পারি। কলকাতা ছাড়ার আগে সুপ্রিয়দা বলেছিলেন, 'যাই করো বাবা দয়া করে ঠিক সময়ে হোটেলে পৌঁছে যেও।' সুপ্রিয়দার কাছে কিছু টিপস চেয়েছিলাম। মনে প্রাণে বাঙালি অথচ আমেরিকান সংস্থার প্রাণপুরুষ মানুষটি এক গ্লাস লস্যি খাইয়ে বলেছিলেন, 'সবসময় মনে রাখবে তোমার নাম সমরেশ

মজুমদার এবং এটাই হলো সবচেয়ে বড় টিপস।' তারপর হেসে বলেছিলে
সাহেবরা যে ইংরেজি শিখিয়ে গেছেন তা যথেষ্ট। যখন মার্কিনের বাক্য বুঝে
পারবে না কিছু না বলে চুপ করে থাকবে। সে শেষ করলে বিনীত ভাবে বলবে
পার্ডন?' সুপ্রিয়দার কাছে গেলেই ভালবাসার স্পর্শ পাই কিন্তু এখন সেটা
অভাব বোধ করছিলাম।

হঠাৎ একজোড়া তরুণ-তরুণীকে দেখলাম কম্পার্টমেণ্টে ঢুকতে। পকেট থেকে
সিগারেট বের করে তারা সম্ভবত দেশলাই খুঁজছিলো। তরুণীর নজরে পড়
আমি সিগারেট খাচ্ছি। সটান উঠে এসে জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'লাইটা
পেতে পারি?'

বুঝেও না বোঝার ভান করলাম, 'পার্ডন? সুপ্রিয়দার কথা মনে রেখে। তরুণ
ইশারায় বুঝিয়ে দিলো সে কি চায়। কলকাতার দেশলাই ওর হাতে দিতেই
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর বন্ধুকে ডেকে দেখাল। বন্ধু জিজ্ঞাসা করল
'কি সিগারেট খাচ্ছ তুমি?' আমার প্যাকেটটা দেখাতে লোকটা বলল, 'আ
একটা পেতে পারি?' ওরা আমার সিগারেট খেল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালিয়ে
বুঝলাম ছেলেটি এবং মেয়েটির পরিচয় হয়েছে ট্রেনে ওঠার পর। ওরা যখন চলে
গেল তখন দু'জনের হাত দু'জনের কোমরে। এই কম্পার্টমেণ্টে কেউ স্থায়
বসতে চাইছে না। সিগারেট খেয়ে নিয়েই চলে যাচ্ছে যে যার কম্পার্টমেণ্টে।
ওয়াশিংটনে যখন ট্রেনটা পেঁছালো তখন কড়া রোদ। স্টেশনে নেমে ভিড়ে
সঙ্গে চলেছি স্যুটকেস টানতে টানতে। কাঁধের কাছে ব্যথা শুরু হচ্ছে। দু
তিনটে পোর্টার এগিয়ে এসেছিল কিন্তু ডলার খরচের ভয়ে রাজি হইনি। প্ল্যাট
ফর্ম থেকে বেরিয়ে বড় ঘড়ির তলায় এসে হকচকিয়ে গেলাম। কোন পথে যাব
অনেকগুলো একজিট পয়েণ্ট। এখান থেকে কিভাবে যাব? সামনেই রিসেপশন
একজন শ্বেতাঙ্গ এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গী প্রৌঢ়া কাউণ্টারে বসে। বয়স্কারা কোম
মনের অধিকারিণী হন। কাছে গিয়ে বললাম, 'আমি ওয়াশিংণ্টন হাউস হোটেলে
যাব। কিভাবে যেতে পারি?' মহিলা, যাকে দেখতে মানুর মায়ের মতো, তাঁ
সামনে দাঁড়ালাম। মহিলা বললেন, 'বাঁ দিকে এগিয়ে যান, টিউব পাবেন।'

'আমি টিউবে অভ্যস্ত নই।'

'আপনার পকেটে ডলার আছে? থাকলে ডান দিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে যান
পুরো ট্যাক্সি পাবেন। সোজা গেলে শেয়ারে ট্যাক্সি পাবেন। সোজা যাওয়া
ভালো, কারণ পয়সা তো রক্ত জল করে লোকে রোজগার করে, তাই না?' বৃদ্ধ
সস্নেহে বললেন।

১১
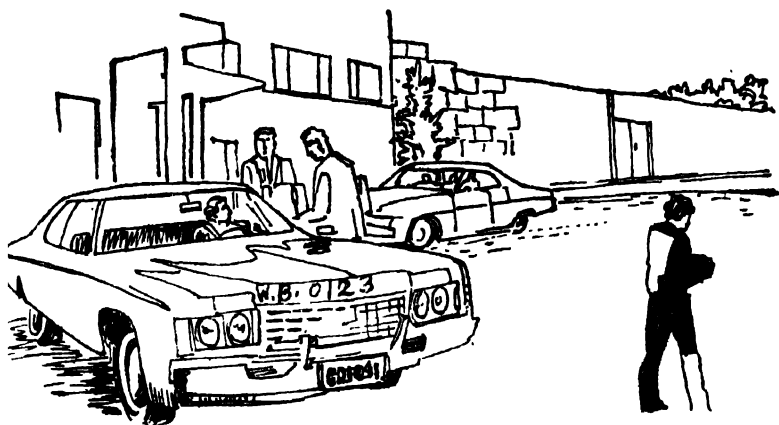
আমার স্যুটকেস যা কিনা মুকুন্দর কাছ থেকে ধার করে আনা মোটেই অনুগত ছিল না। ওর কান ধরে টেনে আনার চেষ্টা করলেই চাকাগুলো এমন ঘড় ঘড় আওয়াজ করত যে নিজের কানেই খারাপ শোনাতো। ওয়াশিংটন স্টেশনের বাইরে আসার জন্যে টানেলের মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময় শব্দটা যেন তিনগুণ বেড়ে গেল। পাশ দিয়ে হেঁটে চলা এক প্রৌঢ় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে উপদেশ দিলেন, 'শোন ভাই, তোমার উচিত স্যুটকেসের চাকার সাইলেন্সার ব্যবহায় করা। একাই চারধার কাঁপিয়ে দিচ্ছে।' কথা বলার লোক পেয়ে মাথা নাড়লাম, 'যা বলেছেন। আপনার সঙ্গে আমি একমত। তবে কিনা বস্তুটি ওয়াশিংটনে এসে এমন আওয়াজ ছাড়ছে। অবাক হয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন সেকি ? এরকম কথা তো জীবনে শুনিনি। আমাদের এই শহরটার দোষ কি !' যেন স্যুটকেসের চাকায় সাইলেন্সার লাগানোর কথা এর আগে আমিও শুনেছি ! বললাম, 'এখানে নতুন তো, ঘড়িতে বলছে, সন্ধেও হয়ে গেছে, কিভাবে কম পয়সায় হোটেলে পেঁছাবো তাও জানি না। জানলে হাতেই বয়ে নিতাম ওকে। বেচারা শব্দ-করত না।' হঠাৎ ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। শুনেছি মার্কিনরা ব্রিটিশদের মতো গোমড়ামুখো হয় না : কিন্তু এখন পর্যন্ত এদেশে গায়ে পড়ে আলাপ করা রসিককে দেখতে পাইনি : হাসিটি দেখে তাই আরাম লাগল। লোকটার চেহারার সঙ্গে আমার প্রিয় অভিনেতা জহর রায়ের বেশ মিল আছে। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি : ঈশ্বরের মানুষের মুখ তৈরির ছাঁচেরও একটা

লিমিট আছে। সেই এক নাক চোখ ঠোঁট চিবুক আর গালের হনুর সামান্য তারতম্য দিয়ে এক একটা মুখের আলাদা পরিচয় দিতে হয় তাঁকে। কিন্তু এভাবে কত আর তিনি দিতে পারেন। জহর রায়ের মুখের সঙ্গে এই মানুষটির যেমন মিল তেমনি একই মুখের অধিকারী পৃথিবীর দুই প্রান্তে হয়তো দুজন মানুষ আছেন। দূরত্বটা এমন বাড়িয়ে রেখেছেন ঈশ্বর যে দুজনে জানতেই পারেন না দুজনের অস্তিত্ব। এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে। আমেরিকা থেকে ফেরার অনেক পরে আমি আমন্ত্রিত হয়ে নরওয়ের বার্গেন শহরের সাহিত্য সম্মেলনে গিয়েছিলাম। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কবিরা এসেছিলেন সেখানে কবিতা পড়তে। একমাত্র আমি ছিলাম অকবি। ওদের কবিতার ভাষা বুঝতে পারতাম না। মাঝেমাঝেই সম্মেলন কক্ষ ছেড়ে চলে যেতাম রাস্তায়, সমুদ্রের ধারে যেখানে বাজার বসে আর মাছের স্টিমারগুলো এসে লাগে। এক দুপুরে এই রকম কেটে পড়ে ওই সমুদ্রের তীরে গিয়ে সিগারেট ধরিয়েছি সবে অমনি একটি মানুষের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। বার্গেনে এসে অবধি আমি কোনো বাঙালির দর্শন পাইনি। দেখলাম জলের পাশে বেঞ্চিতে শরীর এলিয়ে বর্তমানের সম্পাদক বরুণবাবু বসে আছেন। বরুণবাবুকে কয়েকবার আমি দেখেছি চোখ বুজে বসে থাকতে। ওখানেও সেইমত দেখে পুলকিত হয়ে চিৎকার করলাম। ভদ্রলোক মুখ ফেরালেন। ওইরকম বয়স, কোঁকড়া চুল, স্বাস্থ্যও এক। শুধু গায়ের রঙটাই একটু আলাদা। ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমাটমা চেয়ে বললাম, 'ঠিক আপনার মতো দেখতে এক ভদ্রলোক কলকাতায় আছেন। অবিকল। উনি একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক।' সামান্য ইংরেজী জানা সেই মানুষটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'চমৎকার, আমরা একই প্রফেশনে আছি। আমার কাউণ্টার পার্টটিকে অভিনন্দন জানাবেন। বাট হি মাস্ট নট মিট মাই ওয়াইফ।'

টানেলে দাঁড়িয়ে হাসি থামার পর প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, 'তোমার ধারণা ভুল। এখন বাইরে কড়কড়ে রোদ। আজ ছুটি হয়ে গেছে, রাস্তায় ভিড় কম। ওই বস্তুটিকে যদি হাতে তুলে আমার সঙ্গে হাঁটো তাহলে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

একটি বিশাল স্যুটকেসে আমার সব সম্পত্তি ঠাসা। মাটি থেকে তুলে দশ পা হাঁটলেই মনে হয় হাত ছিঁড়ে গেল। তাই সুযোগ পেলেই চামড়ার স্ট্র্যাপ ধরে টানি আর ও গড়িয়ে চলে। স্যুটকেসের চাকায় কি তেল দিতে হয় মুকুন্দ বলে দেয়নি। হাতবদল করতে করতে স্যুটকেস নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ঘড়ি অনুযায়ী ইতিমধ্যে তো সন্ধে হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সমস্ত চরাচর এখন চমৎকার রোদে ভাসছে। ভদ্রলোক বললেন, 'দেখলে তো। তা দেশ থেকে এই এতদূর যখন আসতে পেরেছ তখন হোটেলেও পৌঁছাতে পারবে। ওখানে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, চলে যাও।' কথা শেষ করেই তিনি উল্টো দিকে হাঁটতে লাগলেন। অদ্ভুত লোক তো? আর এই মুহূর্তে ওকে আমার কিছুতেই জহর রায় বলে ভাবতে ইচ্ছে করল না। মানুষের মুখ এক হলেই যে চরিত্র এক হবে তার যদিও কোনোও নিয়ম নেই তবুও।

ট্যাক্সির জন্যে লাইন পড়েছে। পুলিশ বাঁশি বাজিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাদের ডাকছে। গাড়িগুলোর চেহারা দেখে মনে হলো ভারতবর্ষের টাটা বিড়লারাই অমন গাড়িতে চড়তে পারেন। অনেকগুলো লাইন। এর কোনোটায় দাঁড়ালে আমার হোটেলের ট্যাক্সি পাব? স্যুটকেস রেখে কয়েক পা এগিয়ে পুলিশটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওয়াশিংটন হাউস' হোটেলে যাব। কোন লাইন?' 'কি হোটেল? প্রচন্ড ধমকে জিজ্ঞাসা করল পুলিশটা। নামটা আবার জানালাম। এবার সে আমাকে ইশারা করলো সামনে থেকে সরে যেতে। বাধ্য হয়ে স্যুটকেসের কাছে ফিরে এলাম। আর তখনই পুলিশটি চিৎকার করে আমাকে কিছু বলে একটা ট্যাক্সি দেখিয়ে দিলো। কি কান্ড, ওই বিশাল গাড়িটায় আরও চারজন বসে আছেন। আমি এগিয়ে যেতেই ড্রাইভার আমার হাত থেকে স্যুটকেস নিয়ে পেছনের ডিকিতে রেখে দিলো।' আমি ইতস্ততঃ করছিলাম, লোকটা দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'কুইক'। অতএব উঠে বসলাম। বসেই বুঝলাম এটি শেয়ারের ট্যাক্সি। কলকাতায় যা আমাদের ভরসা তা খোদ আমেরিকার রাজধানীতেও চালু আছে আবিষ্কার করে পুলকিত হলাম।

গাড়ি ছেড়ে ড্রাইভার একটা প্যাড টেনে বাঁ-হাতে কলম নিয়ে ডান হাতে স্টিয়ারিং ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'ডেস্টিনেশন প্লিজ'। প্রত্যেকে যে যার জায়গা বলে যেতে লাগল। লোকটা সেসব লিখে নিয়ে এক দুই তিন চার পাঁচ নম্বর পাশে বসাল। দেখলাম আমার জায়গাটার আগে পাঁচ নম্বর বসল। বুঝতে পারলাম আমাকে নামতে হবে সবার শেষে। এই ট্যাক্সিতে জায়গা অঢেল। এয়ার কন্ডিশন। সিগারেট খাওয়া নিষেধ। পা ছড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকালাম। নিউইয়র্কের চেয়ে অনেক চওড়া রাস্তা। এবং লোকজন খুব কম। বাড়ি ঘরদোর দেখতে শুনতে পেলাম ওয়ারলেসে খবর আসার মতো কিছু একটা বেজে যাচ্ছে সমানে ড্রাইভারের সামনে। লোকটা মাঝে মাঝে প্যাডে তাই শুনে নোট নিচ্ছে আর গাড়ি চালাচ্ছে। ব্যাপারটা কি বোঝার চেষ্টা করলাম। কিন্তু রেডিও ওয়ারলেসে ভেসে আসা গলা এত অস্পষ্ট যে মাথায় কিছু ঢুকল না। ইতিমধ্যে আমার এক সহযাত্রী নেমে গেছেন তাঁর জায়গায়। নামবার আগে কোনো বাক্য বিনিময় না করে দুটো এক ডলারের নোট দিয়ে গেলেন। আমি বুঝতে পারছি না আমাকে কত দিতে হবে। ভারত সরকার দেশ থেকে আসার সময় মোট সাড়ে ছয়'শ ডলার মঞ্জুর করেছেন। অবশ্য তার অনেকটাই পকেটে রয়ে গেছে। নিউ-ইয়র্কে রেসে যা জিতেছিলাম তা দিয়ে একটা পার্টি করার কথা ছিল। আসবার আগে পার্টি না হওয়ায় মনোজ আমার অংশ দিতে চেয়েছিল, আমি নিইনি। ফিরে গিয়ে সেটা করা যাবে বলে রাখতে বলেছিলাম। এখন কত দক্ষিণা ড্রাই-ভারটি চাইবেন ঈশ্বর জানেন। ইতিমধ্যে আমার সহযাত্রীরা নেমে গেছেন। চার নম্বর নামবার আগে পাঁচ ডলার দিয়ে গেলেন। কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালা পঞ্চাশ টাকা শেয়ার নিলে কি কান্ড হতো? এখন আমি আর ড্রাইভার গাড়িতে। দু-পাশে বেশ বাড়ি ঘরদোর। আমরা সম্ভবত কোনো রেসিডেন্সিয়াল এলাকা দিয়ে যাচ্ছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওয়াশিংটন হাউস হোটেল আর কতদূরে?'

চিউইংগাম মুখে রেখে ড্রাইভার জবাব দিলো, 'দেরি আছে। নতুন নাকি শহরে ?' কলকাতার অভিজ্ঞতা বলছে হ্যাঁ বললে ঠকতে হবে। কিন্তু অস্বীকার করলে তো ধরা পড়ার সম্ভাবনা। অতএব সত্যি কথাই বললাম। ড্রাইভার মাথা নাড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'রেডিওতে কি বলছে ?' ড্রাইভার বলল, 'কোন রাস্তায় জ্যাম আছে, কোথায় নো-এণ্ট্রি করা হলো, কোন এলাকায় কে কোথায় দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি চাইছে এইসব। কেন ? কোন দেশ থেকে আসছ তুমি ?'

ভারতবর্ষ'।

'তোমার দেশে কেউ ট্যাক্সি চাইলে ওয়ারলেসে ট্যাক্সি ড্রাইভারদের জানিয়ে দেওয়া হয় না অ্যাটেন্ড করতে ? এটা নতুন কথা নাকি ?'

উত্তর দিলাম না। হাত দেখিয়ে ট্যাক্সি থামিয়ে অনুনয় বিনয় করলেও যেদেশে ড্রাইভারদের মন ভেজে না সেদেশে ওয়ারলেসের মাধ্যমে খবর পাঠানোর কথা কেউ ভাবতে পারে ? আপনার ট্যাক্সি দরকার। আপনি আপনার লোক্যাল ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ফোন করে সেটা বললেন। স্ট্যান্ডে কোনো ট্যাক্সি নেই। অতএব ওরা ওয়ারলেসে জানিয়ে দিলো আপনার বাড়ির এক কিলোমিটারের মধ্যে যেসব খালি ট্যাক্সি আছে তাদের কেউ যেন যোগাযোগ করে। কোনো ট্যাক্সিওয়ালা সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বলল, 'আমি যাচ্ছি'। সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যান্ড থেকে ওয়ারলেসে প্রচার করা হলো, এত নম্বর ট্যাক্সি ওমুক ঠিকানায় যাচ্ছে। অতএব আর কারো সেখানে যাওয়ার দরকার নেই। এছাড়া ট্যাক্সি ড্রাইভারদের একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে গান বাজানো হয়, রেসের, ফুটবল খেলার খবর দেওয়া হয়। ভাগ্যিস লোকটা আর ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রশ্ন করেনি। বিশেষ একটি জায়গায় এসে ড্রাইভার ম্যাপ বের করলেন। লোকটা কি হোটেলটার নাম এর আগে শোনেনি ? জিজ্ঞাসা করতে বলল, 'আমি আজকাল রেগুলার ট্যাক্সি চালাই না। বুঝলাম গুল মারল। হোটেলের নাম জানবে না এমন কখনও হয় ? বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর আমরা হোটেলটার উল্টোদিকে পৌঁছলাম। ড্রাইভার বলল, 'সাত ডলার দিন'।

সাত ডলার ! সত্তর টাকা ! লোকটা যদি আমার কাছে সত্তর চাইতো তাও দিতে হতো। কিন্তু চার নম্বর লোকটা নেমেছে অন্তত মাইল পাঁচেক আগে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা স্টেশন থেকে যদি আমি পুরো ট্যাক্সি নিয়ে আসতাম কত ভাড়া লাগতো ?'

ড্রাইভার বলল, 'মিটারটা দেখুন।'

দেখলাম সেখানে উনিশ ডলার উঠেছে। পরে যোগ করে দেখেছি আমার এবং অন্য চারজন যাত্রীর কাছ থেকে ড্রাইভার যা পেয়েছে তা কোনমতেই বিশ ডলার ছাড়িয়ে যায়নি। অর্থাৎ মিটার অনুযায়ী এখানে শেয়ার ট্যাক্সির ভাড়া নির্দিষ্ট হয়। এমন তাজ্জব কথা কলকাতায় কেউ শুনেছে ? ট্যাক্সিটা থামতেই ওয়াশিংটন হাউস হোটেল থেকে একজন দারোয়ান এগিয়ে এসেছিল। ডিকি থেকে স্যুটকেস নিয়ে সে বলল, 'ওয়েলকাম স্যার'। ভাড়া মিটিয়ে ফুটপাথ পেরিয়ে হোটেলের কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকলাম। বিশাল রিসেপশন। দারুণ সাজানো।

এগিয়ে গিয়ে রিসেপশনিস্টকে বললাম, আমার জন্যে একটি ঘর এখানে বুক করা আছে।'
ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'খুব অসুবিধে না হলে যদি আপনি আপনার নামটি জানান তাহলে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'
এ যেন বিনয়ের ফুলঝুরি। নিজের পরিচয়, আমন্ত্রণের চিঠি দেখানোর পর একটা চাবি পাওয়া গেল। খাতায় সইপত্র করতে হলো। রিসেপশনিস্ট বললেন, 'সোজা পাঁচ তলায় উঠে যান। চাবিতে ঘরের নম্বর দেওয়া আছে।'
কিন্তু আমার স্যুটকেস ? রিসেপশনিস্ট আশ্বস্ত করল, আমার ঘরে ওটা ঠিকই পৌঁছে যাবে। চাবিটা নিয়ে চারপাশে তাকালাম। সুন্দর সাজানো লাউঞ্জে বেশ মিষ্টি গন্ধ ভাসছে। ওপাশে সম্ভবত রেস্টুরেণ্টের প্রবেশ পথ। আমেরিকান হোটেল-শ্রেণীবিন্যাসে এটি তিন না চার তারায় পড়বে তা আমার জানা নেই। খানিক এগিয়ে পরপর চারটি লিফটের দরজা পেলাম। লিফট নামছে। আমি নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে। হতভম্ব হয়ে দেখলাম লিফট নিচে নেমে গেল। আমি দাঁড়িয়ে আছি একতলায়। একতলার নিচে, মাটির তলাতেও দুটো ফ্লোর আছে নাকি ?
পাঁচতলায় উঠে মনে হলো শূন্য রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়েছি। নিজের চাবির নম্বর অনুযায়ী ঘরের দরজা খুলে হতভম্ব হয়ে গেলাম। এতো রীতিমতো হলঘর। একটা দেওয়াল পর্দামোড়া। বিশাল খাট। আধুনিকতম সব আরাম ছড়ানো। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় মৃদু শব্দ এবং আমার স্যুটকেস ঘরে এলো। এমন টয়লেট বাথরুম আমি কখনও ব্যবহার করিনি। ঘরে ঢোকামাত্র একটা অস্বস্তি শুরু হয়েছিল। সেটা কাটাতেই ভাবলাম শুয়ে পড়া যাক। বিছানার ঠিক মাঝখানে শরীর ফেলে দিতেই মনে হলো এর নামই আরাম।
কিন্তু ঘুম এলো না, অস্বস্তি এলো। এমন বিলাসকক্ষে কখনও থাকিনি বলে নয়, বিশাল ঘরটা যেন আমার বুকে চেপে বসেছিল। মাঠের মতো খাটে কয়েকবার গড়ালাম। এরকম একটা দারুণ ঘরে যদি আমার বন্ধুবান্ধবরা থাকত, খুব আফশোষ হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে মনে হলো আমার তো খিদে পাওয়া উচিত। মনোজ বলে দিয়েছিল তারা মার্কা হোটেলের রেস্টুরেণ্টে কখনও ভুলেও খেতে ঢুকবেন না। আপনার পকেট তখন আপনাব থাকবে না। তাহলে খাবা-রের দোকান কোথায় পাই ? এ তল্লাটের ম্যাকডোনাল্ড খুঁজে বের করতে হবে। সেজেগুজে নিচে নেমে আসতেই দেখলাম রোদ মরেনি তখনও। রিসেপশনিস্টকে চাবিটা দেওয়ার সময় ভাবলাম ম্যাকডোনাল্ডের কথা জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু পাশেই কেতাদুরস্ত হোটেলের নিজস্ব রেস্টুরেণ্ট থাকা সত্ত্বেও ওই প্রশ্ন করলে লোকটা আমাকে নিশ্চয়ই ফেকলু ভাববে। ফুটপাতে নেমে চারপাশে তাকিয়েও তেমন লোকজন দেখতে পেলাম না। বাঁ দিক ধরে হাঁটতে লাগলাম। দোকানপাট সব বন্ধ। যেন রবিবারের সকালে ডালহৌসির ফুটপাতে হাঁটছি। ভুল হলো, সেখানেও এর চেয়ে বেশি লোক থাকে। ব্যাপারটা কি ? আমেরিকার রাজধানীর ফুটপাত জনশূন্য ? গাড়ি যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বেশ খানিকটা হাঁটার পর মনে

হলো বাঁ কিংবা ডানদিকে গেলে দোকান টোকান পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলি ? কাউকে যে শুধাবো তারও তো উপায় নেই। হঠাৎ একটা রেস্টুরেন্টের সাইনবোর্ড দেখতে পেলাম। দরজার বাইরে কাঁটা চামচ আর প্লেটের ছবি আঁকা। দেখে মনে হলো আমাদের বসন্ত কেবিন টাইপের হবে। কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে দেখলাম লম্বা লম্বা টেবিল খদ্দেরশূন্য হয়ে রয়েছে। একপাশে একটা কাউন্টার। সেখানে বসে আছে থুরথুরে এক বুড়ি। কাছে এগিয়ে যেতে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন 'ইয়েস ?'

বিনীত ভঙ্গিতে জানতে চাইলাম 'দোকান কি বন্ধ ?'

বুড়ি হাত ওল্টালেন, 'তাহলে এখানে কি আমি পুতুল হয়ে বসে আছি ? কি খেতে চাও বল, বাজে কথা বলাব সময় আমার নেই।' রোগা শিরাশিরায় ছাওয়া বুড়ি তো চুপচাপ বসেই আছেন, সময় না থাকার হুমকি দিলেন কেন ? মেনু-কার্ড নিয়ে চেনা খাবার খুঁজতে গিয়ে হতাশ হলাম। একমাত্র রুটি জ্যাম ছাড়া কিছুই চিনতে পারছি না। সামনে পুরো রাত পড়ে রয়েছে। রুটি আর জ্যাম খেয়ে কাটাতে হবে ? মনে হয় চোখে মুখে অসহায় ভাব ফুটে উঠেছিল। হঠাৎ বৃদ্ধার গলা একটু পাল্টালো, 'পেট ভরে খেতে চাও নাকি একটু আধটু।'

'পেট ভরেই, কিন্তু—।'

'পকেটে তিন ডলার আছে ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, কিন্তু আপনাদের খাবার— ? আমাকে শেষ করতে দিলেন না উনি, 'দেশ কোথায় ? পাকিস্তান ?'

'আজ্ঞে না, ভারতবর্ষ।' রেগে গেলেও প্রকাশ করলাম না।

বুড়ি চোখ বন্ধ করে কিছু ভেবে আমাকে ইশারা করলেন টেবিলে যেতে। মিনিট পনের পরে তিনি উদিত হলেন পাশের আর একটি দরজা দিয়ে। বয়স হলেও শক্ত আছেন নইলে ট্রেটা ওভাবে ধরতে পারতেন না। টেবিলে খাবার পরিবেশিত হলে দেখলাম একটি বিশাল তন্দুরি রুটি টাইপের বস্তু, আলু সেদ্ধ, কয়েক-রকমের শাক সেদ্ধ, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা এবং একটি বিশাল ওমলেটের সঙ্গে অল্প আইসক্রিম। ইচ্ছে হচ্ছিল বুড়িকে প্রণাম করি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি করে বুঝলেন এইটে আমার ভালো লাগবে ?'

বুড়ি কোনো উত্তর না দিয়ে ফিরে গেলেন। হঠাৎ যেন বাঙলাদেশের ঠাকুমা দিদিমাদের স্পর্শ পেলাম। তাঁদের প্রশংসা করলে তো এইভাবে এড়িয়ে যান। ঠিক করলাম খিদে পেলেই এখানে চলে আসব। আমেরিকায় এসে এই অবধি যখন গরু শুয়োয়ের আশ্রয় নিতে হয়নি মনোজের কৃপায় তখন এই বুড়িকেই খুঁটি করা যাক।

সাড়ে ন'টার সময় হোটেলে ফিরলাম। চাবি নিতে গিয়ে দেখলাম রিসেপশনিস্ট বদল হয়েছে। যিনি এসেছেন তিনি বললেন, 'দু'জন আপনাকে দু'বার টেলি-ফোন করেছেন।' দুটো কাগজ এগিয়ে দিলেন আমার সামনে। বেশ অবাক হয়ে ও দুটোতে নাম এবং টেলিফোন নাম্বার লেখা দেখলাম। রবার্ট নামের লোকটি কে ? আর জুলি নাম্নী লস এঞ্জেলস শহরের মহিলাটি আমার হদিশ পেলেন

কি করে ? তিন হাজার কিলোমিটার দূরে থেকে তিনি পয়সা খরচ করে আমায় ফোন করতে যাবেন কেন ? ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোনের গায়ের যন্ত্রটা বিপ বিপ করে উঠল। ওটাকে কিভাবে থামাতে হয় জানা নেই। এখানে কি টেলিফোন এলে রিঙ হয় না ? মনোজের বাড়িতে তো টেলিফোন কলকাতার মতনই বাজে। রিসিভার তুলতেই বিপ-বিপানি বন্ধ হলো। ওপাশ থেকে গলা পেলাম, 'গুড ইভনিং মিস্টার মজুমদার, দিস ইজ বব।' মনোজ বলেছিল সাহেবদের নামের পুঁজি বড় অল্প। ডাক নামেরও। যিনি এডওয়ার্ড তিনি এড হবেনই। চার্লস চার্লি, রবার্ট বব, উই-লিয়াম উইলি। অর্থাৎ এখন যিনি টেলিফোনে আছেন তিনি একটু আগে রবার্ট নামে আমার খবর নিয়েছিলেন। বব হলেন সরকারি দপ্তরের সেই কর্তা যাঁর ওপর আমার আমেরিকা ভ্রমণের দায়িত্ব পড়েছে। বব তাঁর অফিসের ঠিকানা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে বললেন, আমি যেন আগামীকাল সকাল সাড়ে দশটায় সেখানে পেঁছে যাই। রিসিভার নামিয়ে রেখে দেখলাম সব গুলিয়ে যাচ্ছে। ববের ঠিকানাটা মনে রাখা অসম্ভব। হঠং মনে পড়ল কলকাতায় সুপ্রিয়দা একটা কাগজে কিছু লিখে দিয়েছিলেন। সম্ভবত এই ঠিকানাই। পরে খুঁজে দেখব সেটাকে পাই কিনা।

কিছুই করার নেই এখন। বাইরে সবে অন্ধকার নামছে। তারা মার্কা হোটেলের এমন শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে অবশ্য সেটা বোঝার উপায় নেই। ওয়াশিং-টনে তো বাঙালিরাও থাকেন। তাঁরা কোথায় ? হাত বাড়িয়ে টেলিফোন ডাই-রেক্টরি টেনে নিয়ে বাঙালির উপাধি খুঁজতে লাগলাম। প্রায় আধঘণ্টা দেখে দেখে চোখের মাথা যখন খাওয়ার মুখে তখন পি এ্যালফাবেটে পেঁছালাম। এবং তখন দুটো শব্দে চোখ থামল। আর পাইন। পাইন বাঙালি উপাধি। অন্য-দেশেও কি পাইন আছে ? নাকি আমি উচ্চারণ ভুল করছি ? একটা ফোন করলে কেমন হয় ? স্রেফ বাংলায় প্রশ্ন করব। বাঙালি না হলে উল্টোপাল্টা বলবে এবং তখন লাইন কেটে দেবো। বেশ ভয়ে ভয়েই আমি ডায়াল করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওপাশে বাজনা বাজল। এবং তার একটু বাদেই চোস্ত মার্কিন ইংরেজিতে একটি ভারি গলা জিজ্ঞাসা করল আমার পরিচয়। চট করে বলে ফেললাম, 'আপনি কি বাঙালি ?'

এক মুহূর্ত চুপচাপ। রিসিভার নামিয়ে রাখব ভাবছি অমনি ভেসে এল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আমি বঙ্গ সন্তান। মহাশয়ের পরিচয় জানতে পারি কি ?'

ততক্ষণে জুৎ করে উঠে বসেছি। বললাম, 'ক্ষমা করবেন। হোটেলের ঘরে একা হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে আপনার উপাধি দেখতে পেলাম।'

মৃদু হাসির শব্দ ভেসে এলো, 'কবে এসেছেন ওয়াশিংটনে ?'

'আজ দুপুরে।'

'কাজে কর্মে— ?'

'ঠিক তা নয়। দেশটাকে দেখতে।'

'ও। আমার নাম রমেন পাইন। ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগে কাজ

করি।'
'আরে! আপনাকে তো আমি দেখেছি। কলকাতা দূরদর্শনে একসময় খবর পড়তেন না।'
'হ্যাঁ। মনে রেখেছেন বলে ধন্যবাদ। কোন হোটেলে আছেন?'
'ওয়াশিংটন হাউস হোটেল।'
'তাহলে তো প্রচুর ডলার সঙ্গে আছে।'
'না-না। মার্কিন সরকার অনুগ্রহ করেছেন।'
'ওঁরা তো যাঁকে তাঁকে ওটা করেন না। আপনার নামটা শুনতে পারি।'
আমেরিকার বাঙালিরা বাংলা সাহিত্য পড়ার সময় পান না। নব্বুই ভাগের ইচ্ছাও হয় না। তাঁহারা বাঙালি লেখক বলতে রবীন্দ্রনাথের পর তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণের নাম শুনেছেন। ষাটের দশকে চলে আসা এইসব ভাগ্যান্বেষীরা সমরেশ বসুর নামের সঙ্গে পরিচিত হলেও হতে পারেন। সেক্ষেত্রে—। নাম বললাম।
'আরে মশাই। আপনি কি, অ্যাঁ? খুব বোকা বানালেন যাহোক। আমি টিভিতে শব্দ উচ্চারণ করতাম সেটা আপনার সঙ্গে কোনো তুলনায় আসে? দাঁড়ান আসছি।' লাইন কেটে গেল। আমি আবার ধন্দে পড়লাম। টেলিফোনে কামালও বোস্টন থেকে আসছি বলে পরের ভোরে নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হয়েছিল। রমেন পাইন কতদূরে থাকেন কে জানে। তিনি কি কামালের মতো একই গ্রহ নক্ষত্রের মানুষ? ঘরে না বসে লাউঞ্জে বসলে কেমন হয়? হোটেলে যখন তখন রকমারি লোক দেখা যেতেই পারে। দরজা বন্ধ করে আবার নিচে নেমে এলাম।
রমেন পাইনকে চিনতে আমার মোটেই অসুবিধে হয়নি। স্মার্ট সুদর্শন বঙ্গ সন্তান যতই শীতের কারণে জ্যাকেটে মুড়ে থাকুন না মুখের হাসিটি লুকোবেন কোথায়? মুখোমুখি হয়ে বললেন, 'খুব দেরি করিনি নিশ্চয়ই সমরেশবাবু। চলুন।'
'কোথায়? মনে হচ্ছিল ওয়াশিংটন শহরটা আর অজানা জায়গা নয়।
'আমার বাড়িতে। জুলি বসে আছে আলাপ করবে বলে।'
'জুলি? রমেনবাবু কি আমেরিকান মহিলার স্বামী?
'আমার স্ত্রী। মেয়েরাও আছে। চলুন, আর কথা নয়।'
রাত তখন এগারটা। রাস্তাও প্রায় গাড়িহীন। রমেনবাবুর পাশে বসে মসৃণ রাজপথ বেয়ে কোন গতিতে ছুটে চলেছে খেয়াল করিনি। রমেন বললেন, 'কাল হোটেল ছেড়ে আমার ওখানে চলে আসুন। সুনীল ওয়াশিংটনে এলেই আমাদের কাছে চলে আসেন।' বুঝলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে এঁদেরও সখ্যতা রয়েছে। জানি না কি কারণে মনোজের সঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচয় হয়নি কিন্তু আমেরিকার তরুণ বাঙালিরা সবাই ওঁকে চেনে। এটা যতটা না ওঁর লেখা পড়ে তার চেয়ে বহুগুণ ওঁর সান্নিধ্য পেয়ে।
জিজ্ঞাসা করলাম, 'কলকাতায় চাকরি ছেড়ে কিরকম লাগছে এখানে?'
'আমি এখন টাকা রোজগারের মেশিন। টাকার জন্যে এসেছি, লাগালাগির

ব্যাপারটা মাথা থেকে উড়িয়ে দিয়েছি। ওসব ভাবি না।'

'তবু ?'

হঠাৎ গলা তুললেন রমেন, 'কদিন থাকুন বুঝতে পারবেন। যন্ত্র হয়ে গেছি মশাই। বন্ধু-বান্ধব নেই, আড্ডা নেই, পরচর্চা নেই, কবিতা আবৃত্তি নেই, ইচ্ছে করলে বই পাওয়া যায় না, এখন আমি একটি রোবট। দেশে যদি তিন হাজার টাকার চাকরি পেতাম আর ফিরতাম না। এখানে আমার গাড়ি, মেয়ের গাড়ি। চারজনেই একটা না একটা চাকরি করি। ডলারের স্বাদ বড় খারাপ নেশা তৈরি করে। আমরা এ্যাডিক্টেড হয়ে গেছি। এখন আমি চাইলেও আমার স্ত্রী মেয়েরা দেশে ফিরবে না। মাসখানেকের জন্যে বেড়াতে যাওয়া—ওই অবধি ওদের দেশপ্রেম। বেঁচে থাকার যতরকম সুবিধে যারা একবার ভোগ করতে আরম্ভ করে তাদের ইমোশনাল ব্যাপারটা ভোঁতা হয়ে যায়। অথচ আমি, বিশ্বাস করুন কাল দেশে ফোন করেছিলাম জীবনানন্দের বোধ কবিতার দুটো লাইন জানতে। বইটা আমার কাছে নেই এবং লাইন দুটো মনে পড়ছিল না কিছুতেই। আমার স্ত্রী বলবেন এটা আমার ব্যক্তিগত সমস্যা, এ্যাবসলিউটলি আমার। মানছি।'

কোনো মানুষ যখন নির্জন মুহূর্তে সরবে মনের গোপন ব্যথা জানাতে শুরু করে তখন তার প্রিটেনশন থাকে না। রমেনের মুখের থমথমে চেহারাটা গাড়ির ড্যাশবোর্ডের আলোতেও আমার চোখে ধরা পড়ল। অনেকটা চলে এসেছি আমরা। হঠাৎ একটা মোড় ঘুরে ছবির মতো বাড়িগুলো দেখিয়ে রমেন বললেন, 'ওই যে আমার বাড়ি। কেমন বুঝলেন ?'
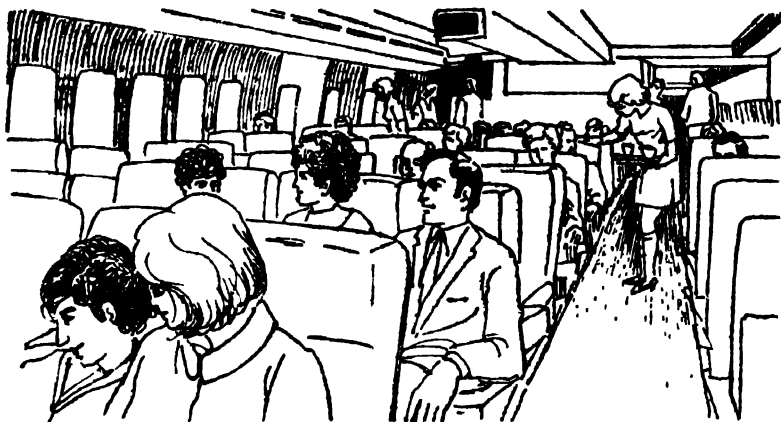
১২

একটি ছবির মতো দোতলা বাড়ি, সামনে বড় ঘাসের লন, পেছনে চমৎকার ফুলের এবং ফলের বাগান, প্রতিটি ঘরের মেঝে কার্পেটে মোড়া, রঙিন ভি সি আরের লেটেস্ট মডেল, রান্নাঘরে চূড়ান্ত আধুনিক সরঞ্জাম, ফ্রিজে লোভনীয় খাবারের স্তূপ, নতুন কায়দার কর্ডলেস টেলিফোন—একটি বাঙালি পরিবারের স্বপ্ন এর চেয়ে বেশি কি হতে পারে। আর হ্যাঁ, সেইসঙ্গে বাড়ির একপাশের রঙিন গ্যারেজে দুটো এয়ারকন্ডিশন গাড়ি সবসময় প্রস্তুত। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির উঁচু তলার চাকরি করলে এই ধরনের সুবিধে কেউ কেউ এদেশে পেয়ে থাকেন। সরকারি আমলারা যে মাইনে পান তাতে এই স্বাচ্ছন্দ্য স্বপ্নাতীত। কেউ কেউ যখন তা আয়ত্তে রাখেন তখন বুঝতেই হয় তাঁর দু-তিন নম্বরী টাকার স্রোত বেশ টগবগে। কিন্তু আমেরিকায় একজন অধ্যাপক, একজন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অথবা দশ বছর চাকরি করা অফিসার এই সম্পত্তির মালিক হবেন যদি তাঁর স্ত্রী কাজ করতে বের হন। ধরুন আপনার মাস মাইনে হাজার ডলার। না, টাকায় অঙ্কটা নিয়ে যাবেন না। ডলারটাকে টাকাই ভাবুন। নব্বুই সেন্ট বাস ভাড়াটাকে নব্বুই পয়সা ভাবাই ভালো। আপনি বাড়ি ভাড়া করতে গেলে তিনশো' ডলারের নিচে দেড়খানা ঘর শহরের বাইরে পাবেন না। এবার আপনি ধার নিলেন ষাট হাজার। ওই ডলারে একটা ছোটখাটো বাড়ি কুইন্সে হয়ে যায়। প্রতি মাসে পাঁচশো মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হবে সুদ সমেত। কুড়ি বছর পরে বাড়িটার মালিক হয়ে যাবেন আপনি। ছ'হাজারে

সুন্দর একটা হাতফেরতা গাড়ি পেয়ে যাবেন। গাড়ির জন্যে মাসে দেড়শ কবে কাটবে। অর্থাৎ এবার আপনি হাতে পাচ্ছেন সাড়ে তিনশো। গাড়ির এবং বাড়ির মালিক হওয়ার পর আপনি রোজ এক কেজি মুরগির মাংস, রুটি, দুধ, ফল এবং সবজি আড়াই ডলারে পেয়ে যাবেন। অর্থাৎ মাসে পঁচাত্তর। রইল দু'শো পঁচাত্তর। পঞ্চাশ ডলার দেবেন ফানিচার্স হায়ার পারচেঁজে কিনে রাখার জন্যে। পঞ্চাশ রাখছেন জামাকাপড়ের জন্যে। এবার একশ পঁচাত্তরের মধ্যে একশ রাখুন গাড়ির তেল ইলেকট্রিক বিলের জন্যে। পঁচিশ গ্যাস এবং অন্যান্য খরচ। পঞ্চাশ হাতখরচ। হ্যাঁ. এই অঙ্কে মদ্যপান, রেস্টুরেন্টে খাওয়া সম্ভব নয়। এবার আপনার স্ত্রী যদি কাজে বের হন এবং তিনি যদি মাসে পাঁচশো ডলার হাতে পান তো ওগুলো করে শ'দুই ডলার নির্ঘাৎ জমাতে পারেন প্রতি মাসে। দেশে আসার সময় অঙ্কটা অবশ্য দু হাজারের বেশি দেখাবেই, তো দেখাক না। ভালো লাগাটা তখনই আসুক। মনে রাখবেন এখানে যাই হোক, ওদেশে এক ডলারের মান এক টাকার সমান। এই হিসেবের কিছুটা মনোজের মুখে শোনা কিছুটা রমেনবাবু বললেন। আমরা বসেছিলাম ওদের একতলার বসার ঘরে। রমেনের স্ত্রী জুলি অত্যন্ত মিশুকে মহিলা। এদেশে চাকরি করেন। চেহারা এবং পোশাকে এদেশের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছেন। রমেন বলছিলেন, 'হ্যাঁ সমরেশবাবু, যা কিছু পাবার তা আমরা পেয়েছি। কিন্তু বড় একা হয়ে গেছি এই পাওয়ার দাম দিতে।' জুলি বললেন, 'এটাই হয়েছে মুস্কিল। সবসময় এই ভাবনাটা ওর মাথায় এমন পাক খায় যে কোনো কিছুতেই আর সুখ পায় না। যে দেশে আজ আছ সেই দেশের মতো হও না। এমন ক্রাইসিসলেস জীবন পাওয়ার জন্যেই তো এক সময় ছটফট করেছ।'

আমি দুজনকে দেখছিলাম। মনোজ বলেছিল, 'আমেরিকায় এসে দেশের জন্যে হা হুতাশ করার রোগে কিছু বাঙালি ভোগে। কিন্তু দেশে বেড়াতে গিয়েই আইঢাই করতে থাকে ফিরে আসার জন্যে। আবার এদেশে কোনো বাঙালি বেড়াতে এলেই এমন ভাব দেখায় যে তার বুক দেশে ফিরে যাওয়ার জন্যে ফেটে যাচ্ছে। সবসময় ইচ্ছাকৃত নয়, অভ্যেস থেকেও এটা হয়।'

মনোজের কথাটা রমেনবাবুর ওপর কতটা প্রযোজ্য তা বুঝতে পারছিলাম না। জুলি কিন্তু আমার কাছে স্পষ্ট। ওঁকে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। আমি জানি না রমেনবাবুর কষ্টটা হয়তো ঠিক। সন্দেহ করাই আমার অভ্যেস হয়ে গেছে হয়তো।

জুলি বললেন, 'আপনাকে আজ খেয়ে যেতে হবে সমরেশ।'

মাথা নাড়লাম, 'আজ নয়। বিন্দুমাত্র খিদে নেই।' এইসময় ওঁদের ছোট মেয়ে নেমে এল। মিষ্টি চেহারার কুড়ি একুশ বছরের মেয়ে। স্বচ্ছন্দে বলল, 'আপনাকে আঙ্কল বলতে একটুও ইচ্ছে করছে না।' জুলি উঠে গেলেন কফি আনতে। মেয়েটিকে আমার খুব পছন্দ হলো। ও এদেশে এসেছে পাঁচ সাত বছর বয়সে। দেশের আবহাওয়াতে ওইটুকুনি বয়স কাটিয়ে ও মানুষ হয়েছে আমেরিকার পরিমন্ডলে। ওর কথাবার্তা আচার আচরণে যে বিদেশী ছাপ পড়েছে তা আমা-

দের দেশের ইংরাজি মিডিয়ামে পড়া মেয়েদের ওপরও পড়ে না। মনোজের 'এই দ্বীপ এই নির্বাসন' ছবিটির জন্যে শিল্পী নির্বাচন করতে গিয়ে আমরা ওই চরিত্রটি নিয়ে কিছু ভাবতে পারিনি। দেশের কোনো অভিনেত্রীর দ্বারা ওই চরিত্রটিকে ফোটানো অসম্ভব। কথাবার্তায় মার্কিন ম্যানারিজম, হাঁটা চলা চাহনিতেও সেটা স্পষ্ট অথচ মেয়েটি বাংলা বলবে—এ যেন সোনার পাথরবাটি। মনোজ বলেছিল, 'কলকাতা নয়, মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে হবে আমেরিকা থেকেই।'

এখন এত রাতে এই মেয়েটির মুখোমুখি বসে আমার মনে হলো চিত্রনাট্যে যার কথা লিখেছি এ সেই। ও এখানে কলেজ করছে, অন্য সময় ছোটখাটো কাজও করে। পরনে স্কার্ট। চুলগুলো কাঁধ ছোঁওয়া। বাবার সঙ্গে যখন ইংরেজি বলছে তখন মনে হয় না বাঙালি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার কালো বন্ধু আছে?'

'চারজন। হঠাৎ একথা জিজ্ঞাসা করলেন কেন?'

এবার রমেনবাবুর সামনেই ওকে প্রস্তাবটা দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ও লাফিয়ে উঠল। চিৎকার করে বলল, 'আই উইল লাভ টু ডু দ্যাট! কি করতে হবে বলো প্লিজ।' মুহূর্তে আমি তুমি হয়ে গেলাম। এবং তারপরের পনের মিনিট আমরা যেভাবে কথা বললাম তাতে মনে হচ্ছিল আমরা অনেকদিনের পরিচিত। এবার রমেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়ে যদি ছবিতে অভিনয় করে তাহলে তাঁর আপত্তি আছে কিনা?

রমেন বললেন, 'বিন্দুমাত্র নয়। ও বড় হয়েছে নিজের ভালমন্দ ও বুঝবে। এ ব্যাপারে নাক গলানো আমি মোটেই পছন্দ করি না। তাছাড়া, আপনাদের ছবির বিষয় আমার খুব পছন্দ হয়েছে।' জুলিও রমেনের সঙ্গে একমত।

কফি খাওয়া হয়ে গেলে দেখলাম ঘড়িতে মধ্যরাত পার হয়ে গিয়েছে। ওঠার সময় হলো। ওঁরা অনুরোধ করলেন রাতটা ওখানে থেকে যেতে। আমি রাজি হলাম না। রমেনের সঙ্গে ওঁর গাড়িতে উঠে অবশ্য খারাপ লাগল। আমাকে ওয়াশিংটনে পোঁছে দিয়ে ওঁকে আবার এতরাতে ফিরে যেতে হবে। রমেন আমি নানারকম গল্প করতে করতে ফিরে এলাম। নামিয়ে দেওয়ার সময় রমেন বলে গেলেন, 'কাল পাঁচটায় হোটেলে থাকবেন। আমি আর জুলি এসে আপনাকে তুলে নেব। কোথাও যাবেন না।'

হোটেলের নিগ্রো দারোয়ান নক করল। ঘুমন্ত রাজপ্রাসাদ। রিসেপশনে কাউকে দেখছি না। অবশ্য পাঁচতলায় নিজের ঘরে পোঁছাতে অসুবিধে হলো না। জামাপ্যাণ্ট ছেড়ে বিশাল বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়েছি যেই অমনি টেলিফোন বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলতেই মনোজের গলা কানে এল, 'আচ্ছা লোক তো, রাত আড়াইটে অবধি কোন সুন্দরীর সঙ্গে নতুন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দশটা থেকে টেলিফোন করছি আর শুনছি আপনি নেই!'

মনোজকে রমেন পাইনের কথা বললাম। ও বলল, 'ভাগ্যবান লোক মশাই। যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই জমিয়ে নিচ্ছেন।' তখন বললাম, 'না জমালে পিংকিকে পেতাম না।'

'পিংকিকে পেয়েছেন ?' মনোজ উত্তেজিত।
'ইয়েস স্যার। রমেনবাবুর ছোট মেয়ে। ঠিকঠাক পিংকি।'
'ওঃ সাবাস। আমার এখনই দেখতে ইচ্ছে করছে। আপনি বলে দিন পিংকি যদি একবার নিউইয়র্কে চলে আসে খুব ভালো হয়। কাল রাতে আবার কথা বলব।'
ঘুম আসছিল না। একা, ভীষণ একা লাগছিল। হঠাৎ মনে হলো একটা গল্প লিখলে কেমন হয় ? কাগজপত্র নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসলাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আমি একটা গল্প শুরু করলাম। উত্তরবঙ্গের স্বর্গছেঁড়া চা বাগানের পাশ দিয়ে তিরতিরিয়ে বয়ে যাওয়া আঙরভাসা নদী আমার গল্পের পটভূমি।
ঠিক সকাল আটটায় ঘুম ভাঙল টেলিফোনের আওয়াজে। ঘুম ঘুম আলিস্যি নিয়ে রিসিভার তুলতেই মিষ্টি গলা ভেসে এল, 'কি করছ ? ঘুমাচ্ছ ?'
বুঝতে পারলাম গলাটা। বললাম, 'ঠিক তাই।'
'ওমা, এখনও ?'
'কাল সাড়ে চারটে পর্যন্ত গল্প লিখছিলাম।'
'লাভলি ! এইজন্যে তোমরা আলাদা। আজ সন্ধেবেলায় কি করছ ?'
'কেন ?'
'আমার সঙ্গে চল। একটা ডিসকো ক্লাবে যাব। ফ্যান্টাস্টিক।'
'রমেনবাবু বলেছেন পাঁচটার সময় তোমার মাকে নিয়ে এখানে আসবেন।'
'কাটিয়ে দাও। বাবা সব সময় নিজের সঙ্গে কথা বলে আর মা—, তুমি খুব বোর হবে। আমার সঙ্গে গেলে লেখার সাবজেক্ট পাবে।'
'শোন, আমি তো লেখার সাবজেক্টের পেছনে ছুটি না, সাবজেক্ট আমার কাছে চলে আসে। আজ নয়, আর একদিন হবে খুকি। তবে তোমাকে একদিন যেতে হবে নিউইয়র্কে। ছবির পরিচালক তোমায় দেখতে চায়।'
তুমি কবে ফিরবে নিউইয়র্কে ?'
'দিন পনের কুড়ি পরে।'
'ফিরে ফোন করলে চলে যাব। বাই, হ্যাভ এ বোরিং টাইম।'
হোটেল থেকে বেশ সেজেগুজে বের হলাম। কোনো রকম ঝুঁকি না নিয়ে ট্যাক্সি নিলাম। গোটা আটেক ডলার পকেট থেকে বেরিয়ে গেল। লিফটে নির্দিষ্ট ফ্লোরে উঠে অফিসের দরজাটা দেখলাম। ছোট্ট ঘর। দু'তিনজন মানুষ কাজ করছেন। পরিচয় দিতেই ওঁরা ভেতরে খবর পাঠালেন। একটু বাদেই এক সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনী এসে জিজ্ঞাসা করলেন, মিস্টার মজুমদার ?'
মাথা নেড়ে উপস্থিতি জানালাম। মহিলা অনুরোধ করলেন ভেতরে আসতে। করিডোর পেরিয়ে মোটামুটি একটা বড় ঘরে ঢুকে মহিলা বললেন, 'বব, হেয়ার ইজ মিস্টার মজুমদার।' বেশ স্মার্ট মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক চেয়ার থেকে উঠে হাত মেলালেন। ইনিই বব, ওরফে রবার্ট। ভদ্রলোক আমাকে বসতে বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন আমেরিকা কেমন লাগছে ? মিনিট তিনেকের মধ্যে আমরা বেশ খোলামেলা কথা বলতে লাগলাম। যদিও আমার মাথার মধ্যে কাজ করছিল

এদের সঙ্গে সি আই. এ-র সম্পর্ক রয়েছে তবু বলতে বাধছিল না। আমাকে মার্কিন সরকার পনের দিনের আতিথ্য দেবে। এই পনের দিন এই বিরাট দেশের যে কোনো জায়গায় যেতে পারি। আমার প্লেন খরচ, ট্রান্সপোর্ট, হোটেলে কনসেসন এঁরাই দেবেন। এবং এছাড়া প্রতিদিন আমি একশ ডলার করে একটা বিশেষ ভাতা পাব। আর এই পনের দিন আমাকে দেখভাল করার জন্য একজন এসকর্ট দেওয়া হবে। এবার আমি কোথায় কোথায় যেতে চাই তা ঠিক করতে হবে। বব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি আমেরিকার কোন কোন শহরে যেতে চাই ? এমনই উদো আমি যে আগে থেকে ভেবেটেবে যাইনি। অতএব মনে যা এল বলে গেলাম. লস এঞ্জেলস, সানফ্রান্সিস্কো, শিকাগো, ওয়াহিও কলম্বাস। বব হাত তুললেন। পনের দিনে এই চারটি জায়গা আমি কোনোমতে দেখতে পারি। এর বেশি পারা ওই সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। উনি রুট ঠিক করলেন। ওয়াশিংটন থেকে পিটার্সবার্গ এয়ারপোর্ট হয়ে যেতে হবে ওয়াহিও কলম্বিয়া, সেখান থেকে শিকাগো. শিকাগো থেকে লস এঞ্জেলস হয়ে সানফ্রান্সিসকো। তারপরে নিউইয়র্কে ফেরত আসা। সময় মেপে দেখা গেল এতেই আমার পনের দিন চলে গেল। তখন আমি বুঝতে পারিনি, পরে ভেবেছি আমি হনলুলুটা বলতে পারতাম, বলতে পারতাম মায়ামি বিচের কথা। মাথায় আসেনি তখন। ওয়াহিও কলম্বিয়াতে আমি থাকব প্রভাত দত্ত এবং তনুশ্রীর বাড়িতে, শিকাগোতে হোটেলে। সেখানে দেখা করব প্রফেসর ডিমকের সঙ্গে। লস এঞ্জেলসে উঠব মনোজের বন্ধু বনজ বসুর বাড়িতে। আর সানফ্রান্সিসকোতে হোটেলে। যাদের সঙ্গে দেখা করব তাদের নামের একটা লিস্ট ধরিয়ে দিলাম। বব বললেন, 'আমি খুব দুঃখিত, হ্যারল্ড রবিন্স এখন ফ্রান্সে। জেমস হ্যাডলি চেজ নামে কোনো লেখক জীবিত নেই। গ্রেগরি পেক, সিডনি পোয়েটার, এ্যান্টনি কুইন এবং ডাস্টিন হফম্যানের সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে আমি লস এঞ্জেলসের অফিসকে অনুরোধ করেছি।

বব ওঁর সেক্রেটারি, সেই সুন্দরী মহিলাকে আমার ভ্রমণসূচি দিয়ে বললেন, 'এয়ার টিকিট বুক করে পার্সন কনসার্নকে জানিয়ে দাও।'

ববের সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভালো লাগছিল। খুব সহজেই আমরা জমে গেলাম। বব জানাল, আমাকে পনেরদিনের জন্যে পনেরশ' ডলার আজই দেওয়া হবে। এবং সেই সঙ্গে যেসব জায়গায় যাব তার প্লেনের টিকিট। প্রতিটি এয়ারপোর্টে আমার জন্যে একটি গাড়ি অপেক্ষা করবে এবং সেই শহর থেকে চলে যাওয়ার সময় পর্যন্ত সেটি ব্যবহার করতে পারব। আমি যেখানে বন্ধুবান্ধবের কাছে থাকব সেখানে প্রশ্ন ওঠে না কিন্তু হোটেলে থাকতে গেলে সরকারি অতিথি হিসেবে শতকরা চল্লিশভাগ চার্জ কমিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইবার বব তাঁর আলমারি থেকে একটি ফাইল বের করে তা থেকে একটা কার্ড তুলে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন. 'এইটে যত্নে রাখবেন। এই পনের দিন যদি কোথাও কোনো বিপদে পড়েন তাহলে কার্ডটাকে দেখাবেন।'

সুন্দর ভিজিটিং কার্ডের মতো দেখতে সাদা কার্ডে লেখা রয়েছে, 'মিস্টার

মরেশ মজ্মদার আমাদের অতিথি। ওঁকে কোনো রকম সাহায্য করা মানে তা
ামেরিকান সরকারকেই সাহায্য করা হবে। রোনাল্ড রেগন, প্রেসিডেণ্ট। সর-
ারি মনোগ্রাম ছাপা রয়েছে কার্ডে। রোমাঞ্চিত হলাম। আমেরিকার প্রেসি-
ডণ্টের ক্ষমতা যা পড়েছি এখানে এসে তার তেমন প্রমাণ পাইনি। কিন্তু ব্ঝতে
পারছি তাঁর অদৃশ্য হাত সর্বত্র। সেক্ষেত্রে এমন কার্ড সঙ্গে থাকা মানে অরণ্য-
দবের আশীর্বাদপ্ষ্ট লকেট ব্কে ঝোলানো! সযত্নে ব্ক পকেটে রেখে দিলাম
ওটাকে।

বের সেক্রেটারির নাম যদ্দ্র মনে পড়ছে লিজা। লিজা এলেন কাগজপত্র নিয়ে।
আমার টিকিট আগামীকাল পাওয়া যাবে। পনেরশ' ডলারের ট্রাভেলার্স চেক
এগিয়ে দিয়ে সইসাব্দ করিয়ে নিলেন তিনি। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন,
ভাঙাতে অস্বিধে হবে নাতো? যেকোনো সিটি ব্যাঙ্কে চলে যাবেন।'

কাছাকাছি ব্রাঞ্চ আছে?'

বব বললেন, 'লিজা, তুমি বরং মিস্টার মজ্মদারকে দেখিয়ে দাও ব্যাঙ্কটা। আর
হ্যাঁ, মিস্টার মজ্মদার আমরা আপনার জন্যে এসকর্টের ব্যবস্থা করেছি।'

'এসকর্ট'? অবাক হলাম।

'হ্যাঁ। এদেশে আপনি নতুন। কখন কোন জায়গায় যেতে হবে ঠাওর করতে
পারবেন না। তাছাড়া আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। এখানে গাড়ি চালা-
বার জন্যে ড্রাইভার পাওয়া যায় না। এই এসকর্টই গাড়ি চালাবে আপনার।
আপনার প্রোগ্রামের সব দায়িত্ব তার।'

সঙ্গে সঙ্গে এই বঙ্গ সন্তান সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। আমার এই পনেরদিনের সফরে
বব পেছনে টিকটিকি লাগাতে চাইছে। সি আই এর চর নাকি? ছাত্রজীবনে
ছাত্র ফেডারেশন করেছি এই খবরটা পেয়ে গেছে নাকি? হেসে বললাম, 'সরি।
এতদ্র যখন একা আসতে পেরেছি তখন আপনাদের দেশটা ঘ্রে দেখতে এস-
কর্টের দরকার হবে না।'

কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে মাথা নাড়ল বব, ভুল করছেন। আপনি একটি শহরে গিয়ে
কারো সাহায্য ছাড়া কিছ্ই না দেখে চলে আসবেন। একজনের অভিজ্ঞতা আপ-
নাকে অভিজ্ঞ করবে। তাছাড়া গাড়ির ব্যাপারটা তো রয়েছেই। লিজা, এস-
কর্টের কি হলো?

লিজা বললেন, 'আই অ্যাম এক্সপেক্টিং হার ট্মরো মর্নিং।'

হার? বলছে কি! আমাকে এসকর্ট করবে একজন মহিলা?

পনেরদিন ধরে। কি কান্ড! লিজা আমার ম্খ দেখে বোধহয় ব্ঝতে পারলেন,
শী ইজ ভেরি অ্যাকমপ্লিশড। স্ন্দরী। সাতাশ বছর তিনমাস বয়স। বানানো
নয়।'

লিজা আমাকে নিয়ে বের হলেন। আগামীকাল টিকিটের জন্যে আমাকে এখানে
আসতে হবে। নিচে নেমে ফ্টপাতে পা দিয়ে লিজা বললেন, 'আপনাকে একটা
টিপস দিচ্ছি মিস্টার মজ্মদার। আপনার এসকর্টটিকে আমরা দৈনিক রাহা-
খরচ দিচ্ছি। টাকাটা খ্ব ভালো। প্লাশ কাজটার জন্যে টাকা পাবে। ওকে নিয়ে

যখন রেস্টুরেন্টে ঢুকবেন, ঢুকতেই হবে খেতে, তখন ওর খাবারের দাম আপনি দেবেন না। ও আমাদের কাছে ওই জন্যে টাকা পাচ্ছে।

ব্যাঙ্ক থেকে তিনশো ডলার ভাঙিয়ে লিজা ডলার এবং ট্রাভেলার্স চেকগুলো আমাকে দিয়ে বিদায় নিয়ে গেলেন। পকেটে ওই মহামূল্য বস্তুগুলো রেখে ফুট-পাতে এলাম। অফিস থেকে বের হবার আগে বব আমাকে আর একটি কার্ড দিয়ে-ছিলেন। এটা দেখালে আগামীকাল সকালে আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রেগন সাহেবের বাসভবন হোয়াইট হাউসে ঢোকার অনুমতি পাব। কিন্তু এখন আমি কি করতে পারি। রাস্তায় লোকজন খুব কম। রাজধানী যেন কলকাতার সল্ট লেক শুধু গাড়ির স্রোত বয়ে চলেছে। রাস্তায় বাস রয়েছে কিন্তু তারা কোথায় যাচ্ছে জানি না। বব আমাকে ওয়াশিংটনে দ্রষ্টব্য কেন্দ্রগুলোর একটা লিস্ট দিয়েছিল। নিউইয়র্কে আমি কিছুই দেখতে চাইনি। ওয়াশিংটনে ওসব দেখব তবু সময় কাটানোর জন্যেই স্পেস রিসার্চ সেণ্টারে চলে গেলাম একটা ট্যাক্সি নিয়ে। সত্যি এবং কল্পনার মধ্যে মেলামেলি অভিজ্ঞতা এখানে না এলে হতে না। মহাকাশ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার একটা প্রাথমিক স্তরে চলে আসা যায় স্বচ্ছন্দে।

বিকেলে হোটেলে পাইন দম্পতি এলেন। ওদের গাড়িতে আমি শহরটা বেশ কয়েকবার পাক দিলাম। জুলি জিজ্ঞাসা করলেন, পাঙ্কদের সঙ্গে আমার পরি-চয় হয়েছি কিনা! বললাম, দেখেছি কিন্তু পরিচয় হয়নি। ওয়াশিংটনের রাস্তায় কালো মানুষের সংখ্যাই বেশি। মার্টিন লুথার কিং-এর খুনের পরে এরাই ক্রোধে উন্মাদ হয়ে যে তান্ডব করেছিল তার চিহ্ন এখনও ওয়াশিংটনের রাস্তায় রয়েছে। গাড়িতে ঘুরলে একটা ছিমছাম শহরের যে চেহারা তার বেশি কিছু আমি দেখলাম না। পাইন দম্পতি অতিরিক্ত মাত্রায় ভদ্রমানুষ। ওঁরা প্রথমে নিয়ে এলেন আমাকে একটা লেকের ধারে। সেখানে ফ্লোটিং দোকানে বিভিন্ন রকমের মাছ বিক্রি হচ্ছে। বাঙালি মাত্রেই লোভী হবেন ওখানে গেলে। বিশাল গলদা চিংড়ির কেজি পঁচিশ টাকা, ডলার নয়। জুলি একটা দশ কেজি রুই এবং পাঁচ কেজি পরিমাণ চিংড়ি কিনে গাড়ির ডিকিতে বরফ দিয়ে রেখে দিলেন। মাছের বাজার কিন্তু মেছোবাজার নয়। দিল্লির বইমেলায় যেমন হাতে গুনতি লেখক আসে এও তেমন। রীতিমত ডাকাডাকি শুরু হয়ে যায় খদ্দের দেখলে। আমরা একটা খুব সুন্দর রেস্তোরাঁয় বসলাম। খুব সিরিয়াস বিষয় নিয়ে কথা বললাম। মদ খেলাম যেটুকু না খেলে নয়। তারপর রাত হলে হোটেলে ফির-লাম। পাইন দম্পতি আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। এবং তার আধ ঘণ্টা বাদেই আমি পিংকির ফোন পেলাম, 'কেমন ঘুরলেন?'

'এই আর কি!' হাসলাম।

'কেমন বোর হলেন?'

'এই আর কি!' এবার আর হাসি নয়।

'কি বলেছিলাম?'

'তুমি এখন কোথায়?'

বান্ধবীর বাড়িতে। আসবেন।'

না হে। এবার ঘুমাবো।'

রিসিভার রেখে বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। আমার কি বয়স হচ্ছে? বুড়ো হয়ে গেছি? চোখের নিচের চামড়ায় কি হাঁসের পায়ের ছাপ পড়ছে? ট করে পাগলাদার মুখ মনে ভেসে এল। আমরা যখন ক্লাস থ্রিতে পড়তাম তখন পাগলাদা ম্যাট্রিক দিচ্ছেন। আমি যখন ক্লাস টেনে তখনও উনি চেষ্টা থেকে বিরত হননি। সেই পাগলাদার এক কাকা ছিলেন যার বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ। জুলপিতে পাক ধরেছে এবং সেইসময় সার্ট ধুতি পরার অভ্যেস থাকায় আমাদের মনে হতো উনি যাকে বলে প্রৌঢ়। পাগলাদা পাশ করতে পারছেন না দেখে বকাবকি করায় তাঁর সম্পর্কে পাগলাদা বলেছিলেন, 'বুড়োটা যে কবে মারা যাবে।'

চল্লিশে পা দিলে আজ কাউকে বুড়ো বলা যায় না। অপর্ণা সেন আমার চেয়ে মাত্র তিন ক্লাস নিচে পড়তেন। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় ওঁকে দেখেছি। এখন ওঁকে দেখলে চিত্ত চঞ্চল না হলে ধরে নিতে হবে পেশমেকার বসানো আছে। তাহলে আমি বুড়ো হবো কি করে। অংকই তো উল্টো কথা বলছে। কিন্তু পিংকির ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না কেন? নিজেকেই সব সময় বুঝি না।

বিছানায় শুয়ে আর একটা সুখ ভাবনায় আক্রান্ত হলাম। পনেরদিন ধরে আমার গাড়ি চালাবেন. আমার সঙ্গিনী হবেন, যে হোটেলে আমি থাকব সেখানে থাকবেন একজন সাতাশ বছরের শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা, ভাবা যায়? চোখের সামনে আভা গার্ডনার, ব্রিজিট বার্ডোট, সোফিয়া লোরেন, লিজ টেলারের মুখ ভেসে এল। লিজ বলেছেন ইনি সুন্দরী। পনেরদিন কম কথা? উত্তেজনায় ঘুমই আসছিল না। আচ্ছা, একসঙ্গে খেতে বসে একজন মহিলাকে দাম দিতে বলা যায়? আর একটু ভালো জামা প্যান্ট আনলে হতো। পনেরশ' ডলার যা আজ পাওয়া গেল তার কত খরচ হবে জানি না, জানলে কালই কিছু কিনে নিতাম। বিছানায় চিৎপাত হয়ে সিগারেট ধরালাম।

আচমকা মাথায় অন্য একটি ভাবনা এলো। আমেরিকায় এলাম কোনো কালো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো না। কিছুদিন আগে একটা ছবিতে কালো মেয়েকে দেখেছিলাম। পাঁচ আট লম্বা হবেই, বিদ্যুতের মতো শরীর। অতএব সাদার বদলে কোনো কালো মেয়ে তো আমার এসকর্ট হতে পারত! শ্বেতাঙ্গিনী এসকর্ট হবার জন্যে যা যা গুণ রপ্ত করেছে তা কি কোনো কৃষ্ণাঙ্গী অর্জন করতে পারেনি? চিন্তাটা মাথার মধ্যে এমন পাক খেতে লাগল যে তা থেকে মুক্তি পাচ্ছিলাম না। আমেরিকা মূলত কৃষ্ণাঙ্গের দেশ। শ্বেতাঙ্গরা এটাকে কলোনি করে পরে জাঁকিয়ে বসেছে। অতএব আমার গাইড হওয়া উচিত একজন কৃষ্ণাঙ্গীর। রিসিভার তুলে নিয়ে ববকে ডায়াল করলাম। কিছুক্ষণ বাদে ববের ঘুম জড়ানো গলা পেলাম। নিজের পরিচয় দিতেই তিনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ইয়েস মজুমদার, কোনো বিপদ আপদ?'

'না-না। আপনাকে অনুরোধ করব।'

'বেশ তো।'

'আমার এসকর্টটি যদি শ্বেতাঙ্গিনীর বদলে কৃষ্ণাঙ্গী হয় তাহলে আপনার আপত্তি আছে ?

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ, 'বেশ। তবে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কাল সকালে গিয়ে গাইডদের লিস্ট দেখে বদলাতে চেষ্টা করব। গুড নাইট।'

ঘড়ি দেখে লজ্জিত হলাম। মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। এটা কি ফোন করার সময় ? পরদিন সকালেই ববের ফোন এল, 'সরি মজুমদার, আমাদের লিস্টে দুজন ব্ল্যাক লেডি এসকর্ট আছে। কিন্তু তারা এই মুহূর্তে এনগেজড্।'

'ও'। আমি হতাশ হলাম।

'আমার মনে হলো শ্বেতাঙ্গিনীর ওপরে আপনার কোন কারণে বীতরাগ আছে। না, না, আমি ঘটনাটা জানতে চাই না। আমি আপনার সেন্টিমেন্টকে অনার করছি, কৃষ্ণাঙ্গী না পেয়ে আমি একটি সাদা ছেলেকে ডেকে পাঠিয়েছি। ও লেখে টেখে, নাটক, ছবি সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড। এগারটার মধ্যে আপনার হোটেলে পৌঁছে যাবে।' রিসিভারটা পড়ে গেল হাত থেকে ঠিক যেভাবে বাংলা ছবির বাবাদের খারাপ খবর পেয়ে হাত থেকে পড়ে যায় এবং হার্ট অ্যাটাক্ হয়। অবশেষে নিজের জিভ কামড়াতে ইচ্ছে করছিল। চিরটাকাল এই করেই আমি মাঝ নদীতে রয়ে গেলাম। ঠিক এগারটায় দরজায় শব্দ হলো। একটি লম্বা ফর্সা দাড়িওয়ালা তরুণ হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমি কেন্ট মুরহেড। আপনার এসকর্ট।'
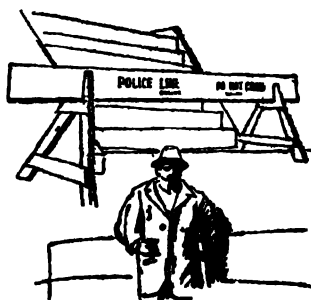
বোধহয় এইজন্যে বুদ্ধিমানেরা বলে থাকেন, অল্পে সন্তুষ্ট হও, বেশি চাওয়া-চায়ি করতে যেওনা, নইলে যখন পস্তাবে তখন আঙুলে নখও থাকবে না কামড়াবার জন্যে। বব আমাকে গাইড করার জন্যে একটি সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনীর ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু আঙ্কল টমস কেবিন না কিসের দেখা ইংরেজি ছবির সুন্দরী কৃষ্ণাঙ্গীকে দেখা আমার মন চাইল একটি কালো কেউটের মতো সুন্দরী আমার সঙ্গে ঘোরা ফেরা করুক। এর কোনো মানে হয় ? ইনিও গেলেন উনিও, মাঝখানে আমার কপালে এক কবি কবি স্বভাবের নীল চোখে চশমা সাঁটা, লালচে দাড়ির যুবক যাকে কিছু বললেই খুব গম্ভীর ভঙ্গিতে ভেবে নেয় কিছুক্ষণ তার-পর জবাব দেয় গুছিয়ে। জানিনা কেউ ওকে বলেছে কিনা ভারতীয়দের কথা-বার্তার অনেক রকম মানে হয় নইলে অত ভাববার কি আছে !

এ আফশোষের পালা আমার ইহজীবনে শেষ হবে না। কিন্তু কেন্টকে তো ফেরত পাঠানোর উপায় নেই। আমার অবস্থা প্রায় অতীনের মতো। ও ইংরেজি কাগজের মারফৎ দুজন পেন ফ্রেন্ড যোগাড় করেছিল। দুজনই বাঙালি। এক-জন থাকে নিউ আলিপুর অন্যজন বালিগঞ্জে। অতীন দুজনের সঙ্গেই হবি, পড়াশোনা নিয়ে চিঠিপত্র শুরু করে প্রায় ইওর্স অনলিতে যখন পৌঁছে গেছে তখন দুজনই ওকে দেখতে চাইল। অতীন এলো আমার কাছে। তখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। সে সময় আমাদের কাছে সততার দাম ছিল খুব। অতীন বলল, 'দুজনকে দুটো ডেট দিতে পারব না। খুব খারাপ কাজ হবে

সেটা। তার চেয়ে একজনকে লিখে দিই তোমার সঙ্গে আমার দেখা করা অসম্ভব। কারণ আমি আর একজনকে দেখতে চাইছি।' জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কাকে লিখবি সেটা?' অতীন বলেছিল, 'সেটাই সমস্যা। আমি দুজনের স্ট্যাটিস্টিক দিচ্ছি, তুই হেল্প কর তো। একজন পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, ব্রেবোর্নে পড়ে, ফর্সা, গান জানে, ছবি আঁকে। আর একজন পাঁচ ফুট লম্বা, নিউ আলিপুরে পড়ে, ডাক টিকিট জমায় আর রাঁধতে ভালবাসে।' অতীন আমার দিকে তাকিয়েছিল। ঠাট্টা করে বলেছিলাম, 'যে খাওয়াতে ভালবাসে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখাই ঠিক।' অতীন রেগে গিয়েছিল, 'তোর সমস্ত বুদ্ধি পেটে গিয়ে শেষ হয়। ব্রেবোর্নে পড়া গান গাওয়া আর পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি, বাঙালি মেয়েদের মধ্যে ওয়ান পার্সেণ্ট ওই রকম লম্বা হয়, ওকেই লিখছি আসতে।' বোঝাতে চেয়েছিলাম, 'তার চেয়ে একদিন দুটো কলেজে গিয়ে দেখে আয় না কে কি রকম?' ও বলেছিল, 'অনুমতি ছাড়া দেখেছি জানতে পারলে পেন ফ্রেন্ডশিপের শর্ত ভাঙা হবে।' সেই পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চির সঙ্গে অতীন সাতদিনও থাকতে পারেনি। পার্ক স্ট্রিটের বড় রেস্টুরেণ্টের চায়ের বিল মেটাতে জেরবার হয়ে গিয়েছিল বেচারা। মেয়েটি নাকি বলেছিল, 'বসে কথা বলতে হলে নাথিং বিলো পার্ক স্ট্রিট।' তবু অতীন তো দুজনের একজনকে পেয়ে অভিজ্ঞ হয়েছে। আমি তো তাও পেলাম না।

এই অবধি পড়ে যদি কারো মনে হয় আমি হ্যাংলামো করেছি তাহলে তাঁর কাছে আমার বিনীত নিবেদন আছে। স্কটিশ চার্চ বা ইউনিভার্সিটিতে কোনো মেয়ে আমাদের ধারে কাছে ঘেঁষতো না। আমার গায়ে নাকি মফস্বলি গন্ধ ছিল সেটাও একটা কারণ। খুব ছেলেবেলা থেকেই আমাদের মনে এমন একটা ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যার ফলে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতেই অস্বস্তি হতো। বাঙালি মেয়ে প্রেমে পড়ে যাদের, তাদের জন্যে জীবন দেয়। বাঙালি মেয়ে চোখের জলে ভাসে ও ভাসায়। কিন্তু কতদিন? একমাত্র মনীষা ছাড়া আমি এমন একটি বাঙালি মেয়েকে দেখিনি যে বন্ধুর মতো রাত এগারটায় আড্ডা মারতে পারে। শিবরাম চক্রবর্তী এক সকালে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বিকেলে কি করছ?' বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারব শুনে বলেছিলেন, 'ও সব করে কিছু হবে না। রোজ বিকেলে মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দেবে। তাতে কুচুটেপনা এমন শিখবে যে আর ঠকতে হবে না।' কিন্তু আড্ডা দেবার মতো মেয়ে কোথায় পাব তা বলেননি। কলকাতায় কোনো মহিলার সঙ্গে কলেজ স্ট্রিটে পাঁচ পা হাঁটলে গড়িয়াহাটায় খবর রটে যায়। তাই পনের দিন একটি বিদেশিনীর সঙ্গে আড্ডা মারতে পারব সবার ঈর্ষাকাতর চোখ এড়িয়ে এমন সুখ থেকে যখন বঞ্চিত হলাম তখন হা হুতাশ না করে উপায় কি? আর আপনি যদি ছেলে হন তাহলে আমার কষ্ট বুঝতে পারলেও মুখে অন্য কথা বলবেন। যদি মেয়ে হন, খুব খারাপ লাগবে, কিন্তু কি করা!

কেণ্ট যাবে বব-এর অফিসে। এই হোটেলেই উঠেছে সে। আমাকে তৈরি হতে বলল। আমি বললাম, কেণ্ট তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা বলে নেওয়া

দরকার। এ কাজের জন্যে তুমি টাকা পাবে?
'হ্যাঁ। আমেরিকায় যারা বেড়াতে আসে তাদের গাইড করার জন্যে একটা প্যানেল আছে। হাতে যখন কাজকর্ম কম থাকে তখন অফার পেলে রাজি হয়ে যাই।'
'ভালো। তোমার সঙ্গে যখন পনেরদিন থাকব তখন দুটো ব্যাপার মাথায় রেখো। একমাত্র প্লেন ধরা বা কারো সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট রাখা ছাড়া আমাকে মোটেই তাড়া দেবে না। আর কোনো নতুন জায়গায় গিয়ে স্ট্যাচু, বিল্ডিং মিউজিয়াম দেখতে বলবে না। আমি সেই জায়গার মানুষের সঙ্গে আড্ডা মারতে চাইব। তুমি থাকলে আপত্তি নেই, না থাকতে চাইলে যা ইচ্ছে তাই করো।'
আমার কথাগুলো কেণ্ট চোখ বড় করে শুনলো। মাথা নাড়ল। ট্যাক্সি নিয়ে আমরা বব-এর অফিসে গেলাম। বব কেণ্টের সামনেই বারংবার দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল কৃষ্ণাঙ্গিনী কাউকে পায়নি বলে। তারপর বলল, 'কিন্তু দেখো, কেণ্টকে তোমার খুব পছন্দ হবে। ভালো ছেলে।'
কেণ্ট গেল লিজার সঙ্গে আমার টিকিটের ব্যবস্থা করতে। বব বলল, 'এখনও হলিউড থেকে কোনো ফিল্মস্টারের কনফার্মেশন পাইনি। মনে হয় তুমি সেখানে পৌঁছবার আগেই ওটা হয়ে যাবে। এক কাজ কর, সময় আছে এখনও, তুমি হোয়াইট হাউসটা দেখে এসো।'
'কি দেখব ওখানে?'
'কি দেখবে মানে? প্রেসিডেণ্ট থাকেন ওখানে?'
'তা তো জানি। এখন গেলে ওঁর দেখা পাবো?'
না-না। তোমাদের ঢুকতে দেওয়া হবে ওর অফিসের একটা অংশে। আগের প্রেসিডেণ্টরা যেখানে থাকতেন সেখানেও যেতে দেওয়া হবে।'
'তার মানে টেবিল চেয়ার, কিছু আসবাব, দেওয়ালে টাঙানো ছবি, মানে অনেক স্মৃতি যা তোমাদের কাছে মূল্যবান। তাই তো?'
ব্যাপারটা অনেকখানি ওইরকম।'
আচ্ছা বব, আমি যদি হোয়াইট হাউসে না যাই তুমি কিছু মনে করবে?'
আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল বব, 'তাই বল। তাহলে তুমি ওয়াশিংটনে কি দেখতে চাও বল তো।'
'দেখি কি দেখা যায়। এ ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই তো?'
'না-না। অ্যাজ ইউ লাইক। বাই দ্য ওয়ে, আমেরিকান মোশন পিকচার্স-এর একটা বিরাট কালেকশন এখানে আছে। ওখানে পৃথিবীর সব দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক ছবি আছে। যেতে চাও?' বব উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল।
আমি জানিনা, রাশিয়ায় কখনও যাইনি, একজন রাশিয়ান আর একজন আমেরিকানের মধ্যে কে বেশি গোঁড়া। মস্কোয় গিয়ে যদি আমি ক্রেমলিন দেখতে না চাইতাম তাহলে ওঁদের কি প্রতিক্রিয়া হতো। কিন্তু ববকে দেখে মনেই হয়নি হোয়াইট হাউসে না যাওয়ার ইচ্ছা জেনে ও বিন্দুমাত্র বিরক্ত হয়েছে। হয়তো পাকা অভিনেতা, আমার নামের পাশে ঢ্যাঁড়া পড়ল, এমনও হতে পারে।

লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস বিল্ডিং-এ কেন্ট আমার সঙ্গে আসেনি। বব-এর নির্দেশ নিয়ে নিজেই চলে এলাম। লিফটে ওপরে উঠে জিজ্ঞাসা করে করে সিনেমার ফ্লোরে পৌঁছে গেলাম। ঢোকার আগেই চোখে পড়ল বাঁ দিকে বিশাল ক্যান্টিন। খিদে পেয়েছিল। রকমারি খাবারের সামনে পৌঁছে সেলসম্যানকে হুকুম দিতেই যে খাবার ট্রেতে তিনি সাজিয়ে দিলেন তার মূল্য বাজার দরের অর্ধেক। একটা খালি টেবিল দেখে আরাম করে বসে খাওয়া শুরু করলাম। হলঘরের মতো খাওয়ার ঘরে সব টেবিলেই নারী পুরুষ খেয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কান খাড়া হলো। বঙ্গললনার কণ্ঠে প্রশ্ন বাজল, 'পুদিনা পাতা পেলে কোথায় ?'

'বাজারে। হঠাৎ দেখতে পেলাম। গন্ধটা দেশের মতো অতটা নয়।'

'লাউ পেয়েছিলাম গত রবিবার। কুঁচো চিংড়ি তো নেই, গলদা দিয়ে করতে হলো।'

'আমি বাবা অত রান্না পারিনা। তিনি তো দিনরাত বলে যাচ্ছেন মাকে লিখে রান্নার বই আনিয়ে নিতে। আনালেই মুস্কিল। রোজ একটা না একটা বায়না হবে।'

আমি আর পারলাম না। মুখ ঘুরিয়ে পেছনে তাকালাম। দুজনেই প্যান্ট এবং জ্যাকেট পরা। একজনের যার বয়স হয়েছে, যিনি লাউ চিংড়ি রেঁধেছেন, তাঁর চুল প্রায় ছেলেদের মতো ছাঁটা। দ্বিতীয়ার কাঁধ পর্যন্ত, এখনও যুবতী। ওঁরা দুজনেই আমাকে দেখলেন। হেসে বললাম, 'আপনাদের খাওয়া দাওয়ার গল্প আমার কানে এলো বলে তাকালাম, কিছু মনে করবেন না।' মহিলারা একটু হাসলেন।

প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানেই চাকরি করছেন ?'

'আজ্ঞে না। বেড়াতে এসেছি।'

'আমেরিকায় বেড়াতে এসে লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের ক্যান্টিনে খাচ্ছেন ?'

'চোখে পড়ে গেল। এসেছিলাম মোশন পিকচার্সে।'

'সিনেমার লোক নাকি ?'

'আজ্ঞে না।'

যুবতী মহিলার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি কোনো কথা বলেননি। বাঙালি মহিলাদের বয়স না হলে সম্ভবত আড় ভাঙে না। প্রৌঢ়া যে স্বচ্ছন্দ নিয়ে কথা বলতে পারছেন যুবতী তা পারেননি। এক্ষেত্রে পরিচয় অপরিচয়ের প্রশ্ন তুলে লাভ নেই, প্রৌঢ়ার ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য। তবে সবার প্রকৃতি এক-রকম নয়, এটা মানতে রাজি আছি। প্রৌঢ়া বললেন, 'এখানে বসতে পারেন আপনি, ইচ্ছে হলে।' ট্রে তুলে ওঁদের টেবিলে এসে বসলাম। নমস্কার করে বললাম, 'আমি সমরেশ মজুমদার। আপনারা কি এখানেই চাকরি করেন ?'

প্রৌঢ়া বললেন, হ্যাঁ। বেড়াতে এসেছেন বললেন, কারো কাছে উঠেছেন ?' না হোটেলে।'

দুজনে দুজনকে দেখলেন। প্রৌঢ়া বললেন, 'বাঙালিরা এখানে বেড়াতে এসে ওঠার জায়গা ঠিক করে আসে। ডলার তো দেশ থেকে আসার সময় বেশি পাওয়া

যায় না।'
বললাম, 'আমার ঘোরার ব্যবস্থাটা এদেশের সরকার করেছেন।'
'কেন ?' আপনি কি করেন ?'
'লেখা লেখি।'
প্রৌঢ়া বললেন, 'আমি তো তিরিশ বছর দেশে যাইনি। তুমি নাম শুনেছ ?'
যুবতী মাথা নাড়লেন, 'সমরেশ বসু বলে একজন লেখেন, শুনেছি।'
চটপট জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কবে এসেছেন এদেশে ?'
'সিক্সটি নাইনে।'
অনুমান করলাম এদেশে আসার সময় ওঁর বয়স আঠারোর বেশি হবে না। কিন্তু তখনও কি উনি সমরেশ বসু পড়েননি। মনে পড়ল লা মার্টিনার্সে পড়া একটি কিশোরী আমাকে বলেছিল, 'আমি রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখার ইংরেজি ট্র্যান্সশ্লেশন পড়েছি।' ইনি যদি সেই গোত্রের হন কিছু বলার নেই। অনেক বাড়িতেই দেখেছি পড়াশোনার চাপ সামলে ছেলে-মেয়েদের বাংলা গল্পের বই পড়তে উৎসাহ দেওয়া হয় না। আমাদের কালে যেমন লাইব্রেরিতে পড়ে থাকার রেওয়াজ ছিল গার্জেনের চোখ এড়িয়ে। এখন সেটা নেই।
প্রৌঢ়া বললেন, তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-প্রেমেন্দ্র মিত্রের পর লেখালেখি হচ্ছে !'
বললাম, 'খুব খারাপ। কয়েকজনমাত্র লিখতে পারছেন।'
প্রৌঢ়া বললেন, 'শুনেছিলাম বিভূতিভূষণ নাকি না খেয়ে মারা গিয়েছেন। টিভিতে যখন সত্যজিতের পথের পাঁচালি দেখানো হলো এত কষ্ট হচ্ছিল।'
বললাম, 'আপনি ভুল শুনেছেন। জীবদ্দশায় বিভূতিভূষণ বেশি অর্থ পাননি বটে কিন্তু না খেয়ে মারা যাননি। তবে হ্যাঁ, তিনি তো অল্পেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু সত্যজিত রায়ের নাম আপনি শুনেছেন ?'
বাঃ শুনবো না। এখানকার টিভিতে একজন আমেরিকান সত্যজিতবাবুর একটা ইন্টারভিউ নিয়েছিল। আপনাকে বলব কি, সত্যজিতবাবুর ইংরেজির পাশে ও দাঁড়াতে পারেনি। এত গর্ব হচ্ছিল তখন।' প্রৌঢ়া হাসলেন।
'আপনার হাজবেন্ড কি করেন ?'
'উনি মারা গেছেন। ছেলে-পিলে নেই। একাই আছি।'
এবার যুবতী বললেন, 'দেশে ফিরতে একদম সময় পাই না। এত নেমন্তন্ন রাখতে হয়, এত জায়গায় যেতে হয়, আপনার নাম শুনিনি বলে কিছু মনে করবেন না। দূরত্বটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'
'না-না। মনে করার কি আছে। পশ্চিমবঙ্গের শতকরা নিরানব্বুই জন আমার নাম জানেন না। সে ক্ষেত্রে আপনি ঠিকই আছেন।'
যুবতী এবার উঠলেন, 'আমি উঠছি। ভালো লাগল আলাপ করে।' মহিলার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে উনি চলে গেলেন। অপ্রস্তুত বোধ করলাম, 'আমি কি আপনাদের আড্ডা ভেঙে দিলাম।'
'না-না। ও রোজ আগেই উঠে যায়।' প্রৌঢ়া ধীরে সুস্থে খাচ্ছিলেন, 'দেশের খবর কেউ এলে পাই। সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপারটা জানিই না। অবশ্য কেউ এলে

গান শ্নতে যাই। এই সেদিন সন্ধ্যা ম্খার্জি এসেছিলেন, হেমন্ত ম্খার্জি, দ্বিজেন ম্খার্জি এরা এলে খ্ব ভিড় হয়। ওদের পরে যারা গাইছে তাদের নাম জানি না।'
'এ ব্যাপারে আপনি কিছ্ মিস করেননি। সত্তর কিংবা আশির দশকে পশ্চিম-বাংলায় কোনো আধ্নিক গায়ক নাম করেননি।'
'এখানে দ্'টো বাংলা নাটকের দল এসেছিল। উত্তমকুমারের ভাই তর্ণ কুমার—
বাধা দিয়ে বললাম, 'শ্নেছি সে গল্প।' এবার ওর কথা জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল, আপনারা কি গ্রীন কার্ড হোল্ডার? মহিলা মাথা নাড়েন, 'সিটিজেনশিপ পেয়ে গেছি। উনি মারা যাওয়ার পর একাই আছি। খ্ব খারাপ লাগে মাঝে মাঝে। কিন্তু দেশে গিয়ে তো থাকতে পারব না। বাড়ি বাগান আর অফিস নিয়ে আছি। এখানে আর কোনো বাঙালির সঙ্গে আলাপ হয়নি?
আমি রমেন পাইনদের কথা বললাম। দেখলাম উনি ওদের চেনেন। খ্ব ইচ্ছে করছিল ওঁর বাড়িতে যেতে। আমেরিকায় একজন বাঙালি প্রৌঢ়া একদম একা হয়ে কিভাবে রয়েছেন জানার আগ্রহ ছিল। কিন্তু ইনি এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। খাওয়া শেষ করে প্রৌঢ়া আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মোশন পিকচার্সে কার কাছে যাবেন?'
পকেট থেকে কাগজ বের করে পড়লাম, 'মোশন পিকচার্স-ব্রডকাস্টিং এন্ড রেকর্ডেড সাউন্ড ডিভিসনের এ্যাসিস্টেন্ট চিফ মিস্টার পল সি স্পের-এর কাছে।'
'ও পল! চল্ন আমার সঙ্গে।'
'আপনি চেনেন ওঁকে?'
'আমরা একই ডিপার্টমেণ্টে কাজ করি। ও আমার মেজ বস্।'
প্রৌঢ়ার সঙ্গে ডিপার্টমেণ্টে ঢ্কলাম। প্রথমেই উনি বললেন, 'আপনি যদি আগ্রহী হন, আমি যেখানে কাজ করি সেখানে আসতে পারেন। কম্প্যুটারে প্থিবীর মেজর ছবিগ্লোর সম্প্র্ণ বায়োডাটা প্রিজার্ভ করি।'
বললাম, 'আমার ইচ্ছে ওই পলের সঙ্গে দেখা করার।'
মহিলা আর কথা না বাড়িয়ে তিন চারটে দরজা পেরিয়ে স্বচ্ছন্দে একটা বড় ঘরে ঢ্কলেন। সেখানে টেবিলের কোণায় বসে দাড়িওয়ালা মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক ফোন করছিলেন। ইশারায় আমাদের বসতে বললেন তিনি। মহিলা দাঁড়িয়ে রইলেন। টেলিফোন নামিয়ে রেখে ভদ্রলোক বললেন, 'হাই'।
প্রৌঢ়া জানালেন, 'পল হি ওয়াণ্টস ট্ মিট ইউ।' বলে আর দাঁড়ালেন না। এখানে বলে রাখা ভালো প্রৌঢ়া এবং পলের চাকরিগত স্তরের পার্থক্য মহাকরণের একজন ডেপ্টি সেক্রেটারি আর লোয়ার ডিভিসন ক্লার্কের মতো। অথচ উনি যে স্বচ্ছন্দ নিয়ে পলের ঘরে এলেন এবং পল যে ভাবে কথা বললেন, তা মহাকরণের কেউ আশা করতে পারে না। পরিচয় দিতেই পল হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'গ্লাড ট্ মিট এ বেঙ্গলি রাইটার' ব্ঝলাম বব ইতিমধ্যে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে।

পল বললেন, 'সত্যজিত রায়ের খবর কি ? উনি ভালো আছেন ?
যা জানি বললাম। পল খুব দুঃখিত গলায় বলল, 'বুকের অসুখটা এমন যে আমাদের অনেক ভালো জিনিস পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে।' এরপরের আধঘণ্টা আমরা ভারতীয় ছবির আলোচনায় ডুবে গেলাম। হোঁচট খেলাম যখন দেখলাম পল তামিল অথবা ওড়িয়া ছবির খবর রাখে যা আমি ভাসাভাসা জানি। পল বলল, 'আমার এখানে সমস্ত রিপ্রেজেণ্টেটিভ ইন্ডিয়ান ফিল্মের ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াইজ ভিডিও ক্যাসেট রয়েছে। আপনি দেখবেন ? সত্যজিত রায়ের যেকোনো ছবি দেখতে পারেন শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা ছাড়া। অনেক কবেও ওটা পাচ্ছি না। শুনেছি লন্ডনে একটা প্রিণ্ট আর নিউইয়র্কে আর একটা প্রিণ্ট আছে। নিউ-ইয়র্কেরে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জন্যে এনে সম্ভবত ফেরত দেয়নি। ছবিটার প্রিণ্ট আমরা বেশি দামেও কিনতে রাজি আছি।'
পলের সঙ্গে ওদের ভিডিও লাইব্রেরিতে গেলাম। প্রমথেশ বড়ুয়া থেকে আরম্ভ করে প্রায় সব বিখ্যাত ছবির রয়েছে। মনে হচ্ছিল পরিচিত জায়গায় এসেছি। পল হঠাৎ একটা ক্যাসেট টেনে নিয়ে ভি সি আরে পুরলেন। সেই ঘরে অনেকেই পছন্দমত ছবি দেখছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তৈরি ছবিগুলো কোনো শব্দ করছে না। দর্শকের কানে যে হেড ফোন তাতে তিনিই শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। আমার কানে হেডফোন দিলেন পল। নাম্বার দেখে আগু-পিছু করে যে দৃশ্যটি তিনি পর্দায় আনলেন সেখানে কাশির ঘাটে হরিহর মৃত্যু-শয্যায়। সেই বিখ্যাত দৃশ্যটি যা তুলতে পারলে একজন চিত্র পরিচালক সারা-জীবন আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকতে পারেন, আমি আবার দেখলাম। সেই শব্দ করে পায়রা উড়ে যাওয়া, সমস্ত বিশ্বচরাচর এক শব্দহীন নৈঃশব্দ্যে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মুহূর্তেই। ছবি বন্ধ করে পল জিজ্ঞাসা করলেন, 'নিশ্চয়ই অপরাজিত আপনার দেখা ছবি ?'
'অনেকবার। কিন্তু এই দৃশ্যটা আমাকে দেখালেন কেন ?'
'এইটে আমার খুব প্রিয় দৃশ্য। দেখলেই মন ভালো লাগে।'
'মন ভালো লাগে ?' মৃত্যুদৃশ্য দেখলে মন ভালো লাগে ?'
'হ্যাঁ। তখন মনে হয় আমিও ওই পায়রাদের সঙ্গে এই শরীরটা ছেড়ে মহাকাশে মিলিয়ে যাব। অতএব খামোকা বেঁচে থাকার সময়টায় কেউ ঝামেলা করলে উত্তেজিত হয়ে কি লাভ ? সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক হয়ে যাই। ভালো লাগে।'
এ ব্যাখ্যার সঙ্গে কেউ একমত হবেন কিনা জানি না কিন্তু ওই সময় পলকে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। অফিসে ফিরে গিয়ে পল আমার দিকে একটা লিস্ট এগিয়ে দিয়েছিল, 'আমরা কিছু সাম্প্রতিক বাংলা ছবির লিস্ট করেছি। এগুলোর ভিডিও কিনবো। আপনি চোখ বোলান তো ! দেশ পত্রিকার ফিল্ম ক্রিটিক হিসেবে আপনার মতামতের দাম আছে আমার কাছে।'
'এ খবরটা পেলেন কোথায় ?'
জবাব না দিয়ে পল হাসল। লিস্টে চোখ বোলাতে বোলাতে চমকে উঠলাম। মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর নামের পাশে সুখেন দাসের নাম। যে ছবিটি

এরা কিনবেন ভেবেছেন দেশ পত্রিকার প্রয়োজনে সেটা আমাকে দেখতে হয়েছিল। পলকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই নামটা আপনি কোথায় পেলেন ?'
'উনি শুনেছি আপনার দেশের খুব পপুলার ডিরেক্টর। কমার্সিয়ালি ওঁর ছবি রায়ের থেকে অনেকগুণ বেশি সাকসেসফুল। অর্থাৎ লার্জার অডিয়েন্স ওঁর ভক্ত। তাই আমার এখানে ওর কপি রাখতে চাই। যাতে দর্শকদের টেস্ট বোঝা যায়।'
কিছু বলার নেই। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা আপনারা কেন ইন্ডিয়ান ফিল্মের ভিডিও ক্যাসেট লাইব্রেরি করেছেন ? এতে আপনাদের কি লাভ ?'
পল চেয়ারে হেলান দিলেন, 'মজুমদার। আমরা জানতে চাই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষেরা কে কেমন ছবি নিয়ে ভাবছেন ? ব্যস এইটুকুই।'
সেই দুপুরে লাইব্রেরি আর কংগ্রেস বিল্ডিং-এর বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, যদি আমি কলকাতায় বসে হঠাৎ গুজরাতি ছবি দেখতে চাই লোকে পাগল বলবে। পাকিস্তানের উপন্যাস পড়তে চাই পাব না। এমন কি বাংলাদেশের হুমায়ুন চৌধুরির উপন্যাস পড়তে চাই একটাও খুঁজে পাব না। অথচ এরা সব জমিয়ে রাখছে। হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন নিজেদের দেশে পুরনো ছবি না পেয়ে ওয়াশিংটনে খোঁজ করতে হবে।
ওয়াশিংটন এয়ারপোর্টের চেহারা খুব বড় নয়। কেন্ট যাবতীয় কাজকর্ম করছিল। বব ওর হাতে প্লেনের টিকিট এবং আমার ট্যুর প্রোগ্রাম দিয়ে দিয়েছিল। তাতে কোন শহরে আমি কতদিন থাকব, কোথায় থাকব, কার সঙ্গে দেখা করবো তা বিস্তারিত ছাপা। জানতাম না এই ট্যুর প্রোগ্রামের একটা করে কপি চলে গেছে সেইসব জায়গায় যেখানে এবং যাদের কাছে আমি যাব।
আমার টিকিট আমেরিকান এয়ারলাইন্সে। এদের অবস্থা অনেকটা ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের মতো। সব আছে অথচ কিছু নেই। এয়ার হোস্টেস আছেন কিন্তু সুন্দরী নন। আমাদের ধারণাটাকে আঘাত করতে এঁরা যথেষ্ট। দমদম বাগডোগরা ফ্লাইটেও একই অভিজ্ঞতা আমার। কেন্ট বসেছেন আমার কাছে। ওর মাধ্যমে হুকুম চালাচ্ছিলাম। জল খাবো, এক প্যাকেট তাস চাওতো, কফি দেবে এরা ? কেন্ট শান্ত মুখে সেগুলো বোঝাচ্ছিল হোস্টেসকে। যখন আর কিছু চাওয়ার রইল না তখন কেন্ট আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মজুমদার একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, আমেরিকায় এসে এত জায়গা থাকতে তুমি ওয়াহিওতে কেন যাচ্ছো ? আমি এর আগে অনেককে এসকর্ট করেছি। কেউ কিন্তু ওয়াহিওতে যেতে চায়নি।'
'তুমি নিজে ওখানে গিয়েছ ?'
মাথা নেড়েছিল কেন্ট 'না'।
'তাহলে নতুন জায়গা দেখতে পাবে ?'
'কেউ আছে তোমার ওখানে ? হু ইজ দিস ভট্টা-ভট্টা।' কেন্ট পুরো উপাধিটি উচ্চারণ করতে পারছিল না। হেসে বললাম, 'তনুশ্রী ভট্টাচার্য কবি। আমার পরিচিতা। খুব সুন্দরী মহিলা। ভালো আড্ডা মারতে পারেন।'

'তোমার বান্ধবী।'

'বান্ধবী বলতে কি বোঝাচ্ছ?' মাথা নাড়লাম। 'বন্ধুর স্ত্রী লিঙ্গ বান্ধবী হলে তাই।' কেণ্ট চুপচাপ বসে রইল। প্লেন উড়ে যাচ্ছে পিটার্সবার্গ এয়ারপোর্টের দিকে। সেখানে পাল্টাতে হবে এয়ার ক্রাফট্। আজ সকালে তনুশ্রীকে ফোন করেছি যাচ্ছি বলে। ও খুব খুশি হয়েছে। হঠাৎ বললাম, 'কেণ্ট, এই এয়ার হোস্টেসকে দেখে তোমার কি মনে হয় কোনো ছেলে ওকে প্রেম নিবেদন করেছে?' কেণ্ট মাথা নাড়ল, 'কি জানি, হবে হয়তো। আচ্ছা তুমি শ্যামল গং, গং—আই অ্যাম সরি, পুরো নাম বলতে পারছি না, কিন্তু হি ইজ এ রাইটার, চেনো?

'হ্যাঁ। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। শ্যামলদা। তুমি নাম জানলে কি করে?

'উনি যখন এসেছিলেন তখন আমার এক বন্ধু ওঁকে এসকর্ট করেছিল। বাঙালি লেখকেরা কি সবসময় উল্টোপাল্টা কথা বলে?'

১৪

পিটার্সবার্গ খুব ছোট্ট এয়ারপোর্ট খিদে পেয়েছিল। কেণ্টকে জিজ্ঞাসা করতে সে মাথা নাড়ল। খাবে না। সে নাকি দিনে দুবার খায়। ব্রেকফাস্ট এবং লানার। কথা বাড়ালাম না। এয়ারপোর্ট রেস্টুরেণ্টের দিকে এগোতেই টেলিফোন বুথ নজরে এলো। তনুশ্রীকে জানিয়েছিলাম আজ ও'র ওখানে যাব। কিন্তু কোন ফ্লাইটে যাচ্ছি জানিয়ে দিলে কেমন হয়? টেলিফোন বুথে ঢুকে প্রথমে অপা-রেটারকে চাইলাম। বললাম এই নম্বরে কথা বলব, পয়সাটা যার সঙ্গে বলব সেই দেবে। যাচাই করে নিয়ে লাইন জুড়তে তনুশ্রীর গলা পেলাম, 'আসছেন তো? নাকি বাঙালি লেখকের মুডে একটা উদাহরণ রাখবেন?'

বললাম, 'যাচ্ছি। খুব বিরক্ত হবেন যাওয়ার পরে কিন্তু আর উপায় নেই। ফোন করছি পিটার্সবার্গ এয়ারপোর্ট থেকে। এয়ারপোর্টে আসবেন?'

'অবশ্যই। আপনার ফ্লাইট টাইম দেখে নিচ্ছি।'

রিসিভার নামিয়ে খেতে ঢুকলাম রেস্টুরেণ্টে। ট্রলিতে প্লেট কাঁটা চামচ নিয়ে ঘেরা সেল্ফগুলোর সামনে দিয়ে দুবার পাক খেলাম। প্রতিটি সেল্ফে সুদৃশ্য খাবার, বেশিরভাগই নানান মাংসের সুরুয়া রাখা আছে। মাংসগুলোর চেহা-রাতে মালুম হচ্ছে হয় গরু নয় শুয়োর। বাধ্য না হলে ওগুলো খাওয়ার কোনো কারণ নেই। মুরগি পেলাম না। আমেরিকায় যাদের পয়সা কম থাকে তারাই মুরগি খায়। অতএব চোখ বন্ধ করে একপিস বড় রুটি আর খানিকটা লালচে

মাংস বাটিতে তুলে পে-কাউন্টারের সামনে দাঁড়ালাম। মহিলা এক নজর দেখেই মেশিনে আঙুল টিপে বিল রেডি করে এগিয়ে দিলেন। সাড়ে চার ডলার। বাপস্‌। ম্যাকডোনল্ড হলে এর অর্ধেক দামে হয়ে যেত।
সন্দেহ আছে মনের মধ্যে, স্বাদও ভালো নয়। কিন্তু নিজেকেই বললাম, 'জলের মতন হও হে। যেখানে যেমন।' ছেলেবেলায় পিসিমা বলতেন, 'খবরদার এটা খাব না করবে না। যা পাবে লক্ষ্মীছেলের মতো খেয়ে নেবে।' পিসিমার সেই খা পাওয়ার লিস্টে নিশ্চয়ই গরু বা শুয়োরের মাংস ছিল না। কিন্তু উপদেশটি এই মুহূর্তে আমাকে স্বস্তি দিলো। আসলে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। হ্যাম বা বিফ পাঁউরুটির মধ্যে পুরে স্যান্ডুইচ বানিয়ে খেয়েছি অনেকবার। মোটেই খারাপ লাগেনি। কিন্তু ওই বস্তুর বড় বড় টুকরো ঝোলে ভাসছে দেখলেই কেমন একটা অস্বস্তি এসে যায়। পাশের টেবিলে নজর পড়তেই অবাক হলাম। ভদ্রলোক নির্বিকার মুখে ভাত আর সবজি খাচ্ছেন। এটা পেলেন কোথায়? আমার তৎক্ষণে খাওয়া শেষ। উঠে যাওয়ার মুখে ওঁর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মাপ করবেন, এসব খাবার এখানে পাওয়া যায়?'
'নইলে আমি খাচ্ছি কি করে? ভেজিটেরিয়ানদের জন্যে আজকাল ব্যবস্থা রাখেই।'
'আপনি আমিষ খান না?'
'না। এ্যানিমেল প্রোটিন মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।' ভদ্রলোক আবার খাওয়া শুরু করলেন। এই জন্যেই সাধুরা বলেছেন, চোখ মেলে দ্যাখো, ঠিক-খুঁজে পাবে। পেট পুরে খাওয়ার পর আর খোঁজার কোনো মানে হয় না। কিন্তু আমেরিকান সাহেব নিরামিষাশী ভাবতে বেশ অবাক লাগছিল। আমাদের ছেলে-বেলায় বিধবা মহিলাদেরই শুধু আমিষ ত্যাগ করতে দেখেছি। পঞ্চাশের দশকের পর পশ্চিমবাংলায় গুরুদেবদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় অনেক মানুষ দীক্ষা নিতে শুরু করলেন। তার আগে শাক্ত বা বৈষ্ণব ছাড়া কোনো শ্রেণী বিভেদ ছিল না। তবে শাক্তরাও বাড়িতে মুরগি ঢোকাতেন না। বৈষ্ণবরা খুব কট্টর না হলে মাছ খেতেন। তবে এমনিতে বৈষ্ণবদের সংখ্যা এতো অল্প ছিল যে আমার পরিচিত মানুষদের মধ্যে কাউকে পাইনি। দীক্ষা নিত সবাই রামকৃষ্ণ মিশনে, পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলে। আনন্দময়ী মা কিংবা নিগমানন্দের শিষ্যরা ছিলেন। তবে তাঁরা আমিষ বর্জন করেছেন বলে শুনিনি। পরবর্তীকালে দীক্ষার রেওয়াজ পৌঁছালো পনের ষোল বছরেও। এবং তাঁদের অনেকেই সম্পূর্ণ নিরামিষে জীবনযাপন করছেন। আমেরিকার সাহেবটি নিশ্চয়ই দীক্ষিত নন। এঁরা আমিষের বিপক্ষে নাকি একটা আন্দোলন শুরু করেছে বলে মনোজ বলেছিল। ব্যাপারটা কল-কাতায় ব্যাপকভাবে চালু হলে মাছের বাজারে বাঙালির ভিড়টা একটু কমে।
পিটসবার্গ থেকে কলম্বাস ওয়াহিও এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগে। প্লেন থেকে নেমে কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'মিসেস দাত্ কি তোমার বান্ধবী?'
বান্ধবী? তনুশ্রীকে বান্ধবী বলাটা কি ঠিক? আসলে ও মনোজ কিংবা কল্যা-ণের বান্ধবী। আমাদের দেশে বান্ধবী শব্দটির মধ্যে একধরনের ঘনিষ্ঠতা থাকে।

পরিচিতা বলাটাই সংগত। কিন্তু কেন্টকে ব্যাপক বোঝাতে চাইলাম না। বললাম, 'হ্যাঁ। ও আমাদের রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে আসবে।'
একটু স্মার্ট হবার চেষ্টা করে কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'কি রকম দেখতে উনি ?'
'সুন্দরী। স্মার্ট।' ছোট্ট করে হাসলাম। আমরা দুজন মালপত্র নিয়ে এয়ার-পোর্টের লাউঞ্জে এসে দাঁড়ালাম। কেন্ট মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'কোথায় তিনি ? এখানে তো কোনো সুন্দরী ভারতীয়কে দেখতে পাচ্ছি না।'
সত্যি। যাঁরা পরিচিতদের রিসিভ করতে এসেছেন তাদের মধ্যে তনুশ্রীকে দেখতে পাচ্ছি না। কেন্ট বলল, 'ওপাশে একজন ইণ্ডিয়ান মহিলা যাচ্ছেন। ওকে নিশ্চয়ই সুন্দরী বলবে না।' প্যাণ্ট জ্যাকেট পরা দক্ষিণী একটি মেয়েকে দেখাল কেন্ট। তারপর বলল, 'তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি কার-রেণ্ট কাউণ্টার থেকে একটা গাড়ির চাবি নিয়ে আসি।'
পরে জেনেছি আমেরিকার এয়ারপোর্ট, রেলওয়ে স্টেশন, বাস টার্মিনাসে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। দু-তিনটে কোম্পানি এই ব্যবসাটা চালায়। কেউ যদি এক শহরে গাড়ি ভাড়া নিয়ে অন্য শহরে গিয়ে সেটা জমা দেয় তাহলে কোম্পানির আপত্তি নেই। এদের ব্রাঞ্চ সর্বত্র। কেণ্টের নাম এবং নম্বর ইতিমধ্যে এদের কাছে পেঁাছে গিয়েছে। কার্ড দেখিয়ে সে বিনা পয়সায় গাড়ি পাবে আমার জন্যে। পরে সরকারের কাছে কোম্পানি বিল করে দাম নেবে। চাবি নিয়ে এসে কেন্ট বলল, 'তোমার সুন্দরী বান্ধবীটি নিশ্চয়ই খুব ভুলো। চলো, গাড়িটা নিই।'
এইসময় একটি কালো মাঝারি উচ্চতার স্যুটপরা ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, 'যদি কিছু মনে না করেন আপনি কি মিস্টার মজুমদার ?' প্রশ্ন হলো ইংরেজিতে। মাথা নাড়লাম, 'আপনি ?'
সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাত জোড় করে বললেন, 'আমি প্রভাত দত্ত।'
'আচ্ছা। নমস্কার।'
'তনুশ্রী আসতে পারল না। ওর খুব শরীর খারাপ। চলুন।'
পরিচয় করিয়ে দিলাম কেন্টের সঙ্গে। 'ইনি মিস্টার ডাট।' ওঁর স্ত্রী আসতে পারেননি শরীর খারাপ হওয়ায়।' এই প্রথম মনে হলো কেন্ট বুদ্ধিমান ছেলে কারণ কোনো কথা বলল না সে। বাইরে বেরিয়ে কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'মিস্টার ডাট, এখানে ভালো হোটেল কোথায় পাব ?'
প্রভাত বললেন, 'পথেই পাব। চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি।'
কোম্পানির পার্কিং প্লেস থেকে একটা গাড়ি নিয়ে এলো কেন্ট। আমি উঠলাম প্রভাতের পাশে। কেন্ট আমাদের অনুসরণ করছিল। প্রভাত জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছোকরা আপনার এসকর্ট বুঝি ? ঠিক আমেরিকান ছেলেদের মতো চালু নয়।'
'আপনি এখানে কতদিন আছেন প্রভাতবাবু ?'
'বছর চারেক। আগে নিউ ইয়র্কে ছিলাম। আপনার লেখা আমি দেশে পড়েছি।'

'এখানে দেশ পান আপনারা ?'
নিয়মিত নয়। কলকাতায় গেলে টাকা দিয়ে আসি, ওরা পাঠায়।'
'তনুশ্রীর কি হয়েছে ?'
'ঠিক জানি না। একটু আগে অফিসে ফোন করে বলল শরীর খুব খারাপ, আমি যেন আপনাকে রিসিভ করতে যাই।'
খুব ফাঁকা এবং নির্জন রাস্তা, চারপাশে বাড়িঘর নেই। এইভাবে কিছুটা যাওয়ার পর আমরা শহরে এলাম। ওয়াহিও শহর খুব নিরিবিলি। জনসংখ্যা অল্প। দোকানপাট ও বাড়ির চেহারায় আলস্য রয়েছে। কেন্টকে একটা হোটেলে জমা করে দিলাম আমরা। ওর কাছে প্রভাতবাবুর বাড়ির টেলিফোন নম্বর আছে। শহর ছেড়ে বেড়িয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। একটু পাহাড়ি পথ। প্রভাত দত্তকে দেখছিলাম আমি। চুল প্রায় পেকে এসেছে। বয়স আন্দাজ করা মুশকিল। মনোজের কাছে শুনেছি ছাত্র হিসেবে প্রভাত খুব মেধাবী ছিলেন। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। নিউ ইয়র্কে থাকতে প্রভাতের উদ্যোগে মনোজের সহায়তায় প্রথম আমেরিকা থেকে একটি বাংলা পত্রিকা বের হয় যার নাম 'অতলান্তিক'। পত্রিকার কিছু কপি আমি দেখেছি। এদেশে থেকে ওরা বাংলা পত্রিকার চেহারা সুন্দর করতে পারেননি। মতবিরোধ হতে মনোজ 'আন্তরিক' বের করেছিল। তার চেহারা ছাপা এবং লেখা কিন্তু অতলান্তিকের চেয়ে ঢের ভালো। অতলান্তিক এখনও বেরুচ্ছে। নিউ ইয়র্ক থেকে সরে এসে প্রভাত ওয়াহিও থেকে সেটা প্রকাশ করে সারা আমেরিকার গ্রাহকদের কাছে পাঠাচ্ছেন। স্থানীয়দের কিছু লেখা ছাড়াও জেরক্স-এর ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল ওঁকে। লাভ তো হয়ই না বরং সুখ ও অর্থ নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সম্পাদক প্রভাত দত্তের নেশা এত প্রবল যে অতলান্তিক ওঁর কাছে পুত্রতুল্য। শ্রী তনুশ্রী ভট্টাচার্য কবিতা লেখার সময় ব্রাকেটে দত্ত লেখেন না। পত্রিকার কাজে তিনি নিশ্চয়ই সাহায্য করেন স্বামীকে।
ডানদিকে ছবির মতো লনওয়ালা বাড়িগুলোর একটা প্যাসেজে গাড়ি ঢুকল। সশব্দে দরজা বন্ধ করলাম গাড়ি থেকে নেমে। কিন্তু বাড়ির ফ্রণ্ট খুলল না। যতই অসুস্থ হোক বাড়িতে নিজের অতিথি এলে দরজা খুলে আপ্যায়ন করা যাবে না এটা ভাবতে পারছিলাম না। বিশেষ করে যাঁর সঙ্গে খানিক আগে টেলিফোনে আমার কথা হয়েছে।
সুন্দর লনে হরেকরকমের ফুল। প্রভাত ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যেতেই আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। সুন্দর সাজানো ড্রইং রুম। ওপাশে ডাইনিং টেবিল কার্টেনের আড়ালে রাখা। সোফায় বসতে না বসতেই তনুশ্রী ঘরে এলেন। অসুস্থতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। এসেই বললেন, 'শেষপর্যন্ত আসতে পারলেন। কেমন লাগছে ওয়াহিও ? চা না কফি ?'
মেয়েরা রহস্যময়ী এই তথ্যের অর্ধেকটা আমি মানি। বেশিরভাগ মেয়ে জানেন না তাঁরা কি বলছেন ! নিজের কথার কণ্ট্রাডিক্ট করতে তাঁদের জুড়ি নেই। আবার কেউ কেউ আছেন জেনেশুনেই এটা করেন। তাঁরা বুদ্ধিমতী কিন্তু

রহস্যময়ী নন। তনুশ্রীকে ঠিক এই ভাষায় কথা বলতে শুনিনি কখনও। আমি আসছি উনি জানতেন অতএব শেষপর্যন্ত আমার কি হলো ? এরই মধ্যে ওয়াহিও সম্পর্কে আমার ধারণা তৈরি হতে পারে ! এবং দুটোর সঙ্গে এয়ারপোর্টে না যাওয়ার কারণ দেখানোর প্রয়োজন বোধ না করে চা কফির প্রস্তাব কি করে দেওয়া যায় ? কৈশোরে এক সুন্দরীর সঙ্গে আমার সখ্যতা ছিল। সে ছিল নেহাৎই তেরো চৌদ্দ বছরের। এক বিজয়া দশমীর সকালে বলেছিল আমি যেন অবশ্যই বিকেলে ঠাকুর মণ্ডপে যাই। গিয়েছিলাম। তার মা এলেন, মহিলারা সিঁদুর পরালেন ঠাকুরকে, কিন্তু সে এল না। দুদিন বাদে যখন দেখা হলো তখন উদাস গলায় জবাব দিয়েছিল, 'নারে, আমার মন খুব খারাপ হয়ে যায় এই সময় গেলে।' 'তাহলে আমাকে যেতে বললি কেন ?'
'তোর মন খারাপ করে দিতে খুব ইচ্ছে করছিল তাই।' আমি আর তার সঙ্গে কথা বলিনি এ জীবনে। পরে ভেবেছি সে তার কাজ ঠিকই করেছিল। মেয়েদের জন্যে মন খারাপ না হলে ওরা খুশি হয় না। এবং সেটা শুরু করার সময় ভেবেচিন্তে করে না ওরা।
দত্তবাড়িতে আমার জায়গা হলো যে ঘরটিতে সেই ঘরে এসে তনুশ্রী বললেন. 'দেখুন, আমার বাগানে কত টিউলিপ ফুটেছে !'
অভিমান ছিল, জিজ্ঞাসা করলাম, 'এয়ারপোর্টে যান নি কেন ?'
হেসে বললেন, 'একা এলে যদি হারিয়ে যান তাই যেতাম।'
হয়তো। কারণ এসেই দেখেছি সরকারী দপ্তর থেকে এই বাড়িতে আমার ট্যুর প্রোগ্রাম জানিয়ে চিঠি এসেছে হলুদ প্যাডে। আমি কোথায় কোথায় যাচ্ছি, সঙ্গে কে আছে বিস্তারিত সব। তনুশ্রীর ছোট মেয়ে মালিনী আধো কথা বলে, ভারি মিষ্টি দেখতে। বড় ছেলে গম্ভীর। দেখতেও বাবার মতন। সন্ধেবেলায় আমরা জমিয়ে আড্ডা মারছিলাম। কেন্ট এসেছিল আমায় দেখতে। সম্ভবত, আমি কিরকম পরিবেশে আছি তা দেখা ওর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কেন্ট যে চমৎকার গিটার বাজায় তা আবিষ্কার করলাম এখানে।
লোকটাকে তবু মেনে নিতে পারছি না এখনও। বারংবার ওর দিকে তাকালেই মনে হচ্ছে, আমর হঠকারিতার জন্যে কেন্ট সঙ্গে রয়েছে। কিন্তু প্রভাত দত্তের বড় ছেলে এর মধ্যেই কেন্টের সঙ্গে জমে গেছে। এখানেই মানুষ, উচ্চারণে জড়তা নেই তার ওপর সাদা চামড়ার ওপর মনে হচ্ছে দুর্বলতা একটু বেশি। খানিক বাদে ওয়ালি এলেন। বাংলাদেশের এই যুবক এ্যাণ্টিয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন। কিছুক্ষণ বাদে মনে হলো আমরা কলকাতায় আড্ডা মারছি ! খাবার টেবিলে গল্পে গল্পে রাত বাড়ল। ওয়ালি সম্পর্কে তনুশ্রী যেন খুব স্বচ্ছন্দ নন।
পরদিন দত্ত পরিবার আমাকে নিয়ে গ্রামে গেলেন। আমেরিকান চাষীদের তখন বোধহয় একটু ফুরসত মিলেছে। ফসল কাটা হয়ে গিয়েছে। জানলাম এক ফসল সেখানে দুবার বোনা হয় না ? দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে চাষী জিপ চালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সময় গোয়াল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে গরুর পাল। তাদের চেহারার বিশালতা দেখে দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই। কারণ তাদের

ালিকদের শরীর পয়সা এবং মানসিকতার কাছে ভায়তবর্ষের চাষীদের তুলনা করাও যায় না। ওয়াহিও কলম্বাসকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু বাঙালির বাস ; তাঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও সাপ্তাহিক যোগাযোগ রয়েছে। অনেকের সঙ্গে দেখা হলো। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের কোনো খবর রাখেন না। এঁদের সমস্ত ধারণা সাহিত্যিক এবং প্রাইমারি স্কুল মাস্টাররা প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় থাকেন। হাবভাব দেখে বুঝতে পারলাম আমার সাহিত্যিক পরিচয়ে ওঁদের বেশ সন্দেহ রয়েছে। তনুশ্রীর কাছে আমেরিকার গ্রাম দেখতে চেয়েছিলাম। ভালো দেখা হলো না। কিন্তু তনুশ্রীকে কিছুটা জানলাম। এই দেশ থেকে ভদ্রমহিলা আর ফিরবেন না। যদিও চেষ্টা করবেন প্রতি বছর বইমেলার সময় কলকাতায় যেতে। সারা বছর যে কবিতাগুলো লেখেন তাই জড়ো করে সেইসময় বই বের করবেন। সম্ভবত এই কারণেই তনুশ্রী একটা চাকরি করছেন যাতে দেশে যাওয়ার ভাড়া চাইতে না হয় প্রভাতের কাছে। কলকাতার জন্যে খুব মন কেমন করলেও সেখানে পাকাপাকি থাকতে চান না। কলকাতার পরিচিত মানুষদের একদম বুঝতে পারেন না তিনি। আর সেই কারণেই কলকাতা থেকে মা বাবা দুই ভাইকে তিনি ওয়াহিওতে নিয়ে আসতে চান পাকাপাকিভাবে। পরে, জেনেছি, তনুশ্রী নিজের অভিলাষ পূর্ণ করেছেন। দত্তদের বাড়ি থেকে এয়ারপোর্টে আসার সময় একটা কান্ড ঘটল। কেন্ট গাড়ি নিয়ে এসেছিল আমায় নিয়ে যেতে। প্রভাত এবং ওয়ালি আমাকে পোঁছাতে তৈরি, তনুশ্রী বললেন তিনিও যাবেন। আমি মালপত্র রেখেছি কেন্টের গাড়িতে। বেচারা একা যাবে বলে ওর গাড়িতে উঠেছি। তনুশ্রী আমাদের গাড়িতে দরজা খুললেন। প্রভাত নিজের গাড়ি থেকে চিৎকার করলেন. 'তুমি কি এই গাড়িতে যাবে না ?'

তনুশ্রী জবাব দিলেন না। জানি না স্বামী-স্ত্রীতে কোনো মনকষাকষি সেই সকালে হয়েছিল কিনা। কারণ প্রভাতকে খুব বিরক্ত দেখাল। বোকামি করলেন ওয়ালি। বাংলাদেশী ভালোমানুষী মুখ করে এগিয়ে এসে বললেন, 'তনুশ্রী, প্রভাত চাইছেন আপনি ওর গাড়িতে এয়ারপোর্ট যান।'

তনুশ্রী অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বললেন, 'ওয়ালি, আপনাকে তৃতীয়বার মনে করিয়ে দিচ্ছি আমাকে বিরক্ত না করার জন্যে।'

চাপা হাসি ঠোঁটে নিয়ে ওয়ালি ফিরে গেলেন প্রভাতের গাড়িতে।

দুটো গাড়ি আগুপিছু চলছিল। কেন্টের পাশে আমি, পেছনের সিটে তনুশ্রী চুপচাপ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। মনে আছে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত লম্বা রাস্তায় তিনি কোনো কথা বলেননি। ওঁর মুখের যা অবস্থা তাতে আমিও কথা চালাতে চাইনি। কেন্ট নিশ্চয়ই কৌতূহলে টৈ-টুম্বুর। কথা না বুঝলেও নীরবতার ভাষা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। আয়নায় দেখছি প্রভাতের গাড়িটা একই স্পিডে পেছন পেছন আসছে। শেষ পর্যন্ত আর না পেরে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে বলুন তো ?'

মেয়েরা খুব দ্রুত নিজেদের বদলে ফেলতে চায়, পারে না। কিন্তু তনুশ্রী পারলেন, 'কি ব্যাপারে ?'

'আপনি গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া ?'
'ঝগড়া করার মতো মন নেই আমার।'
এইরকম শীতল কথা মেয়েরাই বলতে পারেন যার পরে কথা খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে ওঠে।
'দেখুন, আমি এলাম আপনার নেমন্তন্নে বেড়াতে। যাওয়ার সময় এতো ভারী আবহাওয়া— ।'
'আবহাওয়া যদি ভারী হয় তবে তার জন্যে দায়ী প্রভাত। আমি নিষেধ করেছিলাম ওয়ালিকে যেন না আসতে বলে। তবু ওয়ালি এলো।'
'কিন্তু উনি তো আপনাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড ?'
তনুশ্রী উত্তর দিলেন না। একটু স্বস্তি এলো। ওয়ালিকে কেন্দ্র করেই স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। এয়ারপোর্টে পৌঁছে প্রভাত বারংবার অনুরোধ করলেন আবার আসার জন্যে। একটু আগে থেকে জানিয়ে এলে তিনি বাই রোড আমেরিকার ওপ্রান্তে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে বেড়াতে যেতে পারেন আমাকে নিয়ে। ওয়ালি বললেন, 'তখন অবশ্য আমায় পাবেন না। আমি খুব শিগ্‌গির অন্য শহরে চলে যাচ্ছি।'
গাড়ি জমা দিয়ে এলো কেন্ট। যেন খানিকটা বেপরোয়া ভাব দেখিয়েই তনুশ্রী অনেকটা আমাদের সঙ্গে এলেন। আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ডেস্ক থেকে বোর্ডিং কার্ড নেওয়ার পর কেন্ট যখন মালপত্র বেল্টে তুলে দিচ্ছে তখন তনুশ্রী বললেন, 'আজকাল খুব দ্রুত মাথা গরম হয়ে ওঠে। আপনি কিছু মনে করবেন না।'
কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না, 'আসার সময় পিটসবার্গ এয়ারপোর্ট থেকে যখন ফোন করেছি তখন বললেন এয়ারপোর্টে আসছেন অথচ একঘণ্টার মধ্যে অসুস্থতার দোহাইটা দিলেন কেন ?'
'আপনার জন্যে ?'
'বুঝলাম না ?'
'আপনার ফোন নামিয়ে রাখার পরই সরকারি দপ্তর থেকে ট্যুর প্রোগ্রাম এলো। সেটা দেখছি এমন সময় একটা ফোন। লস এঞ্জেলস থেকে জুলি নামের একটা মেয়ে জিজ্ঞাসা করল আপনি এসেছেন কিনা, আমি আপনাকে চিনি কিনা, কেমন দেখতে এইসব। এতো রাগ হয়ে গেল যে প্রভাকে ফোন করে বললাম আপনাকে এয়ারপোর্টে অ্যাটেন্ড করতে। প্রভাত খুব ভালো। রেগে না গেলে আমাকে প্রশ্ন করে না। অজুহাত না পেয়ে অসুস্থতার কথাটা ও বানিয়ে বলেছে।'
'জুলি কে ?'
'সেটা আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন। আমেরিকায় এসে কি যে করে বেড়াচ্ছেন তা আপনিই জানেন। নিউ ইয়র্কে দোসরটি ভালই পেয়েছিলেন।'
'মনোজ ভালো ছেলে।'
'মায়ের কাছে মাসীর গল্পটা কি না বললেই চলছে না।'
কিন্তু আমি অবাক হয়ে তনুশ্রীকে দেখছি তখন। সপ্রতিভ, শিক্ষিত, আমে-

রিকান জীবনে অভ্যস্ত রুচিসম্পন্না মহিলা একটু আগে যে ভাষায় কথা বললেন সেই ভাষায় আমি জলপাইগুড়িতে মৃণালিনীদিকে কথা বলতে শুনেছি। মৃণালিনীদি থাকতেন জলপাইগুড়িতে আমাদের পাড়ায়। ছোটবেলা থেকে ওঁকে একই চেহারায় দেখেছি। পড়াশোনা হয়নি, ভাইদের সংসারে খাটেন। বিয়ে কেন হয়নি জানি না। কলকাতায় পড়তে আসার দু'বছর পর একদিন মৃণালিনীদির সঙ্গে দেখা। পিসীমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছিলেন বিকেলে। গরমের ছুটিতে গিয়েছি আমি। দেখেই বললেন, 'কিরে বাড়িতে ঠিকমত চিঠি দিস না কেন? কলকাতায় গিয়ে কি যে করে বেড়াচ্ছিস তা তুই জানিস।'

কলম্বাস ওয়াহিও এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন যখন উঠল আকাশে তখনও আমার মাথায় জুলি নামটা পাক খাচ্ছে। ওয়াশিংটনের হোটেলেও ও আমাকে ফোন করেছিল অতদূর থেকে। কিন্তু ফোন করছে যখন আমি থাকছি না কিংবা পৌঁছাচ্ছি না এমন সময়ে। ভদ্রমহিলার সম্পর্কে কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কেন্ট বলল, 'ওই ওয়ালি লোকটা গোলমেলে, না?'

চমকে উঠলাম। আমরা গাড়িতে বসে বাঙলায় কথা বলেছিলাম। কেন্টের তা বোঝার উপায় নেই। কিন্তু ব্যাপারটা ও ধরল কি করে? জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি বুঝলে কি করে?' লজ্জা পেল কেন্ট, 'সিক্সথ সেন্স।'

'বাংলা বোঝ?'

'নো, নো। কিন্তু শিখতে চাই।'

'কেন?'

'আমার বন্ধু যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে এসকর্ট করেছিল সে কয়েকটা বাংলা শব্দ পিক্ আপ করেছে। রিয়েলি সুইট।'

'তুমি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখেছ?'

'হ্যাঁ। চমৎকার ভদ্রলোক।' কেন্ট চোখ বন্ধ করল।

শিকাগো এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে কেন্ট বলল, 'এখানে আমরা গাড়ি নেব না। একটা রাত তো থাকব মোটে। তোমার আপত্তি আছে?'

শিকাগোতে আমি এসেছি এদের বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যেখানে প্রফেসর এডওয়ার্ড ডিসক কাজ করেন। শিকাগোতে আসার আর একটা কারণ সেই বাল্যকাল থেকে শুনে আসা গল্প, স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতেই প্রথম বাঙালি বাগ্মী হিসেবে বক্তৃতা দেন। বাগ্মী শব্দটিতে অনেকের আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু ওঁর আগে আমি কোনো বাঙালির নাম শুনিনি যিনি নিজস্ব বক্তব্য অমন সুচারু ভাষা ও ভঙ্গিতে বিদেশে রেখেছেন।

এয়ারপোর্টের বাইরে আসামাত্রই মনে হলো হাওয়া নয়, যেন ঝড় বইছে। শিকাগো একসময় ছিল নিগ্রোদের শহর। কিন্তু এয়ারপোর্টে যেসব ট্যাক্সিওয়ালা দেখছি তাদের চেহারা এশিয়ানদের মতো। তারই একটায় উঠলাম আমরা। সরকার হোটেল ঠিক করে রেখেছেন।

লোকটা মাঝবয়সী, চটপটে। ইঞ্জিন চালু করেই জিজ্ঞাসা করল, 'আর ইউ বাংলাদেশী।' কেন্ট জবাব দিলো, 'নো, হি ইজ ইন্ডিয়ান।'

'আই সি। সাব, আপ কৌন প্রভিন্সকা আদমি ?'
'ওয়েস্ট বেঙ্গল।'
'কলকাত্তা ?'
উত্তরটা শুনে খুব সন্তুষ্ট। বলল আমি দুবার গিয়েছি ওখানে। আমার দাদা ফিল্ম প্রোডিউসার, বম্বেতে থাকে। আমি আমেরিকায় এসেছিলাম ভাগ্য খুঁজতে।'
জিজ্ঞাসা করলাম, 'পেয়েছ ?'
'অল্পস্বল্প। ট্যুরিস্ট হয়ে এসেছিলাম। ভিসার টাইম শেষ হয়ে গেলে সরকার আমাকে এ্যারেস্ট করল। কেস চলল একবছর। আমেরিকার এক একটা স্টেটে এক এক রকম আইন। শিকাগোর আইন হলো কেস চলার সময় এখানেই থাকতে হবে। একমাস জেল হলো। তারপর সাতদিনের নোটিশ দিলো চলে যাওয়ার জন্যে।' লোকটা গাড়ি চালাতে চালাতে শিস দিলো।
একপাশে সমুদ্র রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি শহরের দিকে। হাওয়া বইছে খুব। জিজ্ঞাসা করলাম 'তারপর কি হলো ?' ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, 'গেলাম না। ওঁরা আবার ধরল। আবার কেস। জামিনে ছাড়া পেলাম কিন্তু নিজের নামে কোনো কাজ করতে পারতাম না। এবার তিনমাস জেল আর তিনদিনের নোটিশ ?' লোকটা আবার শিস দিতে লাগল। আচ্ছা মানুষ! কেবলই কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়ে চুপ করে যাচ্ছে। আমি প্রশ্ন করতেই বলল, 'এবার তিনদিনের মধ্যে একটা সাদা মেয়েকে বিয়ে করে ফেললাম। পেপার ম্যারেজ। সে আমার সঙ্গে থাকবে না। শুধু প্রতিমাসে আমাকে দু'শ ডলার করে দিয়ে যেতে হবে। পুলিশ ধরলে বললাম, 'আমি বিবাহিত। আমার বউ এদেশের নাগরিক। তাকে ছেড়ে যাব কি করে ?' কোর্ট আমার পেপার বউকে প্রশ্ন করে ছেড়ে দিলো আমাকে। তারপর থেকে রয়ে গেছি শিকাগোতে। ট্যাক্সি চালাই, ছোট্ট একটা দোকান আছে।'
'তোমার বউ ?'
'সে প্রতিমাসে এসে দু'শ ডলার নিয়ে যায়। এর মধ্যে দু'জনের সঙ্গে স্টেটুগেদার করে দুটো বাচ্চার মা হয়েছে। আমাকে ডিভোর্স না করলে তো ওদের বিয়ে করতে পারবে না।'
'তোমরা একসঙ্গে থাকছ না কেন ?'
'পাগল। একসঙ্গে থাকলে দু'শোর বদলে আটশো ডলার জলে যাবে প্রতি মাসে। হাজার হোক আমি বোম্বাই কা বাবু, আমাকে টুপি পরাবে কে ?'

১৫

শিকাগো শহরকে কেউ কেউ ঝড়ের শহর বলেন। দিনরাত সমুদ্র থেকে ঝড়ো বাতাস উঠে এসে শহরটাকে কাঁপিয়ে দেয়। লম্বা লম্বা বাড়িগুলোর ধাক্কা খেয়ে চাপা আওয়াজ তুলেই যাচ্ছে সমানে। সরকার নির্দিষ্ট হোটেলটিতে যখন আমরা পৌঁছলাম তখন শিকাগোয় রাত নেমেছে। হোটেলের সামনের রাস্তা পার হলেই ঢেউভাঙা সমুদ্রের অথৈ জলরাশি। সার্চ লাইটের আলো সমানে হাতড়ে বেড়াচ্ছে ঢেউগুলো। সামুদ্রিক হাওয়ার গন্ধ নাকে টেনে দশতলা হোটেলে ঢুকলাম। ট্যাক্সিওয়ালা যাওয়ার আগে বলল, 'আপনাকে আমার খুব ভালো লাগল। কাল সকালে একবার আসব।' লোকটাকে বেশ মজার মনে হচ্ছিল। পাশপোর্ট ভিসা ছাড়া বছরের পর বছর শিকাগোতে থেকে যাচ্ছে। লোকটা গল্প শেষ করেছিল এই বলে, 'বুঝলেন, শিকাগো এমন একটা স্টেট যেখান থেকে কাউকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় না।'

হোটেলের রিসেপশনে পৌঁছাতেই ইউনিফর্ম পরা মহিলাটি পরিচয় পেয়ে চাবি আর দুটো স্লিপ এগিয়ে দিলেন। একটি স্লিপে প্রফেসর ডিমকের নাম লেখা, দ্বিতীয়টিতে, কি আশ্চর্য, সেই লস এ্যাঞ্জেলসের জুলি। এখানেও ফোন করেছিল। সময় বিকেল তিনটেতে। রিসেপশনিস্ট বললেন, 'দুজনকেই বলে দেওয়া হয়েছে যে আপনি এখনও আসেননি।'

কেন্ট চলে গেল ওর ঘরে। লিফটে ওপরে উঠে এলাম। এই ধরনের হোটেলের ঘরগুলো একই রকমের হয়। জিনিসপত্র রেখে বাথরুমে যেতে না যেতেই ফোন

বাজল। তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এসে রিসিভার তুলতেই বাংলা শুনতে পেলাম,
'মিস্টার মজুমদার বলছেন ?'
'হ্যাঁ। আপনি ?'
'আমি ডিমক, এডওয়ার্ড ডিমক।'
'ওহো, নমস্কার। আপনি ফোন করেছিলেন হোটেলে এসেই শুনলাম।'
'হ্যাঁ। আপনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এখন। আমরা কি আগামীকাল সকালে সাক্ষাৎ করতে পারি ? আপত্তি না থাকলে আপনি আমার সঙ্গে ব্রেক-ফাস্টও করতে পারেন।'
'না না। আমি খুশি হব।'
'বেশ। তাহলে এখন রাখছি।'
কিছুক্ষণ বাদে খেয়াল হলো ভদ্রলোক আমেরিকান। অথচ কথা বললেন স্পষ্ট বাংলায়। এই মানুষটিকে দেখবার ইচ্ছে ছিল অনেকদিন। শুনেছি আমেরিকায় বসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে চর্চা এবং প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন উনি। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলীর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে এই বৃদ্ধের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে উনি ব্যস্ত।
একটু বাদেই কেণ্ট টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করল, 'নটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। ডিনার করবেন ?' সেই মুহূর্তে খেতে ইচ্ছে করছিল না। কেণ্টকে সেটা জানাতেই ও বলল কাল সকালে দেখা হবে। ভারি পর্দা সরিয়ে দিতেই সমুদ্র দেখতে পেলাম। বাইরে এখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হবেই। হোটেলে ঢোকার সময় সেটা টের পেয়েছিলাম। সমুদ্রের ওপর অন্ধকার ঝুলছে, সার্চ লাইটের আলো সেটা চিরে চিরে যাচ্ছে। আমার পায়ের তলায় পুরু কার্পেট। অত্যাধুনিক স্টাইলের আস-বাব এই ঘরে। আমি, স্বর্গ-ছেঁড়া চা বাগানের সেই আমি কখনও ভাবতে পেরেছি এইখানে এসে দাঁড়াব ? লম্বা ঘরের শেষ প্রান্তে টিভি সেটটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওপরেই প্রোগ্রাম চার্ট রয়েছে। তুলে নিয়ে চোখ বোলাতেই নজরে এল আর মিনিট পাঁচেক বাদে ডাস্টিন হফম্যানের 'টুথসি' দেখানো হবে। ছবিটা সম্পর্কে অনেক শুনেছি কলকাতায়। কিছুদিন আগে বম্বে-ফিল্ম উৎসবে গিয়েছিলাম। শ্রদ্ধেয় পরিচালক তপন সিংহ আর আমি একটা বিরক্তিকর ছবি না দেখতে পেরে হল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। তপনদা সময় কাটানো এবং আড্ডা মারার জন্যে আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন তনুজার বাড়িতে। মহিলা তখনও সুন্দরী। বাংলা বলেন অল্পস্বল্প। কিন্তু খোঁজ খবর রাখেন বেশ। তনুজার মুখে 'টুথসি'র গল্প শুনেছিলাম। ভারতবর্ষে তখনও রিলিজ করেনি ছবিটা। ডাস্টিন হফম্যান ওই ছবিতে এক মহিলার ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন। তনুজা সেটা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'ফ্যাণ্টাস্টিক'।
টিভি'র নব টিপতে গিয়ে থমকে গেলাম। দিল্লির স্মৃতি মনে পড়ল। সেখানে টিভি না খুলতেই বেরুবার সময় পয়সা চেয়েছিল। হোটেলের ঘরে যে টিভি থাকে তা চালালে নিশ্চয়ই পয়সা দিতে হয়। ডলারে তার পরিমাণ কত হবে ?

বঙ্গ সন্তান অস্বস্তিতে আক্রান্ত হলে পিছিয়ে যায়। আমি ব্যতিক্রম হলাম না। বদলে গায়ে ভারি জামাকাপড় চাপিয়ে দরজায় চাবি লাগিয়ে বেরিয়ে এলাম। লিফটে নিচে নামতেই দেখি ওপাশের রেস্টুরেন্টে খুব জোর খাওয়া দাওয়া চলছে। দারোয়ানের সেলাম কুড়িয়ে বাইরে পা বাড়াতেই মনে হলো শরীরে বরফ ঢুকে গেল। রাস্তা ফাঁকা। মাঝে মাঝে হুসহাস গাড়ি ছুটছে। হাওয়ার তেজ আরও বেড়েছে। দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাফলারটা নাকের ওপর দিয়ে পেঁচিয়ে একা হাঁটতে লাগলাম। দোকানপাট বন্ধ। রাস্তাটা পেরিয়ে এপাশের ফুটপাতে আসতেই সমুদ্রটাকে দেখতে পেলাম। অন্ধকারে সমুদ্রকেও বড় নির্জীব মনে হয়। আর এই সমুদ্রে যেহেতু ঢেউ-এর শাসানি নেই তাই বেশ পোষা মনে হচ্ছিল। হাঁটলে শরীর গরম হয়। নাকের সে-বালাই নেই। ওটা আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কতটা দূর চলে এসেছি খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্ট চোখে পড়ল। অনেকটা আমাদের সুতৃপ্তির মতো। এবং তখনই মনে হলো খেয়ে নিলে মন্দ হয় না। দোকানে ঢুকতেই একটা হেঁড়ে গলায় চিৎকার শুনতে পেলাম। বিশাল চেহারার এক নিগ্রো মাতাল হয়ে চিৎকার করছে। আরও গোটা আটেক নিগ্রো নারী-পুরুষ অলসভঙ্গিতে বসে রয়েছে। বিশাল চেহারার নিগ্রো বলে যাচ্ছিল, ওরা শুনছে। উচ্চারণ এমন জড়ানো যে আমি বক্তব্যের বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছিলাম না। আমি যে ঢুকেছি তা কেউ লক্ষ্যই করছে না। ঘরে ঢোকার পর আরাম লাগছিল। আশেপাশে তাকিয়ে আমি একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। সামনেই টেবিল। তাতে এঁটো ডিস, মদের গ্লাস ছড়ানো। ওপাশে দুই বৃদ্ধা নিগ্রো খেতে খেতে চিৎকার শুনছে। আমার পাশে আর এক বৃদ্ধ নিগ্রো বসেছিল। সে খুব মাথা নাড়ছিল চিৎকার শুনতে শুনতে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আমাকে জড়ানো ইংরেজিতে বলল, 'সাম আজ নির্ঘাৎ খুন হয়ে যাবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

'সাম কে ?' চটপট জিজ্ঞাসা করলাম।

'আঃ। সামকে চেন না ? কোথায় থাকো তুমি ?' বলে আবার ওপাশে মন দিলো।

আমার ঠিক সামনের বৃদ্ধার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি হাসলেন, 'সাম ইজ এ নটরিয়াস চ্যাপ। ট্যাক্সি চালায়। বব ওর কাছে টাকা পায়, খেয়ে দাম দেয়নি।'

'বব কে ?'

'ওই যে, চেঁচাচ্ছে। এই রেস্টুরেন্টটা ওর।'

'টাকা দেয়নি বলে খুন করে ফেলবে ?'

'না, না। সাম বব-এর বউকে নিয়ে কাউকে না বলে মিয়ামিতে বেড়াতে গিয়েছে। কোনো পুরুষ সহ্য করবে ব্যাপারটা ? বব এমনিতে রাগে না—।' বলে তিনি বব-এর দিকে তাকালেন। বব তখন একটা রিভলভারে গুলি ভরছে। রেস্টুরেন্টে চমৎকার নীরবতার। শুধু বাইরের দরজায় হাওয়ায় শব্দ করে যাচ্ছে। ওপাশ থেকে কেউ সম্ভবত ববকে অনুরোধ করল শান্ত হতে। সঙ্গে সঙ্গে মোটা শরীর মুচড়ে তার দিকে ফিরে রিভলবার উঁচিয়ে ধরল বব। যা বলল তার অর্থ

এমন করে নেওয়া যায়, 'আর একবার উচ্চারণ করলে তোমার খুলি উড়িয়ে দেবো।'
সামনের বৃদ্ধাকে তার সঙ্গিনী বলল, 'এমন স্বামী থাকলে সব বউ পালিয়ে যাবে।'
বব-এর দুঃখ বুঝতে পারছিলাম। খাবার খেয়ে দাম না দেওয়া বেচারা সহ্য করেছিল। কিন্তু বউ নিয়ে পালানো সহ্য করা অসম্ভব। সাম লোকটাকে সমর্থন করা যায় না। এপাশের বৃদ্ধা বললেন, 'না বলে যাওয়াটা সত্যি অন্যায় হয়েছে।'
আমার পাশের বৃদ্ধ মুখ ঘোরাল, 'বাঃ, বলে গেলে সাত খুন মাপ। না ?'
'ঠিকই তো। আমি যদি কখনও যেতাম আর তুমি যদি অমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে তাহলে তোমার পা খোঁড়া করে দিতাম। খুব ববকে সমর্থন করা হচ্ছে, না ?'
'আমি কিছু বলেছি ?'
'মনে মনে বলছ। ব্যাটাছেলেদের আর চিনতে বাকি নেই। সবকটা সন্দেহবাগীশ, নিজে ফুর্তি করবে কিন্তু বউকে ছাড়বে না।' বৃদ্ধা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন, 'চল, আর নাটক দেখতে হবে না। আমার ঘুম পাচ্ছে।' বৃদ্ধ নিতান্ত অনিচ্ছায় টেবিল ছাড়লেন। বৃদ্ধার সঙ্গিনীও ববকে দেখতে দেখতে ওঁদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। এখন টেবিলে একা। এইসময় ববের নজর পড়ল আমার ওপর। ওর হাতে তখন রিভলবার, আমার দিকে তাক করা। চোখ না সরিয়ে পা ফেলে ফেলে বব আমার সামনে এসে দাঁড়াল, 'হু আর ইউ ?'
'ইন্ডিয়ান।'
'ইন্ডিয়ান ?' বব সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'শো মি ইওর আইডি।' লোমশ একটা কালো হাত আমার মুখের সামনে এগিয়ে এল। প্রতিবাদ করে লাভ নেই, পাশপোর্টটা পকেট থেকে বের করে ওকে দিলাম। কয়েকটা পাতা উল্টে আবার আমার ছবির সঙ্গে আমাকে মেলালো বব। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'আমি তোমাকে কখনও দেখিনি। এই রেস্টুরেন্টে কোনো ফরেনার খেতে আসে না। আমার মনে হচ্ছে তুমি সাম-এর এজেন্ট।'
বাধ্য হয়ে পকেট থেকে সেই কার্ডটা বের করে দিলাম যেটা ওয়াশিংটনে আমাকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে লেখা রয়েছে আমাকে সাহায্য করলে প্রেসিডেন্ট রেগন খুশি হবেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখের চেহারা পালটে গেল বব-এর। রিভলবার টেবিলে রেখে আমার পাশপোর্ট আর কার্ডটা ফেরত দিয়ে উল্টোদিকের চেয়ারে বসে বলল, 'সরি বস্। আসলে আমার মাথা ঠিক নেই। কী খাবে বল ? আচ্ছা আমি ব্যবস্থা করছি।'
মনে হলো ভূতগ্রস্ত কোনো মানুষকে ওঝা ঝাড়ফুঁক করে সুস্থ করলে যে আচরণ মানুষটি করে বব এখন তাই করছে। আমার জন্যে তিন কোর্সের মেনু এল। বব এসে বসল সামনে, 'সাম্-এর মতো বিশ্বাসঘাতক লোক আমি জীবনে দেখিনি। তুমি কিছু মনে কর না, আমি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি তখন ওকে

মেরে ফেলবই। আমি ওর কাছে পাই সত্তর ডলার। কিন্তু আমার বউকে নিয়ে বাইরে চলে গেল না বলে!'

'দোষটা তো তোমার বউ-এরও।'

'ঠিক। তবে কি জানো মেয়েদের মাথায় সব সময় বুদ্ধি খোলে না। একবছর ধরে ও আমাকে বলছিল মিয়ামিতে বেড়াতে নিয়ে যেতে। আমার বাবা শিকাগোর বাইরে যেতে একদম ভালো লাগে না। সাম নিশ্চয়ই মিয়ামির গল্প বলে ওকে খুব তাতিয়েছিল। ব্যস্!' কাঁধ ঝাঁকালো বব। লোকটার চেহারা এবং মুখের গড়ন গরিলার মতো। বোঝাই যাচ্ছে রাগে ফুঁসছে সে। অন্যান্য খদ্দেররা ববকে নড্ করে করে বেরিয়ে গেল একসময়। খাওয়া শেষ করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দোকান কতক্ষণ খোলা থাকবে?'

বব বলল, 'বারোটা। লাস্ট ফ্লাইটের সময়টা দেখি।'

বলতে না বলতেই দরজা খুলে গেল। একজন লম্বা সুন্দর শরীরের অধিকারিণী কালো মেয়ে একটা স্যুটকেস হাতে নিয়ে দোকানে ঢুকেই চিৎকার করে উঠল, 'হা-ই বব।' সে দুটো হাত এমনভাবে ওপরে ছুঁড়ল যে স্যুটকেসটা পড়ে গেল নিচে সশব্দে। এক দৌড়ে আমাদের টেবিলের কাছে পৌঁছে মেয়েটি গলা জড়িয়ে ধরল বব্-এর। অবাক হয়ে দেখলাম চুম্বনের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সেই সঙ্গে উমম্ উমম্ শব্দ। ইনিই তাহলে মিসেস বব যিনি মিয়ামি ঘুরে এলেন। অর্থাৎ এখনই ওই রিভলবার থেকে গুলি বেরুবে এবং আমি একটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখব। আতঙ্কিত হয়ে পকেট থেকে ডলার বের করে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'খাবারের দাম কত দিতে হবে?' বব আমার দিকে তাকালোই না। যে অবস্থায় বসেছিল তার পরিবর্তন হলো না। তখনও তাকে দু'হাতে জড়িয়ে মাথায় মুখ ঘষছে মেয়েটি, 'ইউ আর সুইটি, উমম্, রাগ করো না লক্ষ্মীটি, আমি তোমাকে চটিয়ে দিতে সাম্-এর সঙ্গে বোস্টনে গিয়েছিলাম মাকে দেখতে। আমি মায়ের কাছে ছিলাম, সাম হোটেলে ছিল। তোমার কাছে সাম তো নস্যি।' খুব খিলখিলিয়ে হেসে নিয়ে বলল, 'আমি ওকে বলেছি বব্-এর ডলার শোধ না করা পর্যন্ত রেস্টুরেন্টে ঢুকবে না।' মেয়েটি দুই হাত ছেড়ে দেওয়া মাত্র বব ঢলে পড়ল টেবিলের ওপর। চোখ বন্ধ মুখটা যেভাবে পড়ল তাতে আমি চিৎকার করে উঠলাম। মেয়েটি তখন খোলা মুখে হাত দিয়ে থরথরিয়ে কাঁপছে। বব মারা গিয়েছে।

মেয়েটা আবার ঝাঁপিয়ে পড়তেই বব্-এর মাথাটা বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ল। অতবড় বিশাল শরীর এখন লতপত করছে মেয়েটার দু'হাতের বাঁধনে। একটা লোক মারা গেল আচমকা? হার্ট ফেল? মেয়েটাকে ঢুকতে দেখেই কি রাগি বব হার্ট ফেল করল? প্রশ্নগুলো মাথায় আসামাত্র দেখলাম মেয়েটি দৌড়ে দরজার কাছে চলে গেল। তারপর স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে। আর সঙ্গে সঙ্গে আর এক ধরনের ঠান্ডা আমাকে গ্রাস করল। মেয়েটা পালালো কেন? ও যে এখানে এসেছিল তার কোনো প্রমাণ বলতে একমাত্র আমি। আমাকে যেহেতু চেনে না তাই সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারে

যে সে এখানে আসেনি। কিন্তু আমি কী করব? বব-এর মৃতদেহ সামনে নিয়ে বসে থাকাটা কি ঠিক? আমার কি উচিত নয় চিৎকার করে সবাইকে ডাকা? কিন্তু তাদের বলতে হবে স্ত্রীকে দেখে হার্ট ফেল করেছে বব। যদি ওর স্ত্রী অস্বীকার করে তাহলে আমি কিভাবে বিশ্বাস করাবো? এই মৃত্যু স্বাভাবিক কিনা তদন্ত করতে নিশ্চয়ই পুলিশ আসবে। পকেটে যতই প্রেসিডেন্টের নাম লেখা কার্ড থাকুক তদন্ত হলে আমি জড়িয়ে পড়বই। এইসব ভাবতে কয়েক সেকেন্ড সময় লেগেছিল। চটপট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। জানি, যে মানুষটা আমাকে যত্ন করে খাইয়েছিল, স্ত্রীর জন্যে যার বুকে কষ্ট ছিল, তার মৃতদেহ এভাবে ফেলে রেখে যাওয়াটা অন্যায়। কিন্তু এদেশের আইন-কানুন না জেনে জড়িয়ে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, এই বোধ তখনও আমার সক্রিয়। রিভলবার পড়ে আছে সামনে, মৃতদেহ নিয়ে আমি একা রেস্টুরেন্টে, যে কেউ দেখলেই তার চোখে আমি খুনী হয়ে যেতে পারি। ভাবনাটা মাথায় আসামাত্র আর দাঁড়ালাম না। চটপটে পায়ে দরজা ঠেলে বাইরে বেরুতেই তীব্র শীতল হাওয়ার ঝটকা পেলাম। মাথা নিচু করে হোটেলের দিকে পা বাড়াতেই দেখলাম একটি লোক শিষ্ দিতে দিতে এগিয়ে আসছে রেস্টুরেন্টের দিকে। দ্রুত তাকে পেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম। সম্ভবত সেটা হাঁটা নয়, দৌড়াচ্ছিলাম বলাই ঠিক হবে। রাস্তা পেরিয়ে উল্টো ফুটপাতে চলে এলাম। এখান থেকে আর রেস্টুরেন্টটাকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সেইসময় ঠক্‌ঠক্ শব্দ কানে বাজল। শব্দটা যেন আমাকে অনুসরণ করছে। মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই মনে হলো আমি জমে গেলাম। বব্-এর বউ আমার দিকে এগিয়ে আসছে স্যুটকেস নিয়ে।

কী করব বুঝতে না পেরে বাঁ দিকের গলিতে ঢুকে পড়লাম। কোথায় যাচ্ছি জানি না কিন্তু মনে হলো মহিলাকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। রাস্তা নির্জন। শিকাগোতে সম্ভবত নেড়ি কুকুরও নেই। মহিলা আমাকে ধরে ফেললেন.

'এক্সকিউজ মি!'

না দাঁড়িয়ে উপায় নেই তবু আমি চলতে চলতেই বললাম, 'ইয়েস।'

মহিলা ততক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, 'ডু ইউ নো মি?'

'নো। কী করে জানবো?'

'আপনি কি আজই প্রথম ওই রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

মহিলা যেন সশব্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন, 'বব মারা গিয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু আপনি ছাড়া কেউ জানে না আমি রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম।'

'সেটা ঠিক কথা।'

'বব কি আমি যাওয়ার আগেই মারা গিয়েছিল?'

চমকে উঠলাম। কী বলতে চায় মেয়েটি। মাথা নাড়লাম, 'না।'

'ও। স্যুটকেস নিয়ে আমি গিয়েছিলাম এটা কি আপনি কাউকে বলবেন?'

'পুলিশ যদি আমাকে জিজ্ঞসা না করে।' হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে বলতে আমি আবিষ্কার করলাম যে হোটেলের রাস্তা আমি হারিয়ে ফেলেছি। ওপাশে একটা জিপ আসছে হেডলাইট জেবলে। মেয়েটি অস্ফুটে বলে উঠল, 'পোলিস্।'

জিপটাকে পুলিশের বলে মনে হচ্ছিল না। শুধু মাথার ওপর আলোর দপ-দপানি বলে দিচ্ছে এটির পরিচয়। এতরাত্রে আমাকে একজন নিগ্রো মহিলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জেরা আরম্ভ করবে না তো! ওরা যদি থানায় নিয়ে যায় এবং ইতিমধ্যে বব্-এর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়ে থাকে তাহলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু জিপ থামল না। বাঁক ঘুরে ওটা অন্যদিকে চলে গেল।

মহিলা চাপা গলায় বললেন, 'কোথায় থাকেন বলতে অসুবিধে আছে?'

হৃদপিন্ড নড়ে উঠল। আমার ঠিকানা জানতে চাইছে কেন? মতলবটা কী?

বললাম, 'আমি এই শহরে আজ এসেছি কাল চলে যাব। আমাকে নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।'

'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। বিড় বিড় করলেন মহিলা।

আমি হাঁটতে লাগলাম। মহিলা তখনও ফুটপাতে স্যুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। খুব খারাপ লাগল। স্বামীকে তিনি ভালবাসেন কিনা জানি না কিন্তু এই মুহূর্তে তো তিনি নবীনা বিধবা। হঠাৎ আর একটা কথা মনে এল। ওয়াশিংটনে আমি কালো মেয়েকে এসকর্ট হিসেবে চেয়ে পাইনি আর ভাগ্যের এমন লীলা যে একজন কালো মেয়েকে মাঝরাত্রে ছেড়ে পালাতে হচ্ছে আমাকে।

প্রায় দেড়ঘণ্টা তীব্র হাওয়ায় কাটিয়ে যখন হোটেল খুঁজে পেয়ে নিজের বিছানায় চলে এলাম তখন আমার নাকে কোনো সাড় নেই। ঠান্ডায় জমে গেলেও সমস্ত মনে তীব্র অস্বস্তি কাজ করছিল। ঘুমের কোনো বালাই নেই। বাথরুমে গিয়ে গরম জলে মুখ ধুলাম। কম্বলের তলায় শুয়ে অন্ধকার ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বব-এর মুখটা সমস্ত ঘরে যেন সাঁটা। লোকটা কেন মারা গেল? স্ত্রীকে দেখে কি ওর আনন্দ হয়েছিল? মারা না গেলে কি বব্ স্ত্রীকে খুন করত? কিন্তু স্ত্রী বাহুবন্ধনের থেকে মুখখানা কেমন হয়ে গিয়েছিল ববের।

টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙলো। ঘুম ভাঙাবার সময় টেলিফোনগুলো যতই আধুনিক হোক কানে কর্কশ ঠেকে। হাত বাড়িয়ে রিসিভার টেনে নিয়ে জানান দিতেই ওপাশের নারীকণ্ঠ মার্কিনী ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল আমি সমরেশ মজুমদার কিনা। উত্তরটা জানার পর বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে যা বললেন তা হলো আমি আসছি একথা প্রফেসর ডিমকের মুখে ইনি শুনেছেন। ইন ফ্যাক্ট, আমার সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছে তাঁর। নাম সুচারিতা। তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা নিয়েই রয়েছেন। এতকাল প্রফেসর ডিমকের সঙ্গে, এখন একাই থাকেন। সুচারিতা জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

সাড়ে আটটা নাগাদ তাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে গরম জলে স্নান করে পোশাক পালটে চুলে চিরুনি দিতে দিতে গতরাতের কথা ভাবছিলাম। বব্-এর মৃত্যুর তদন্ত কি পুলিশ শুরু করেছে? আমার উপস্থিতি কি ওরা জানতে পারবে? রাত্রে যারা রেস্টুরেণ্টে ছিল তারা বেরিয়ে যাওয়ার আগে দেখেছে আমি আর বব কথা বলছি। আর আমি যে ভারতীয় তা বব্-এর উঁচু গলায় জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় জেনে গেছে। একেবারে হাড়ের ভেতর কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ল। এবং তখনই দরজায় শব্দ হলো। কেন্ট? না পুলিশ? আড়ষ্ট পায়ে দরজা খুলতেই দেখলাম শীর্ণ চেহারার স্যুট পরা এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধের মুখে লাল-সাদায় মেশানো দাড়ি, মাথায় চুল কম কিন্তু হাসিটি বড় স্নিগ্ধ। হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্টার মজুমদার?'

ওঁর বাড়ানো হাতে হাত রেখে বললাম, 'আপনি যে হোটেলে আসবেন ভাবতে পারিনি প্রফেসর।'

'কারণ? আমেরিকার এতো আকর্ষণীয় জিনিস ছেড়ে দিয়ে যে মানুষ একজন বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে দেখা করতে শিকাগোতে আসেন তাঁর কাছে আমি তো হাজারবার যাব।'

প্রফেসর ডিমক খুব ধীরে ধীরে এসে বসলেন, 'আপনি তৈরি হয়ে নিন।'

আমার তখন শুধু জুতো পরা বাকি। সেটা পরতে পরতে জিজ্ঞাসা করলাম 'শরীর ভালো আছে আপনার?'

'আমি এমন একটা বয়সে পৌঁছেছি যখন লড়াই করা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে থাকা যায় না। আমি আপনার ট্রিলজি পড়েছি। কালবেলার চেয়ে উত্তরাধিকার আমাকে ভীষণ টানে।' প্রফেসর বললেন।

আমি পাথর হয়ে গেলাম যেন। শিকাগো শহরে একজন আমেরিকান আমার মনের কথা বলছেন আমারই লেখা নিয়ে? উনি এতো হাজার মাইল দূরে বসে একজন সামান্য বাঙালি লেখকের লেখালেখির খোঁজ রাখেন? প্রফেসর বলছিলেন 'অনির যখন মা মারা গেলেন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। কিন্তু সব মিলিয়ে বাংলা গল্প উপন্যাস যেন আর আগের মতো ধারালো নেই। নতুন লেখকও বেশি পাচ্ছি না। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় হাসির লেখা লেখেন, বেশ ভালো, কিন্তু বেশিক্ষণ মনে থাকে না। আমার বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সময় উনিশশো কুড়ি থেকে ষাট। অফকোর্স রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে।'

সেদিন হোটেল থেকে বেরিয়ে রেস্টুরেণ্টে খেতে খেতে, সমুদ্রের ধারে প্রফেসরের গাড়িতে পাক খেতে খেতে এবং সব শেষে ওঁর ঘরে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বসে শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে কথা বলে গেলাম। ডিমক সাহেব একসময় বেশ কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন। সেই সুবাদে কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের অনেককেই চেনেন। তাঁর ইচ্ছে একেবারে সাম্প্রতিক বাংলা গল্প উপন্যাস পর্যন্ত ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে যাবেন মারা যাওয়ার আগে। এর মধ্যে সুচরিতার কথা উঠল। প্রফেসরের এক বিখ্যাত বাঙালি কবি অধ্যাপক বন্ধুর মেয়ে সুচরিতা। শিকাগোতে তাঁর কাছেই সুচরিতা ছিলেন এতকাল।

এখন একা হয়েছেন। প্রফেসর তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে জেনে নিলেন যে তিনি আমার জন্যে লাঞ্চের সময় ক্যান্টিনে অপেক্ষা করবেন। আমেরিকায় যেসব ছেলে-মেয়েরা লেখালেখি করে তারা খুব সহজেই প্রচারিত হতে পারে না। বড় পাবলিশার অথবা পত্রিকায় সুযোগ পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া এখন তো সবাইকে এজেন্সির মাধ্যমে আসতে হচ্ছে। লিটল্ ম্যাগাজিন আছে। নিজেদের লেখা ছাপাবার জন্যেই সেই পত্রিকা বের করে তরুণেরা। কিন্তু সেগুলো পাঠায় বড় পত্রিকা-সম্পাদক বা প্রকাশকের কাছে। কলকাতায় কোনো নবীন লেখক যদি মোটামুটি একটা ভালো গল্প লিখে দেশ পত্রিকায় পাঠিয়ে দেন তাহলে সেটা ছাপা হবেই। লক্ষাধিক পাঠকের সামনে পেঁছাবে। এইরকম গোটা তিনেক ভালো গল্প লিখলেই বড় কাগজের পুজো সংখ্যায় উপন্যাস লেখার সুযোগ পাওয়া যায় এখন। কারণ এদেশে গত কুড়ি বছরে কোনো শক্তিমান লেখক আসেনি। সম্পাদকরা কারো মধ্যে সামান্য ক্ষমতার ইঙ্গিত পেলেই সুযোগ দিচ্ছেন। সন্তোষকুমার ঘোষের কাছে শুনেছি যে তাঁর সময়ে খুব ভালো গল্প লিখেও পুজো সংখ্যা আনন্দবাজারে সুযোগ পাওয়া কিরকম অসম্ভব ব্যাপার ছিল কারণ সমস্ত মহারথীরা সেসময় লিখছেন। একবার সম্পাদক ঠিক করলেন একজন নতুন লেখকের গল্প ছাপবেন। অনেক ঝাড়াই বাছাই করে তিনজন নতুন লেখককে গল্প দিতে বলা হলো। যার গল্প সবচেয়ে ভালো হবে তাঁরটাই ছাপা হবে। সন্তোষকুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র নামে তিনজন নবীন লেখকের তিনটি গল্প পড়ে সম্পাদক এমন বিপাকে পড়েছিলেন যে সে বছর পুজো সংখ্যায় একটির বদলে তিনটি গল্প ছাপতে হয়েছিল। ওঁদের পরের যুগে এক ঝাঁক ক্ষমতাবান লেখক লেখার লড়াই চালিয়ে জায়গা দখল করেছিলেন। তারপরের মাঠ শূন্য। যাঁরা বড় কাগজে লেখার সুযোগ পান না বলে চিৎকার করেন তাঁদের নিরানব্বইজনই লিখতে জানেন না। নিজেদের প্রয়োজনেই বড় কাগজগুলো লেখক খুঁজছে সেখানে যাঁদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বলে নাকে কাঁদেন তাঁদের অপদার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু আমেরিকায় এই চেহারাটি ভাবা যায় না। নতুন লেখকের কোনো উপন্যাস প্রকাশ করা প্রাথমিক মনোনয়নের পর সম্পাদকীয় বোর্ডের কাছে পাঠান। বোর্ড অনুমোদন দিলে তা মাত্র দু'হাজার কপি ছাপা হয় স্যাম্পেল সার্ভে করতে, বুক স্ট্যান্ডে প্রদর্শনের জন্যে। সেই বই, লেখক সম্পর্কে পাঠকদের রিপোর্ট পাওয়ার পর লেখকের ভাগ্যে ব্যাপক প্রচার পাওয়া নির্ভর করে। মোদ্দা কথা, লড়াই ওখানে অনেক বেশি। তৈরি করা অহংকার নিয়ে ওখানে কেউ বাস করে না। অধ্যাপক আমাকে লাইব্রেরিতে নিয়ে গেলেন। বাংলা ভাষায় লেখা সব বই ওখানে আছে। কম্প্যুটার সেসব তথ্য মজুত রেখেছে। বাঙালি লেখকদের নামের তালিকায় আমারটিও আবিষ্কার করলাম। আমার নামের পাশের নম্বর আর বাংলা ভাষার প্রতীক নম্বর কম্প্যুটারে টিপতেই পর্দায় ভেসে উঠল সমস্ত তথ্য। আমার নাম, জন্ম তারিখ, ঠিকানা, বাবার নাম, কী কী বই এঁদের কাছে আছে তার বিশদ তালিকা। ম্যাজিকের

মতো ব্যাপারটা আমাকে মোহিত করল।

ক্যান্টিনের সামনে আমাকে ছেড়ে দিয়ে প্রফেসর ক্লাসে গেলেন। কথা হলো সুচরিতার সঙ্গে দেখা করে আমি তাঁর অফিসে গিয়ে অপেক্ষা করব। ক্যান্টিনটি পরিচ্ছন্ন। টেবিলে টেবিলে ছেলেমেয়েরা জমিয়ে গল্প করছে। একটা খালি টেবিলে বসলাম। খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। এই সময় সুচরিতা এলো। খাটো চেহারার প্যান্ট সার্ট পরা মেয়েটি খুব স্মার্ট গলায় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। ওর ইংরেজি উচ্চারণ মার্কিনীদের মতনই। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে সে বলল, 'এতো ব্যস্ত যে আপনাকে সময় দিতে পারছি না।'

হেসে বললাম, 'আমি তো সময় চাইনি।'

'আপনি কবে দেশে ফিরছেন?' প্রশ্নের উত্তরে আনুমানিক সময়টা জানালাম। সে সিগারেট ধরাল। তারপর একটা বড় মুখবন্ধ খাম এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ওপরে ঠিকানা লেখা আছে। দয়া করে এটা যদি দেশে পৌঁছে দেন খুব খুশি হবো।'

আপত্তি করার কিছু নেই। কথাবার্তা প্রফেসর ডিমকের ওপর ঘুরে এলো। এবং আমি জানলাম ডিমক ক্যানসারে আক্রান্ত। অনেকদিন থেকেই রোগটির সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছেন। হতভম্ব হয়ে গেলাম। সুচরিতা চলে যাওয়ার আগে বলল, 'একটা কথা, আমি যে সিগারেট খাচ্ছি দেশে গিয়ে বলবেন না।' খুব খারাপ লাগল। যে মেয়ে একা আমেরিকায় শিক্ষিত হচ্ছে সে তো সিগারেট খেতেই পারে। কিন্তু তার মানসিকতা হিতমপুরের গাঁয়ের মেয়ের মতো হবে কেন? নাকি আমাকেই খুব গেঁয়ো ঠাওরালো। আমার প্লেন ধরার সময় হয়ে গেছে। হোটেলে ফিরে কেন্টকে নিয়ে বেরুতে হবে। অধ্যাপক ডিমক আমাকে নিয়ে বারান্দা দিয়ে হাঁটছিলেন। হঠাৎ একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এখানে একজন লেখক আছেন। আলাপ করবেন?' মাথা নাড়লাম, 'না। কারণ উনি আমার লেখা কখনই পড়বেন না। আলাপটা হবে কোন স্তরে?' ডিমক হাসলেন। বিদায় নেবার আগে আমি আচমকা ওঁকে প্রণাম করে ফেললাম। বাংলা ভাষায় একজন নীরব সেবককে প্রণাম না করে আমার উপায় ছিল না। তিনি জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন, 'জীবনে প্রথমবার কেউ আমাকে প্রণাম করল সমরেশ।' তারপর শান্ত হয়ে বললেন, প্রণাম করেছ সেই অধিকারে বলছি, কখনও কারো সঙ্গে কমপ্লেক্স নিয়ে মিশবে না। একজন লেখককে উদার হতে হবে। তুমি সল বেলোর সঙ্গে দেখা করতে পারতে। হি ইজ নট দ্যাট টাইপ। ওই লেখকটির নাম সলবেলো।'

১৬

সারাদিন অধ্যাপক ডিমকের সঙ্গে কাটানোয় কেন্টের খবর নেওয়া হয়নি। হোটেলে ফিরে দেখলাম সে রিসেপশনে আমার জন্যে নোট রেখেছে, এলেই যেন ফোন করি। ডেস্ক থেকেই ফোন করলাম। লোকটা সম্ভবত সারাদিনই আমার জন্যে ঘরে বসে ছিল। সাড়া দিয়ে বলল, সে এখনই নেমে আসছে। গতরাতেও দেখেছি, এই দুপুরেও, হোটেলের রিসেপশন, তার সামনের লবিতে মোটেই ভিড় নেই। বাঁ দিকের স্ট্যান্ডে খবরের কাগজ রয়েছে। তার দুটো টেনে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগলাম। না, বব্-এর মৃতদেহ আবিষ্কারের খবর কোথাও নজরে পড়ল না। আজ সারাদিন আমি যাই করি না কেন মনের ভেতরে কাল রাতের ঘটনাটা কাঁটার মতো বিঁধে রয়েছে। পুলিশ সম্ভবত এখনও আমার অস্তিত্ব টের পায়নি যা পাওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু একজন ভদ্রলোক হিসেবে আমারই উচিত ছিল ঘটনাটা পুলিশকে জানানো। এইসময় কেন্ট মুরহেড সামনে এসে দাঁড়াল, 'প্রফেসর ডিমকের সঙ্গে কেমন কাটল ?'

'চমৎকার। কিন্তু আমাদের প্লেন কখন ?'

'সময়টা একটু পিছিয়ে গিয়েছে। আমাদের হাতে এখনও একঘণ্টা সময় আছে।'

কথাটা শোনার পর ডিমক সাহেবের মুখ আর একবার মনে পড়ল। শিকাগো বিদ্যালয়ে ছুটে গেলে উনি কি আমাকে সলবেলোর ঘরে নিয়ে যাবেন ? না। তখন যা স্বাভাবিক ছিল এখন তা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কেন্ট বলল, 'তুমি তো শহরটা ভালো করে দেখলে না। দেখবে ?'

কিছুই যখন করার নেই তখন রাজি হলাম। ট্যাক্সি নিয়ে আমি ইচ্ছে করেই সে
দিক দিয়ে যেতে বললাম যেদিক দিয়ে গতরাতে আমি হেঁটেছিলাম। কিন্তু কি
আশ্চর্য, বব্-এর রেস্টুরেন্টটা আমার চোখে পড়ছে না। সত্যি শেষ পর্যন্ত খুঁজে
পেলাম না। কেন্ট আমাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করছিল আমি ঠিক কি খুঁজে পেতে
চাইছি কিন্তু আমি এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হলো গতরাতে যা ঘটেছিল
তার সবটাই কি বিভ্রম, আমার কল্পনায় তৈরি ? নইলে দিনদুপুরে একটা
রেস্টুরেন্ট উধাও হয়ে যায় কি করে ?

শিকাগো উইন্ডি সিটি, শিকাগো খুন জখমের শহর, শিকাগো কাউকে তাড়িয়ে
দেয় না। পরে জেনেছি ওই শহরে প্রতিদিন এত খুনজখম হয়ে থাকে যে সেগুলো
না কি খবরের কাগজগুলো ছাপে না যদি না তাতে কোনো ভি আই পি জড়িত
থাকে। হয়তো সেই কারণেই বব্-এর কপালে ছাপার অক্ষরে নিজের নাম ছাপানো
সম্ভব হলো না।

আর একটি ব্যাপারে আমার কিঞ্চিৎ মোহভঙ্গ হল। কলকাতা শহরের তিনশ
বছরের ইতিহাস আমাদের অনেকের মুখস্থ। কে কবে কি করেছিলেন তাও বলে
দিতে পারবেন অনেকে। বিদেশিদের ক্রিয়াকান্ডগুলো তো আরও বেশি মনে
রাখি। এর দুটো কারণ আছে। আমাদের ইতিহাস বইগুলো লেখা হয়েছে
বিদেশিদের পরিচালনায়। তাঁদের মতন করে তাঁরা আমাদের ইতিহাস পড়িয়েছেন।
ইতিহাস লেখকদের যে কোনো প্রকারে কিনে নেবার চেষ্টা তো পৃথিবীর সব দেশে
সব যুগেই হয়ে থাকে। আজ এদেশের ইতিহাস যদি সি পি এম সরকার লেখাতে
চান তো একরকম হবে আবার কংগ্রেস যদি ক্ষমতায় কখনও ফিরে আসেন এবং
ইতিহাস লেখান তো অন্যরকম হবে। তা আমরা আমাদের যা শেখানো হয়েছিল
তাই মুখস্থ করে সব কিছু মনে রেখে দিয়েছি। দ্বিতীয়ত, বাঙালির রোমন্থন
করার অভ্যেস ড্রাগের নেশার থেকেও তীব্র। এই স্মৃতি হাতড়ানো কিন্তু শেখানো
পথেই, বাস্তব অবাস্তব, সত্য অসত্য যাচাই না করে। এবং আমরা বাঙালিরা
এইসব ব্যাপার অন্যের মধ্যেও সমানভাবে আশা করি। মনোজ একদিন আমায়
বলেছিল, 'ভাবতে পারেন শ্বশুরবাড়ি থেকে টাকা আনেনি বলে মার্কিন বউকে
তার স্বামী পুড়িয়ে মারছে ? বাঙালি ছেলেদের মেরুদন্ডহীন করে রাখা হয়ে-
ছিল বলেই তাদের কিছু কিছু উজ্জ্বল প্রতিনিধি এখনও শ্বশুরবাড়িকে শোষণের
কাজে মা বাবার সঙ্গে হাত মেলান। যদি তোর বউকে পছন্দ না হয় তাহলে
ডিভোর্স কর। পুড়ে মরার চেয়ে বাঙালি মেয়েরা আলাদা হতে চাইবে না, এ
আমি বিশ্বাস করি না সমরেশ।'

এত কথা উঠল কারণ সেদিন ওই এক ঘণ্টায় আমি রাস্তায় যত কালো এবং সাদা
মানুষকে প্রশ্ন করেছি তাদের একজনও শিকাগোর ইতিহাসটা ঠিকঠাক বলতে
পারেননি। এটাও মেনে নিয়েছি। কলকাতার ফুটপাতে কাউকে ইতিহাস
জিজ্ঞাসা করলে হয়তো তোতলাবে। রাসবিহারী এভিন্যুতে দাঁড়িয়েও কেউ
হয়তো বলবেন যাঁর নামে রাস্তা তাঁর নাম শোনেননি। কিন্তু অক্ষমতা স্বীকার
করবেন না। শিকাগোর মানুষরা কিন্তু এব্যাপারে অকপট ছিলেন। কালোর

লেছেন, 'আমরা লিঙ্কনের কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের তেমন কোনো ইতিহাস
ই। ইংরেজরা এখানে এসে জুড়ে বসল, স্প্যানিশরাও তাদের অনুসরণ করল
ার আমরা অনেক বছর পর তাদের সঙ্গে মিশে গেলাম। না, আমাদের কোনো
িতিহাস নেই, থাকার মধ্যে রয়েছে বর্তমান।'
বং যে ব্যাপারটা আমাকে আর একবার দুঃখিত করেছিল তা হলো এঁরা কেউ
বেকানন্দের নাম শোনেননি। ১৮৯৩ সালের এগার থেকে সাতাশে সেপ্টেম্বর
র্যন্ত শিকাগো শহরে যে ধর্ম সম্মেলন হয় বাঙালি হিসেবে আমরা গর্বিত হই
ারণ, 'আশ্চর্যপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিতে উঠে সকলের মন হরণ
রে নিলেন, সারা শহর মুখরিত হলো তাঁর নামে।' সেই প্রথম ভারতবর্ষের
াইরে কোনো বাঙালি নিজেকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারলেন। ১৮৯৪ সালে
আমেরিকায় বসে যে মানুষ বলতে পেরেছিলেন, 'দাসব্যবসা রহিত হবার আগে
াদের যে অবস্থা ছিল, এখন তাদের অবস্থা শতগুণে মন্দ। দাস-প্রথা রহিতের
আগে হতভাগ্য নিগ্রোরা ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি ছিল, আর যেহেতু সম্পত্তি তাই
াদের রক্ষণাবেক্ষণ মালিকদের করতে হতো, পাছে ক্ষতি হয়। এখন তারা কারো
ম্পত্তি নয়—তাদের জীবনের কোনো মূল্য নেই—সামান্য ছুতোয় তাদের পুড়িয়ে
ারা হয়। গুলি করে মারা হয় তাদের—কিন্তু খুনিদের বিরুদ্ধে কোনো আইন
নই, থাকবে কি করে—তারা তো মানুষ নয়, জন্তু পর্যন্ত নয়—তারা নিগার।'
নে রাখতে হবে, বিবেকানন্দ যখন এইসব বাক্য উচ্চারণ করছিলেন তার পঞ্চাশ
ছর আগে হলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হতো অথবা পাথর ছুঁড়ে বা জ্যান্তই পুড়িয়ে
ারা হতো। আর যাদের সম্পর্কে এত বড় সত্য উচ্চারণ করলেন তিনি তারা যদি
একশ' বছর পার হবার আগে কাঁধ ঝাঁকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে, 'হু ওয়াজ হি ?'
াহলে আমাদের দুঃখ লাগতে পারে কিন্তু বাস্তব তো বাস্তবই। আমি জানি
া, হয় তো শিকাগো ধর্মসম্মেলন নিয়ে আমাদের দেশে যে প্রচার হয়েছে খোদ
শিকাগো শহরে তা হয়নি। আমেরিকান প্রেস বিবেকানন্দকে জায়গা দিয়েছিলেন
কিন্তু সেটাও হয়তো সেখানকার মানুষকে উদ্বেলিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল
া। যেহেতু আমাদের স্মৃতিতে আবেগ রয়েছে তাই আমরা বেশি মাত্রায় আপ্লুত
ই। কিংবা মনোজই হয়তো ঠিক বলেছিল, 'বড়লোকদের ড্রইংরুমে দাঁড়িয়ে
াঁচটা সত্য কিন্তু কঠোর কথা বলে এসেছি এই গর্বে গরিব সারাজীবন টগবগ
করতে পারে কিন্তু বড়লোক পরের সকালেই সেটা ভুলে যায়।'
শিকাগো এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন আকাশে উঠে এলে পা ছড়িয়ে বসলাম। একটা
জিনিস লক্ষ্য করছি, এখানকার এয়ারহোস্টেসদের সঙ্গে যাত্রীদের বেশ ভাবসাব
আছে। কেউ কেউ তো চেয়ারের হাতলে বসে গল্প করছে। যেন অনেকদিন বাদে
বন্ধুর সঙ্গে দেখা। অথচ কথাবার্তায় মালুম হলো এদের প্রথম সাক্ষাৎ এখনই।
কেটের মাধ্যমে মিনিট পনেরো ওদের বিরক্ত করে চললাম। কলকাতায় বসে
কল্যাণ বলেছিল প্লেনের টয়লেটে ঢুকে সাবান হাতিয়ে নিতে সুভেনির হিসেবে,
াও করেছি। তাসের প্যাকেট পেয়েছি বালিকাদের অনুরোধ করে। শিকাগো
থেকে লস-এঞ্জেলস টানা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার যাত্রা। কোথাও থামবে না। অতএব

পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে নেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু ঘুম আসছিল না
এ এক জ্বালা।

লস এঞ্জেলস এয়ারপোর্টে নেমে ঘড়ির কাঁটা ঘোরাতে হলো। সময় এই দেশে সব জায়গায় এক নিয়মে চলে না। যখন বেশ রাত নামবার কথা তখন বিকেল হচ্ছে লস এঞ্জেলসে। এয়ারপোর্টের কাছে বাড়ি-ঘরদোর থাকে না। এখানেও নেই। কোম্পানির বাসে চলে এলাম পার্কিং লটে। কেন্ট এখান থেকে কার্ড দেখিয়ে গাড়ি নেবে কয়েকদিনের জন্যে। অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম বাঁধানো চাতালে কয়েকশ' গাড়ি দাঁড়িয়ে। তাদের চেহারাতেই মূল্য মালুম হচ্ছে। মিনিট দশেক বাদে কেন্ট গাড়ি পেল। লম্বা শীততাপনিয়ন্ত্রিত। মালপত্র তার ডিকিতে তুলে দিয়ে ভেতরে বসতেই মনে হলো ফাইভ স্টার হোটেলের সোফায় বসেছি। গাড়িতে রেডিও এবং টিভি রয়েছে। কেন্ট অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে গাড়ির জঙ্গল পেরিয়ে হাইওয়ের দিকে এগোতে এগোতে আচমকা গালাগালি দিয়ে উঠল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আমি যদি গাড়িটা ঘুরিয়ে নিই তাহলে তুমি অখুশি হবে?'

'কেন? আবার ঘোরার কি দরকার

একটু লজ্জিত ভঙ্গি করল কেন্ট. 'আমার একটা ভুল হয়েছে। ব্রিফকেসটা ফেলে এসেছি ওখানে।' অতএব ফিরতে হবেই। কিন্তু খুশি হলাম। আমার এসকর্ট টির স্বভাব তাহলে আমারই মতন। স্বচ্ছন্দে এখন ওয়াশিংটনকে বলা যায় যে নিজের জিনিসের দায়িত্ব নিতে পারে না সে আমার দায়িত্ব নেবে কি করে? কিন্তু এমন অভিযোগ করার মতো মূর্খ আমি নই। কেন্ট না থাকলে আমি যে হাজারো ঝামেলায় পড়তাম তা এর মধ্যে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

লস এঞ্জেলস শহরের রাস্তাঘাট এবং পাড়াগুলোর নাম যতটা ইংরাজিতে তার বহুগুণ বেশি স্প্যানিশে। চট করে স্পেন দেশে এসেছি বলে ভুল করা বিচিত্র নয়। আমরা যাব লস-এঞ্জেলসের এক প্রান্তে, স্যান ডিমাসে। রাস্তাটার নাম এ্যাভেনিডা এন্টারাডা। মনোজের বন্ধু বনজ বসু থাকেন সেখানে। মনোজই চিঠিপত্র এবং টেলিফোনে ওঁকে আমার খবরাখবর জানানোর পর উনি উৎসাহিত হয়েছেন আমাকে আশ্রয় দিতে। এয়ারপোর্টেও আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু মনোজ নিষেধ করেছিল। বলেছিল, 'পথ চিনতে দাও সমরেশকে। নিজে নিজে না চিনে নিলে চেনা যায় না।' তখন অবশ্য ও জানতো না আমার সঙ্গে সরকারি গাইড থাকবে।

লস এঞ্জেলস শহরের মতো রাস্তায় এতো গাড়ি আমি কোথাও দেখিনি। না কলকাতায় না নিউ ইয়র্কে। পিঁপড়ের মতো থিকথিক করছে যেন। মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়তে হলেও বড়বাজারের জ্যাম কোথাও পাইনি। সন্ধে নামছে শহরে। কিন্তু ফুটপাতে কোনো লোক নেই। এখানে বোধহয় কেউ হাঁটাহাঁটি করে না। স্যান ডিমাসে পৌঁছাতে আমাদের প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ লেগে গেল। যে জিনিসটা এখানে এসেই টের পাচ্ছি তা হলো আবহাওয়ার আকাশ পাতাল ফারাক। অঙ্গের ধরাচুড়া ক্রমশ অসহ্য মনে হচ্ছে। গরমকালে দার্জিলিং থেকে

নেমে আসার সময় শুখনো পেরোলে যে রকম লাগে আমার অবস্থা এখন সেই-রকম। যদিও গাড়ির এয়ারকন্ডিশন্ড মেশিন চালু করেছে কেন্ট তবু একটার পর একটা শীতবস্ত্র খুলতেই লাগলাম।
স্যান ডিনাস অনেকটা টিলার মতো জায়গা। পাক দিয়ে দিয়ে উঠতে হয়। সারা শহরে এখন হীরের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ছে। অন্ধকার নেমেছে কিন্তু সেটা তিন নম্বর গয়লার চার নম্বর দুধের মতো পাতলা। বাড়ি খুঁজে পেতে বেশ ঘুরতে হলো। রাস্তায় কেউ নেই যে ডেকে জিজ্ঞাসা করব, 'দাদা, ষোলশ' এগারো নম্বর বাড়ি কোন-দিকে ?' পাড়ার ভেতরেও বিরাট চওড়া রাস্তা ছবির মতো ছিমছাম। দু'পাশে অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাগান আর বাড়ি। শেষ পর্যন্ত ষোলশ' এগার নম্বরের সামনে গাড়ি থামাতেই কাঁচের দরজা খুলে গেল। খাটো চেহারার শক্ত গড়নের এক ভদ্রলোক পাজামা পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে এসে দুটো হাত যুক্তকরলেন, 'নমস্কার। আজ নিশ্চয়ই রাস্তায় হেভি ট্র্যাফিক পেয়েছিলেন ?' মজা লাগল। যেন রোজই এইপথে আসছি এমন ভঙ্গিতে আজকের খবর জিজ্ঞাসা করছেন ভদ্রলোক। যে মানুষ প্রথম দর্শনেই এক অপরিচিতের সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলতে পারেন তার সঙ্গে জমে যেতে সময় লাগে না। মালপত্র নামিয়ে কেন্ট বলল, সে কাছাকাছি কোনো হোটেলে উঠবে। নিশ্চনই আজকের রাত্রে আমি বের হবো না। কাল সকালে ব্রেক ফাস্টের পর গাড়ি নিয়ে আসবে।
কেন্ট চলে যাওয়ামাত্র আর একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ির ড্রাইভারই রিমোট কন্ট্রোলে গ্যারাজের শাটার খুললেন। ততক্ষণ গাড়ির নাম্বার প্লেটে আমার নজর যাওয়ায় আমি প্রায় হতবাক। পরিষ্কার লেখা অঞ্জনা। বনজ বললেন, 'আপনি আসবেন বলে ও একটু বাজারে বেরিয়েছিল। কত দেরি করে ফিরল দেখুন।' ওই গাড়ির ড্রাইভার কাছে এসে নমস্কার করে বললেন, 'আমি অঞ্জনা, আপনি সমরেশবাবু ?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আমি ফিরে আবার শাটার না টানা গ্যারেজে সদ্য পার্ক করে রাখা গাড়িব নাম্বার প্লেট দেখলাম। সেটা লক্ষ্য করে বনজ বললেন, 'ওটা এঁর গাড়ি। একটু বেশি টাকা দিলে ডিজিটের বদলে লেটারে নাম্বার প্লেট পাওয়া যায়। তাই যার গাড়ি তার নামেই নাম্বার প্লেট করিয়ে দিয়েছি।'
অঞ্জনা মাথা হেলালেন, 'হলো ? সমরেশবাবু এর মধ্যে ব্যাপারটাকে আদিখ্যেতা বলে ভাবতে শুরু করেছেন।' ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বনজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, বউকে ভালবাসি এটা সবাইকে জানালে আদিখ্যেতা হবে কেন বলুন তো ?'
মাথা নেড়ে বললাম, 'আমি কিন্তু কিছুই বলিনি। মেয়েরাই আক্রান্ত হবার ভয়ে আক্রমণ করেন।' অঞ্জনা কিছু বলতে গিয়েও হেসে ফেললেন, 'নাঃ, বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই আপনার সঙ্গে ঝগড়া করব না। কিন্তু দাদা, আপনার লেখা পড়ে তো মনেই হয় না যে আপনি নারীবিদ্বেষী !' এবার চমকাবার পালা আমার। প্রথম কথা, অঞ্জনা লস-এঞ্জেলসে বসে আমার লেখা পড়ছে, এবং মেয়ে-দের সম্পর্কে আমি বিদ্বেষ পোষণ করি ? পিসিমা বেঁচে থাকলে দ্বিতীয়

মন্তব্যটি করার জন্যে কখনও অঞ্জনার সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না। অবশ্য এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। প্রথমটির ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করতে অঞ্জনা আমাকে ওদের স্ট্যাডি রুমের দরজায় নিয়ে গেলেন। চেয়ে দেখুন।'

দেখলাম একটি টেবিলে 'দেশ' পত্রিকার প্রায় পাহাড়। লস এঞ্জেলসেও তাহলে দেশ আসে। বনজ প্রসঙ্গটা আপাতত চালাতে দিলেন না। ও'দের এই বাড়ি দোতলা। চমৎকার সাজানো গোছানো। বনজদের দুই কন্যা এসে আলাপ করে গেল। চা খেতে খেতে জানলাম অঞ্জনার বাপের বাড়ি কলেজ স্ট্রিট এলাকায়। আমেরিকায় তার একটুও ভালো লাগছে না। কিন্তু মেয়েদের পড়াশোনা আর বনজের চাকরির জন্যে কেবল মন খারাপ করেই থাকতে হচ্ছে। দু'বছর অন্তর দেশে যান এঁরা। লস-এঞ্জেলসের ভারতীয় ক্লাবগুলোর সঙ্গে জড়িত। প্রায় শিল্পী আনিয়ে অনুষ্ঠান করেন। অঞ্জনা জানালেন, অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক ভাই এই শহরেই থাকেন।

আমার ঘর একতলাতেই। সুন্দর ছিমছাম। টয়লেটে গিয়ে আবার বিব্রত হতে হলো। ফ্ল্যাশের নব খুঁজে পাচ্ছি না। প্রায় মিনিট পাঁচেক খোঁজাখুঁজির পর পায়ের তলায় সেটিকে আবিষ্কার করলাম। আমেরিকায় এসে এই প্রথম আমি পাজামা পাঞ্জাবি পরলাম। বেশ আরাম লাগল। পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসতেই বনজ বললেন, 'একটু আগে আপনার ফোন এসেছিল। আপনি টয়লেটে আছেন বলে ডাকিনি।'

'মনোজ ?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'না না। একটি মেয়ে নাম বলল জুলি।'

মাথা নাড়লাম। অদ্ভুত মেয়ে তো। যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই গিয়ে শুনছি জুলি ফোন করেছিল। অথচ কখনই তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি না। কিন্তু এই ফোন নাম্বারগুলো সে পাচ্ছে কোত্থেকে ?

যত্ন করে খাওয়ালো অঞ্জনা। বনজ বললেন, 'আজ অনেক খাটুনি হয়েছে আপনার। শুয়ে পড়ুন। একদিন আপনাকে নিয়ে আমরা বের হবো।'

বসু দম্পতি সম্ভবত বড্ড বেশি নিয়ম মেনে চলেন। এই ইঙ্গিত মনোজ আমাকে দিয়েছিল। খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। অথচ এখন আমার ইচ্ছে করছে বাইরে বের হতে। রাত্রে লস-এঞ্জেলসের চেহারাটা দেখতে বড় ইচ্ছে করছিল। ঘড়ি দেখলাম। প্রায় সাড়ে এগারোটা। মনোজকে খুব মনে হচ্ছিল এই সময়। তারপরেই নিজেকে শাসন করলাম। বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে। কলকাতায় কি এই সময় কেউ আড্ডা মারতে বের হয় ? আমি তো কখনও যেতাম না।

গরমদেশে সকাল হয় সাত তাড়াতাড়িতে। রোদ উঠলে আমি বিছানায় পড়ে থাকতে পারি না। কিন্তু যে ঘরে আমি শুয়েছিলাম তার ভারি পর্দাগুলো আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ন'টার সময় যখন পরিষ্কার হয়ে ঘরের বাইরে এলাম তখন কেন্ট বলল, 'হেলো, গুড মর্নিং।'

'মর্নিং। কখন এসেছ ?' ততক্ষণে দেওয়ালে ঝোলানো ইলেকট্রনিক ঘড়ির দিকে

আর একবার নজর গিয়েছে আমার। কেন্ট একা বসে রয়েছে ড্রয়িংরুমে। বনজ কিংবা অঞ্জনাকে দেখতে পাচ্ছি না।

ঘণ্টাখানেক। মিসেস বোস বললেন তুমি ঘুমোচ্ছ।'

হ্যাঁ। একটু আরাম করছিলাম।' হঠাৎ মনে হলো সেটা আমি করতেই পারি। কারও সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট থাকলে সেটা রাখতে যাওয়া ছাড়া বাকী সময়ে আমি যা ইচ্ছা করতে পারি।

'মজুমদার, আর ঠিক দেড় ঘণ্টার মধ্যে আমাদের অফিসে পেঁাছাতে হবে।'

পেঁাছে যাব। কেন্ট তুমি বিবাহিত?

'হ্যাঁ। আমার একটি মেয়ে আছে। কেন বলতো?'

'আমার এক ব্যাচেলার বন্ধু আছে। সে ঠিক তোমার মতো বিকেলে ট্রেন থাকলে সকালে তাড়া দেয়। কিন্তু এখন কিছু খাবার দরকার। তোমাকে এখানে ঢুকতে দিলো কে?

'মিসেস বোস। উনি মেয়েদের নিয়ে খানিক আগে বেরিয়েছেন। বলে গেছেন তোমার যদি খিদে পেয়ে যায় তাহলে কিচেনে সব ব্যবস্থা করা আছে।'

কেন্ট কথা শেষ করতেই আমি কিচেনের উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগলাম। এবং তখনই টেলিফোন বেজে উঠল। কেন্টের সামনেই টেলিফোন। সে রিসিভার তুলে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাকে জানাল, 'তোমার ফোন।' কিচেনের দরজায় দেখলাম একটি কর্ডলেস রিসিভার ঝোলানো। সেটি তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলাম বাংলায়, আপনি কে বলছেন?'

ওপাশে সামান্য ইতস্ততা, তারপর মিষ্টি গলার মেয়েলি স্বর কানে এল, 'মে আই স্পিক টু মিস্টার মজুমদার?'

এবার ইংরেজিতে জানালাম তিনি জায়গায় পেঁাছেছেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা চিৎকার ছিটকে উঠল যেন ওপাশে। সেইসঙ্গে হাসির মিশেল। কথা যখন স্পষ্ট হলো তখন শুনলাম, 'ও মজুমদার, আমি তোমাকে রোজ শুধু খুঁজে যাচ্ছি। আমার ভাগ্য এত খারাপ যে তোমাকে পাচ্ছিলাম না কিছুতেই। শেষ পর্যন্ত তুমি আমাদের শহরে এসে গেছ, উঃ, কি আনন্দ হচ্ছে। ওহো, আমি হলাম জুলি, কামাল আমাকে তোমার কথা বলেছে। ও বলেছে তুমি খুব ভালো লেখ। আমেরিকায় একটি কালো মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাও। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই মিথ্যে নয়, তাই না?'

কামাল তোমাকে সত্যি কথা বলেছে।'

'আই অ্যাম ডায়িং টু মিট ইউ। কখন দেখা হচ্ছে বল?'

আমি আজ সকালে সরকারি অফিসে যাব। তোমার ফোন নাম্বারটা দাও, একটু ফাঁকা পেলেই তোমায় ফোন করব।'

'কিন্তু সেটা আজই। আমি বাড়িতেই থাকব বিকেল পর্যন্ত।'

জুলির টেলিফোন নম্বর লেখার পরও সে কথা বলতে চাইছিল। কিন্তু যেই শুনল আমি ঘুম থেকে ওঠার পর কিছু খাইনি অমনি হাঁ হাঁ করে উঠল, 'সেকি। এতবেলা অবধি কিছু খাওনি? বলবে তো!' না, আমি ফোন নামিয়ে

রাখছি। ও হ্যাঁ, নতুন জায়গায় এসেছ, আজ সকালে অনেকটা অরেঞ্জ জুস খেয়ে বেরুবে।' টেলিফোন নামিয়ে হেসে ফেললাম। দূরে বসা কেন্ট সেটা লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, 'হাসছ কেন?' মাথা নেড়ে কিছু না বলে কিচেনে ঢুকলাম। জুলি কালো চামড়ার নিগ্রো মেয়ে। অথচ ওর এই শেষ কথাগুলোর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নায়িকার কোনো পার্থক্য নেই। আমেরিকায় আসার পর থেকেই মনে হয়েছিল সাতানব্বুই বছর আগে বিবেকানন্দ এদেশে এসে যা দেখে-ছিলেন তা আজ এলে শুধরে নিতেন অনেক ব্যাপারে। বিশেষ করে মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যটি আজ তিনি বলতে পারতেন বলে ধারণা জন্মেছিল বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'হে আমেরিকার নারী, শত সহস্রবার জন্মেও আমি আপনাদের কাছে আমার গভীর কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে পারব না। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।' বলেছিলেন, 'আমেরিকার নারীরা নিজেদের ধর্ম থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুত না হয়েও সেখানে যা কিছু মঙ্গল-ময়, শুভময় তারই প্রতি অগাধ সহানুভূতিশীল।' আজ জুলির সঙ্গে কথা বলার পর বিবেকানন্দকে মনে পড়ছিল। সময়ের উইপোকা কাগজ কাঠ ইত্যাদি ভঙ্গুর জিনিসের গায়ে দাঁত বসাতে সক্ষম কিন্তু সোনা ইস্পাত প্রভৃতি ধাতব পদার্থকে স্পর্শ করার কোনো ক্ষমতা রাখে না। জুলির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমার ভেতরে একটা আগ্রহ জন্মাল।

এই সময়ের মধ্যে আমি আমার ব্রেকফাস্ট বানিয়েছি। পাঁউরুটি সেঁকে মাখন বুলিয়েছি, ফ্রিজ খুলে খানিকটা পুডিং নিয়েছি আর চায়ের জল গরম করে একটা পাতলা লিকার তৈরি করেছি। প্রচুর খাদ্যদ্রব্য রয়েছে ফ্রিজে। কিন্তু রান্নাঘরের অনভিজ্ঞতার দরুন এগোতে সাহস করিনি। খাওয়ার ব্যাপারে আমার অবশ্য কিছুতেই উন্নাসিকতা নেই। কিন্তু এই যে খাবার বানালাম যা পারলাম খেয়ে ডিস কাপ ধুয়ে সাজিয়ে রাখলাম যথাস্থানে, কলকাতায় কি কখনও করতাম? এখন মনে হচ্ছে করলে মন্দ হয় না।

আমি যখন বাইরে বের হবার জন্যে তৈরি তখনও অঞ্জনা ফেরেননি। অতএব বাইরে থেকে দরজা টেনে বন্ধ করে গাড়িতে উঠলাম। আমাদের দেশে বাড়িতে কেউ এলে তার জন্যে গৃহকর্ত্রী তো বটেই কর্তাও সময় দিয়ে থাকেন। প্রথম সকালেই আগন্তুক নিজে খাবার তৈরি করে খাচ্ছে—এই দৃশ্য ভাবা যায় না। অনেকে তো রীতিমত অপমানিত বোধ করবেন। কিন্তু ওদেশে প্রত্যেকের জীবন এমন নিয়মে বাঁধা এবং কাজকে অবহেলা করার প্রবৃত্তি এত কম যে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে চলবে না তাকে নিজের খাবার করে নিতে হবে। আমি যদি সাতটার সময় উঠতাম তাহলে অঞ্জনা নিশ্চয়ই কিচেনে ঢুকতে দিতেন না। অনাবশ্যক কিছু চক্ষু লজ্জার জন্যে এদেশে আমরা অনেক ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত হই। সেই সকালে অঞ্জনা ঠিক কাজই করেছিলেন।

দামি গাড়িতে চেপে কেন্টের পাশে বসে আমি শহরের দিকে চলেছি। এখানেও রাস্তায় কোনো মানুষ হাঁটছে না। কিন্তু গাড়িতে গাড়িতে পথ ছয়লাপ। এত গাড়ি এবং তাদের রকমারি বাহার দেখে বেশ মজা লাগছিল। থামতে হচ্ছে কিন্তু

সেটা বেশিক্ষণের জন্যে নয়। রাস্তাগুলো এত চওড়া যে আমাদের চারটে রেড-রোড পাশাপাশি স্বচ্ছন্দে ঢুকে যাবে। এমন কি শহরের মধ্যেও। মাঝে মাথার ওপর সঙ্কেত ফুটে উঠছে। অমুক রাস্তায় জ্যাম হয়েছে, আপনারা দয়া করে রাস্তা পরিবর্তন করুন। পুলিশের গাড়ি তো মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছে।
যে সরকারি অফিসটিতে আমাদের যেতে হলো সেটি একেবারে শহরের মাঝ-খানে। এরমধ্যে আমি কেন্টকে জিজ্ঞাসা করেছি হলিউড কোন দিকে? সে যা বুঝিয়েছে তা ভালো করে মাথায় ঢোকেনি। একবার একটা রাস্তা দেখিয়ে বলল, 'এই দিক দিয়ে ডিজনি ল্যান্ড যাওয়া যায়।'
সরকারি অফিসার একজন প্রৌঢ়া মহিলা। পরিচয় পেয়ে বসতে বললেন। তাঁর নজর আমার পোশাকের ওপর। পাজামা পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে খুব আরাম লাগছিল এতক্ষণ, ওঁর দৃষ্টিতে সামান্য অস্বস্তি এল। উনি অবশ্য প্রসঙ্গ তুললেন না, 'মিস্টার মজুমদার, আমি খুব দুঃখিত। অনেক চেষ্টা করেও হ্যারল্ড রবিন্সের সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিতে পারলাম না।'
বললাম, 'ওয়াশিংটনে বব আমাকে সেটা বলেছে।'
মহিলা বললেন, 'ডাস্টিন হফম্যান এবং অ্যান্টনি কুইন এখন নিউ ইয়র্কে। ব্রডওয়েতে নাটক করছেন। কিছুই করার নেই। গ্রেগরি পেককে আমরা কন্ট্যাক্ট করাব চেষ্টা করছি। সিডনি পয়েটারকে আগামীকাল বিকেলে পেতে পারি। আমি আপনাকে অনুরোধ করব যখন দিন তিনেক এই শহরে থাকছেনই তখন ডিজনি ল্যান্ড আর হলিউডটা ঘুরে দেখুন। এরমধ্যে আমরা এদিকটায় কিছু করার চেষ্টা করছি।'
আমার কিছু বলার নেই। মনে পড়ল আনন্দবাজারের সম্পাদক অভীক সরকারেব কথা। উনি বলেছিলেন, 'সরকারি আমলাদের অনুরোধ ফিল্ম স্টাররা শুনবেই না। ওদের ধরে এ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবেন না। পাত্তাই দেবে না সরকারি আমলা-দের।' মনে হলো কথাগুলো ঠিকই। ভদ্রমহিলার পাশে দাঁড়িয়ে এক প্রৌঢ় আমাদের কথা শুনছিলেন। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'আর কারো সঙ্গে দেখা করতে চান। ধরুন, পুরোন দিনের অভিনেতা অভিনেত্রী?'
মাথা নেড়ে না বললাম। ওঁরা অনেকটা দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে হাল ছাড়ছেন না। অতএব এখন আমরা হলিউডে যাব। ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একটা ফোন করতে পারি?' তিনি বললেন, 'স্বচ্ছন্দে।' জুলিকে ফোন করলাম। সে সম্ভবত টেলিফোনের পাশেই ছিল। ওঁকে জিজ্ঞাসা করে বাড়ির ঠিকানা আর কীভাবে যাব লিখে নিলাম।
গাড়িতে উঠে কেন্টকে ঠিকানাটা দিলাম। কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'হু ইজ সি? তোমার বান্ধবী?' কি উত্তর দেবো? হেসে বললাম, 'না। এখনও নয়।'
কিন্তু নির্দেশ ধরে আধঘন্টাটাক চলার পর বাঁক ঘুরতে ঘুরতে কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'জুলির সঙ্গে তোমার কিভাবে আলাপ হলো বলতো?'
'কেন?' অবাক হলাম। কেন্ট মাথা নাড়ল, 'এদিকটায় কালোরা থাকে, তাই জিজ্ঞাসা করলাম। ততক্ষণে আমরা যে রাস্তায় ঢুকেছি তার দু'পাশে লনওয়ালা

বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। নির্দিষ্ট নম্বরের প্যাসেজে গাড়ি ঢুকল। দরজা খুলে নামতেই দেখলাম একটি কালো তরুণী দৌড়ে বারান্দায় এল। এসে চিৎকার করল, 'মজুমদার ?' মাথা নাড়তেই সে লাফিয়ে নামল লনে। তারপব তীব্রগতিতে ছুটে আসতে লাগল আমার দিকে।
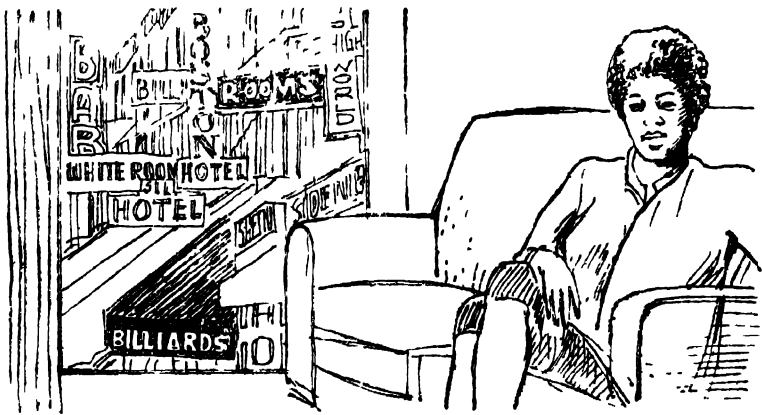
১৭

দীর্ঘাঙ্গিনী কালো মেয়েটি প্রায় দু'হাতেই আমাকে জড়িয়ে ধরল প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস নিয়ে। যেন দীর্ঘদিন পরে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, হয়তো কোনোদিন যে-কোনো ধরনের নিবিড় সম্পর্ক ছিল তার সঙ্গে, জুলির সমস্ত শরীর এবং নিঃশ্বাসে সেইরকম অভিব্যক্তি ছিল। আমার হাতে হাত রেখে সে চিৎকার করে বলল, 'অ্যাট লাস্ট ইউ আর হিয়ার। অ্যাঁ?'

এই বঙ্গ সন্তান ততক্ষণে দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে। মধ্যবয়সী এক যুবতী দীর্ঘাঙ্গিনী যার মুখ নাক চোখে তেলতেলে ভাব, গায়ের রঙ জলপাই-এর গায়ে নামা পাতার ছায়ার মতো সে আমাকে এমনভাবে আপ্যায়ন করবে কখনও ভেবেছিলাম! আমার বাক্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সম্ভবত। শুধু দেখলাম কেন্ট প্রচণ্ড বিস্ময় নিয়ে আমাদের দেখছে। জুলি তখন বলে যাচ্ছে কোথায় কোথায় আমাকে টেলিফোন করেছে। কামাল তাকে জানিয়েছে আমি নাকি গল্প উপন্যাস লিখি। আজ পর্যন্ত কোনো লেখককে সে দেখে নি। কামাল আরও বলেছে সাদা মেয়েদের চেয়ে আমি কালো মেয়েদের বেশি পছন্দ করি। কারণ আমি যে দেশ থেকে এসেছি সেখানকার মেয়েদের গায়ের রঙ কালো। এসব শুনেই সে নাকি আমার দেখা পাওয়ার জন্য উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করছে। এইসময় ওপরের টেরেসে একজন প্রৌঢ়ের আবির্ভাব ঘটল। ভদ্রলোকের জুলপি সাদা। পরনে যাজকদের সাদা পোশাক। মুখে স্মিত হাসি। জুলি চিৎকার করল, 'চার্লি,' দ্যাখো কে এসেছে! তুমি বাজিতে হেরে গেলে।

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'হারাটা এক্ষেত্রে খুবই আনন্দের। কিন্তু ওঁকে বাইরে দাঁড় করিয়ে কষ্ট দিচ্ছ ডার্লিং। ওয়েলকাম মিস্টার মজুমদার। এই মুহূর্তে আমার পরিচয় জুলির স্বামী, চার্লস।'

কালো চামড়ার সুগঠিত মানুষটির গলার স্বর চমৎকার। হতভম্ব হয়ে জুলিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাজির ব্যাপারটা কি?'

'আমি তোমাকে ফোন করছি আর তুমি রেসপন্স করছো না দেখে চার্লি বলেছিল যে তুমি কখনই আমার কাছে আসবে না। তাই বাজি হয়েছিল'।

'বাজিতে কি জিতলে'?

'তুমি আসা মাত্রই ও আমাকে একটা গান লিখে দেবে।'

'উনি গান লেখেন নাকি?'

'লিখতে কি চায়? জোর করে লেখাতে হয়।'

'আর উনি জিতলে?'

'আমাকে একদিন কথা বন্ধ করে থাকতে হবে।'

'কেন? তুমি বেশি কথা বল নাকি?'

'মোটেই না। পাদরিদের তো চেন না। নিজেরাই শুধু কথা বলতে চায়।'

'চার্লি কি পাদরি'?

'হ্যাঁ। রেভারেন্ড।'

এইসব কথা বলতে বলতে আমরা লন পেরিয়ে যাচ্ছিলাম। জুলি আমার একটা হাত জড়িয়ে রেখেছিল। হঠাৎ মনে পড়তেই ঘুরে দাঁড়ালাম, 'কেন্ট, এসো'। গাড়িতে হেলান দিয়ে বুকের ওপর দুটো হাত ভাঁজ করে কেন্ট বললো, 'থ্যাংকস্। আমি এখানেই খুব আরামে আছি। তোমার কি খুব দেরি হবে?'

'ঘণ্টাখানেক। কিন্তু তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন?'

'আমি এক বন্ধুর কাছে যাচ্ছি। ঠিক এক ঘণ্টার মাথায় ফিরে আসবো।' কেন্ট ফিরে গেল ড্রাইভিং সিটে। সেদিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে জুলি জিজ্ঞেস করল, 'হু ইজ হি?'

'আমার এসকর্ট। সরকার থেকে দিয়েছে।'

'কোন স্টেটের লোক ও?'

'কেন?'

'মাস্ট বি ব্ল্যাক হেটার।'

'যাঃ। আজকাল কেউ ওসব করে নাকি? আমিও তো কালো।'

'ওপরে চল বলছি।'

চার্লি দাঁড়িয়ে ছিলেন সিঁড়ির মুখে। দুটো হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরে বললেন, 'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। খুব ভালো লাগছে আপনাকে দেখে।'

হেসে বললাম, 'আপনাকে কিন্তু এখনই গান লিখতে হবে।'

চার্লি স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'আই উইল লাভ টু ডু দ্যাট।'

আমাকে ওরা বসার ঘরে নিয়ে গেল। যে কোনো মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের বসবার ঘরের সঙ্গে কোনো ফারাক নেই। উপরন্তু একটা পিয়ানো, কিছু

বাদ্যযন্ত্র ঘর জুড়ে রয়েছে। আমাকে সোফায় বসিয়ে জুলি জিজ্ঞেস করল, 'কি খাবে বল?'

'ঠান্ডা কফি।'

'গুড। লাঞ্চ করেছো?'

'হ্যাঁ।'

'আমি আসছি।' জুলি দ্রুতপায়ে ভেতরে চলে গেল। আমি তখন অন্য জিনিস ভাবছি। জুলি আমার সঙ্গে যেরকম আচরণ করছে তা চার্লির মন্দ লাগছে না কেন? আমাদের দেশে কোনো মহিলার যদি আমার লেখা পড়ে ভালো লাগে এবং তিনি যদি স্বামীর সামনে এমন ব্যবহার করেন তাহলে তাদের সম্পর্ক কি টিকবে? মনে হয় না।

চার্লি বসেছেন উল্টো দিকে। বললেন, 'জুলি তোমার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছে যে কি বলব। আগামী কাল তোমার অনারে ও এখানে একটা গানের অনুষ্ঠান করছে।'

'চার্চে?'

'হ্যাঁ। এখানে চার্চের হল অনুষ্ঠানের জন্যে ভাড়া পাওয়া যায়।'

'আপনি গানবাজনা করেন?'

'না, না। একটু আধটু লিখি। আমেরিকা কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

'আপনাদের দেশ সম্পর্কে আমার তেমন কোনো ধারণা নেই। এককালে তো সবাই ইন্ডিয়ান আর রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে গুলিয়ে ফেলত। অবশ্য মিসেস গান্ধীকে আমরা জানি।'

জুলি এল ট্রে নিয়ে। তাতে তিনটি কফির কাপ। আমার হাতে একটা ধরিয়ে দিয়ে সে স্বামীকে দিলো। নিজেরটা নিয়ে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই খুব নামি লোক. নইলে সরকার এত খোয়াতে পারে না। তার ওপর বিনি পয়সার ড্রাইভার।'

'কেন্ট কিন্তু আমার ড্রাইভার নয়।'

'ওই হলো। আমি তোমাকে বলতে পারি ওর কোনো বন্ধু এখানে নেই। স্রেফ আমার বাড়িতে আসবে না বলেই মিথ্যে কথা বলে গেল।' জুলি বলল।

'চার্লি তাকে ধমকালেন, 'ডার্লিং, না জেনে কিছু বলা ঠিক নয়।'

জুলি এমন একটা মুখের ভঙ্গি করল, যার মানে, ঠিক আছে। কথা বলব না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে তো সাদা কালো একসঙ্গে চাকরি করে, অভিনয় করে, কালো গায়ক আর খেলোয়াড়দের তো প্রচন্ড ডিম্যান্ড। তাহলে?'

জুলি জবাব দিলো, 'অফিসের জীবন অফিসেই শেষ হয়। গায়ক খেলোয়াড়দের নিয়ে মাতামাতি করে টিন এজার্সরা। এরা বড় হলে হাওয়া পাল্টাবে নিশ্চয়ই। খেলোয়াড়দের কথা বলছ. একটা কালো টেনিস খেলোয়াড় খুঁজে পাবে যে কোনর্স, বর্গের মতো বিখ্যাত। পাবে না। কারণ টেনিস বড়লোকদের খেলা। সাদাদের একচেটিয়া।

'কালো বড়লোক নেই?'

'আছে। তারা হালে পানি পাচ্ছে সম্প্রতি।'
'কিন্তু সাদা মেয়েরা কালোদের তো পছন্দ করে। পথেঘাটে দেখেছি।'
'দে আর স্টেয়িং টুগেদার ফর সেক্স। হৃদয়ের জন্যে নয়।'
এইসময় চার্লি বাধা দিলে। 'ইউ ডোন্ট নো ডার্লিং।'
'ঠিক আছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট একজন কালো লোক এমন ঘটনা ঘটলে আমায় বলবে। ছেড়ে দাও এসব কথা। তোমার বই কি ইংরজিতে লেখা?'
'না। আমার মাতৃভাষায়। বাংলা।'
'ট্রান্সলেটেড হয়নি?'
'হয়েছে।'
'আমাকে একটা দিও। আই ওয়ান্ট টু রিড ইউ।'
আমেরিকান ইংরেজি খুব গোলমেলে। জুলি যদি বলতে চায় তোমাকে পড়তে চাই তারজন্যেও তো ওই একই বাক্য ব্যবহার করতে পারে। কামালের প্রসঙ্গ উঠল। জুলি বলল, 'ও একটা অদ্ভুত লোক। বস্টনে আমার সঙ্গে আলাপ। বউ ডিভোর্স করার পর খুব মন খারাপ করে থাকত। কিন্তু কারো কিছু হলে আগ বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত। আমাকে বাংলা শেখাতে চাইত। বলত, জুলি তুমি আমার খুব ভালো বন্ধু। ও আমার সামনে সহজে এমন সব সত্যি কথা বলত যা শুনে আমার কান গরম হয়ে যেত কিন্তু ওর অকপটতায় মুগ্ধ হতাম। তারপর একদিন ওকে বিয়ে করতে চাইলাম। তখন তো আমার সঙ্গে চার্লির আলাপ হয়নি। কামাল ক্ষেপে গেল খুব। তুমি আমার বন্ধু। বন্ধুকে আমি বউ করি না। তাছাড়া আমি আর বিয়েই করব না। পরে কত চেষ্টা করেছি ওর বিয়ে দেবার। একটা সুন্দরী মেয়ে অভিযোগ করেছিল সারারাত একসঙ্গে থেকেও কামাল তাকে স্পর্শ করেনি। এমন লোককে বিয়ে করার জন্যে মেয়ে পাওয়া যাবে?
জুলির কথাগুলো শুনতে শুনতে আমি চার্লির দিকে তাকাচ্ছিলাম। স্ত্রীর প্রাক বিবাহিত জীবনের গল্প শুনে প্রশ্রয়ের হাসি হাসছেন। বললাম, 'জুলি. গান শুনব।'
আঙুল তুললো জুলি. 'কাল বিকেল ঠিক ছ'টায়। চার্চের ঠিকানা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, তোমার জন্য গাইব আমি।'
চার্লি বললো, 'দাঁড়াও, একটা গান মাথায় এসেছে। লিখে ফেলি।' চার্লি উঠে গেলেন ভেতরে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার স্বামী কেমন মানুষ?'
ঠিক আমার বাবার মতন। আসলে জানো, কামাল ঠিক বলেছে। বন্ধুকে বিয়ে করা যায় না। স্বামীর মধ্যে বাবার গুণ থাকা দরকার। শুধু প্রেম নয়, অনেকটা স্নেহ যদি না থাকে, তাহলে মেয়েদের খুব ফাঁকা লাগে। তুমি প্রেম করেছ কখনও?'
'কি মনে হয়?'
'করেছ। তোমার প্রেমিকাকে কি রকম দেখতে?'
'কালো।'

'ধ্যুৎ, ঠিকঠাক বলছো না। জানো, তোমাকে দেখামাত্র আমার মনে হলো তুমি খুব কাছের লোক। তোমার গায়ের রঙ যদি আরও একটু ময়লা হতো, নাকটা যদি আরও একটু বসা হতো তাহলে তোমাকে আমার দাদা বলে চালানো যেত।'
'এখন ?'
'ওয়েল, আমি জানি না, তুমি আমার দাদা হতে চাইবে কি না ?'
'নিশ্চয়ই। দাদারাও তো স্নেহ করে।'
খিলখিল করে হেসে উঠল জুলি, 'তুমি খুব দুষ্টু। তবে দাদা কখনও বাবা হয় না।' হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কোথায় যাবে ?'
'ডিজনিল্যান্ড।'
'ওঃ কি মজা! অনেকদিন যাইনি। আমাদের নিয়ে যাবে ?'
'আমাদের শব্দটি বড় মধুর শোনাল। বললাম, 'নিশ্চয়ই।'
'কিন্তু তোমার এসকর্ট যদি রাজি না হয় ?'
'এ ব্যাপারে কিছু বলার এক্তিয়ার নেই ওর।'
এইসময় চার্লি ফিরে এলেন। তাঁর হাতে একটা কাগজ। স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিলেন সেটা। খুব আগ্রহ নিয়ে কাগজটায় দৃষ্টি বোলালো জুলি। তারপর বলল, 'চমৎকার। ওঃ চার্লি।'
উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীকে একটা চুমু খেল সে, 'তুমি প্রতিভাবান।'
লজ্জা পেলেন চার্লি। সেটা ঢাকতে যেন বললেন, 'ওঁকে দেখাও।'
জুলি বলল, 'আমি পড়ে শোনাচ্ছি। না, শোনাব না। কাল এই গানটাই প্রথমে গাইব আমি। চার্লি, তৈরি হয়ে নাও। মজুমদার আমাদের নিয়ে ডিজনিল্যান্ডে বেড়াতে যাবে। কুইক। চার্লি হতভম্ব, 'সত্যি ? কিন্তু আমাকে তো পাঁচটায় চার্চে যেতে হবে।' কিন্তু নারীর আবদারের কাছে পুরুষের ওজর আপত্তি কতক্ষণ টিকতে পারে।
জুলিকে লক্ষ্য করছিলাম। ওর হাবভাবে কোনোও মার্কিনী ব্যাপার নেই। প্রিয় আত্মীয় বাড়িতে এলে আমাদের মেয়েরাও এইরকম আচরণ করে। দারুণ সেজে এল সে। চার্লি সাধারণ পোশাক পরলেন। জুলি আমার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন দেখাচ্ছে আমাকে ?'
'ভালো'।
'তোমাদের দেশে গেলে সেখানকার মেয়েরা ভালো বলবে ?'
'পৃথিবীর কোনো দেশের মেয়েরাই মেয়েদের সাজগোজকে মনে মনে প্রশংসা করে না।'
চার্লি হেসে উঠলেন হো হো করে, 'ওয়েল সেইড'। ঠোঁট মুচরে জুলি বলল, 'তোমাকে দেখে তো নারী বিরোধী মনে হয় না। 'মোটেই নয়। একটি মেয়ে যদি আর একটি মেয়েকে মেনে নেয় তাহলে সে মনে মনে হেরে যাবে। আর আমিও চাই সব মেয়ে জিতে যাক।' এইসময় কেন্ট ফিরে এল। হর্ন এখানে বাজানো হয় না। দরজায় তালা দিয়ে আমরা নিচে নেমে এলাম। কেন্ট নির্লিপ্ত।

আড়চোখে আমাদের দেখল। দরজা খুলে দিয়ে ওর পাশে উঠে বসলাম জুলিরা পেছনে বসলে বললাম, 'কেন্ট এরা হলো জুলি আর চার্লি'। কেন্টের কথা তোমাদের বলেছি।'

ওরা তিনজন পরস্পরকে হেলো হেলো বলে আলাপ সারল। তারপর কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা এখন কোথায় যাবো ?'

'ডিজনিল্যান্ড'।

কেন্ট একবার পাঁচ আঙুলে স্টিয়ারিং বাজাল। তারপর গাড়ি পিছিয়ে নিয়ে স্পিড বাড়ালো।

চার্লি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর আগে আমেরিকায় এসেছেন ?'

মাথা নাড়লাম, না। চার্লি প্রশ্ন করলেন, 'আপনাদের দেশের লোক আমাদের কি ভাবে ?'

'আপনারা খুব বড়লোক. আপনারা বুর্জোয়া, আপনাদের সরকার সাম্রাজ্যবাদী কিন্তু এই দেশে এলে খুব আরাম পাওয়া যায়।'

'সরকারের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাই না কিন্তু আমরা অনেকেই মোটেই বড়লোক নই, বুর্জোয়া তো নই-ই, আর টাকা না থাকলে এখানে মোটেই আরাম পাওয়া যায় না। একজন বলেছিল স্বর্গে গেলেই স্বর্গসুখ পাওয়া যায়। তা একজন ভিখারি স্বর্গে গিয়ে ভাবল সে খুব সুখ করবে। কিন্তু সারাদিন ঘোরাঘুরির পর সে এক দেবতাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা নন্দনকাননে আমাকে ঢুকতে নিষেধ করল কেন ? দেবতা বললেন, 'ওখানে আমাকেও ঢুকতে দেওয়া হয় না।'

'সে কি ? আপনিও তো দেবতা।'

হ্যা, কিন্তু নিচু তলার দেবতা। নন্দনকাননে উঁচুশ্রেণীর দেবতারাই ঢুকতে পায়।'

'কেন ? আমি যে ফুল দেখতে চাই।'

'এত লোক প্রতিদিন স্বর্গে আসছে। সবাইকে ঢুকতে দিলে নন্দনকাননের একটা ফুলও কি থাকবে ? ফুল দেখতে হলে বাবা পৃথিবীতে চলে যাও।'

আমরা হাসলাম। জুলি বলল। তুমি কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে সত্যিকথাটা বলবে।'

মাথা নাড়লাম। কিন্তু মিথ্যাচারণ করলাম। কে আর নিজের কবর খোঁড়ে ? আমেরিকার লোকেদের বেশি প্রশংসা করলে লোকে বলবে, 'ছিল প্রতিষ্ঠানের লেখক, এখন আমেরিকার দালাল। বিবেকানন্দ যদি এখন আমেরিকার নারীদের প্রশংসা করতেন তবে তাঁকেও সি আই এ'র চর বলা হতো বলে আমার বিশ্বাস। কেন্ট কোনো কথা বলছিল না। শেষ পর্যন্ত আমরা পৌঁছে গেলাম ডিজনি-ল্যান্ড। আমার পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই এই রূপকথার রাজ্যটির বিবরণ অনেক পড়েছেন। সেই বিশদে আমি যেতে চাই না। ডিজনিল্যান্ডে প্রবেশাধিকার সরকারি দপ্তর দিয়েছিল। কিন্তু চার্লি আর জুলির টিকিটটা আমি কাটলাম। পিলপিল করে লোকজন ভেতরে ঢুকছে। আমাদের ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের

মতো একটা জায়গা জুড়ে ডিজনি সাহেব ওই কল্পলোক তৈরি করেছেন। মজার মজার যত ইলেকট্রনিক খেলার ঘর চারপাশে ছড়ানো। জুলি খুব খুশি হয়ে চার্লির সঙ্গে গল্প করছিল। ডিজনিল্যান্ডের খেলাঘরগুলোর প্রত্যেকটা দেখতে গেলে অন্তত দুটো দিন সময় লাগবে। মিনি মেলা বসে গেছে প্যাসেজে প্যাসেজে। ডিজনি সাহেবের তৈরি কার্টুনচিত্রগুলো চারপাশে হেঁটে বেরিয়ে বাচ্চাদের মজা দিচ্ছে। আমি দুটো খেল ঘরে ঢুকেছিলাম। একটিতে ট্রলিতে বসতে হয়। সামনে পেছনে চারজন। ট্রলি ধীরগতি নিয়ে অন্ধকারে ঢুকে যায়। তারপর সামনে যেন মহাকাশ চলে আসে। নক্ষত্ররা জ্বলজ্বল করে আর ট্রলির স্পিড বাড়ে। সেটা বাড়তে বাড়তে প্রায় ঘণ্টায় তিনশো কিলোমিটার পেঁছে যায়। এবং একসময় ট্রলি লাইন ছেড়ে শূন্যে ছিটকে উঠে যাবার আর একটা লাইনে ঝাঁপিয়ে ঠিকঠাক পড়ে ছুটতে থাকে। এইসময় যাত্রীরা প্রতিবাদ করে থাকেই। যখন ট্রলিটা আবার আলোয় ফিরে এসে থেমে যায় তখন মনে হয় হৃৎপিণ্ড আর বুকে নেই। তার আওয়াজ নিজের কানেই যেন শোনা যায়। বেরিয়ে এসে মনে হয়, আর নয়, এ জীবনে আর ওখানে ঢোকা নয়। দরজায় লেখা রয়েছে, দুর্বল হৃদয় মানুষের জন্যে নয়। কিন্তু দেখলাম কিশোর মার্কিনরা একবার ঘুরে এসে আবার টিকিট কাটছে ভেতরে যাওয়ার জন্যে।

দ্বিতীয়টি মজার। আমরা একটা নৌকায় উঠে বসলাম যেটি যন্ত্রচালিত। নৌকা আমাদের অন্ধকারে নিয়ে এলো। চারপাশে ঢেউ-এর শব্দ। নৌকা থেকে আলো পড়তেই বালির চর দেখতে পেলাম। ঢেউ সেই সৈকতে নামছে উঠছে। কোথাও অন্য শব্দ নেই। সেই বালিতে একটি করোটি পড়ে রয়েছে। আর আমরা কাছাকাছি যাওয়া মাত্র সেই করোটির চোখের গর্ত থেকে একটা কাঁকড়া বেরিয়ে এলো। সেটা নেমে গেল সুড়সুড় করে জলে। পরের অংশেই একটি মাকড়শার জালে ঘেরা ঘর যার ভেতরে প্রচুর অলংকার পড়ে রয়েছে। যেন বহুকাল সেখানে হাত পড়েনি। জুলি চিৎকার করে উঠল ভয়ে। দুটো সাপ ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে অলঙ্কারগুলোর স্তূপ থেকে। কিন্তু তাদের পেরিয়ে গেল নৌকো। মাথার ওপর দু'জন নাবিক একটা কাঠের ওপর পা ঝুলিয়ে মদখাচ্ছে। নাবিক না বলে জলদস্যু বলা যেতে পারে। হঠাৎ একটা গুলি এসে তাদের একজনের বোতল ভেঙে চুরমার করে দিতেই আলো অদৃশ্য হলো। এবং আমরা দূরে একটি জলদস্যুদের জাহাজ দেখতে পেলাম। ডানদিকে কোনো দুর্গ। জলসদুরা দুর্গাধিপতিকে শাসাচ্ছে আত্মসমর্পণের জন্যে। এবং শেষ পর্যন্ত গোলা বর্ষণ শুরু হলো। জাহাজ থেকে গোলা ছুটে যাচ্ছে আর আমরা মাঝখানে নৌকার ওপরে। আগুন ও শব্দে প্রাণ আঁতকে উঠছে। নৌকো সরিয়ে আনল আমাদের বোটম্যান। জাহাজ ভিড়ল দুর্গে। জলদস্যুরা জাহাজ দখল করেছে। নারীদের ওপর অত্যাচার করছে। তাদের আর্ত চিৎকার আর দস্যুদের অট্টহাস্যে কানে তালা লাগল। বোটম্যান দ্রুত নৌকা বের করে আনল আলোয়। এসবই মায়া। সবই পুতুল. তবে ইলেকট্রনিকের কেরামতি। কিন্তু চাক্ষুষ করার সময় মোটেই সেই বোধ মনে জাগে না।

কেন্টকে লক্ষ্য করছিলাম। সে যে জুলিদের সঙ্গে একদম কথা বলছে না তা নয়। কিন্তু দূরত্ব রেখে। যা না বললে নয়। আমি একটু পিছিয়ে পড়েছি এবার। দেখলাম মিকি মাউস একটা নির্জন জায়গা দেখে জিরিয়ে নিচ্ছে। ওর পাশে গিয়ে বসতেই বলল, 'হেলো'।
জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি এখানকার স্টাফ ?'
'নিশ্চয়ই'।
'কতক্ষণ তোমাকে এই ধড়াচুড়ো পরে থাকতে হয় ?'
'আটঘণ্টা'।
'তোমার ভালো লাগে ?'
'খুব। বাচ্চারা এতো আনন্দ পায় যে কি বলব ? এখন মাঝে মাঝে নিজেকেই মিকি মনে হয়। কার্টুনটা আমি এতবার দেখেছি যে তাকে নকল করে ওপেন এয়ারে অভিনয় করতে অসুবিধে হয় না। কোন দেশ থেকে এসেছ ?'
'ভারতবর্ষ।'
'ইন্দিরা গান্ডী ?'
'হ্যাঁ।'
'তোমাদের দেশের বাচ্চারা এখানে বেশি আসে না কেন বলতো ?'
উত্তর দিতে পারিনি। যে দেশের বাচ্চাদের মুখের খাবার আর পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে বাবা মায়েরা হিমশিম খেয়ে যায় সে দেশের বাচ্চাদের জন্যে আমেরিকার ডিজনিল্যান্ড নয়। অথচ সত্যি আমাদের দেশের বাচ্চারা কতভাবে না বঞ্চিত হচ্ছে। ডিজনিল্যান্ডটাকে যদি তুলে এনে এদেশের শহরে শহরে ঘোরানো যেত তাহলে ওদের খুশি আকাশ স্পর্শ করত। দেখতে দেখতে কেমন একটা অপরাধবোধে আক্রান্ত হলাম।
জুলিদের ওদের বাড়িতেই নামিয়ে দিলাম। ওরা সেই চার্চের ঠিকানা লিখে কেন্টকে বুঝিয়ে দিলো কিভাবে পৌঁছাতে হবে। ধরাবাঁধা সময়ের জন্যে হল ভাড়া করেছে ওরা। আমি কথা দিলাম অবশ্যই যাব। জুলি জিজ্ঞাসা করল আমাকে নিয়ে আসতে হবে কিনা ? ওকে আশ্বস্ত করলাম। ফেরার পথে টের পেলাম খিদে পেয়েছে। কেন্টকে সেকথা বলতে সে আমাকে নিয়ে এলো একটা নিরিবিলি রাস্তায়। ম্যাকডোনাল্ড নয়, বড় পাব্ বলা যেতে পারে। বেশ চওড়া হলঘর। আমরা টেবিলে না বসে কাউণ্টারেই বসলাম লম্বা টুল টেনে। আসলে মদই বিক্রি হয়, খাবার চাইলে তাও। দু'জনের খাবার পছন্দ করে হুকুম দিয়ে বিয়ার নিলাম। গাড়ি চালালে ড্রিংকস নিতে নেই এদেশের আইন অনুযায়ী বলে মনোজ আমায় জানিয়েছিল কিন্তু কেণ্ট বিয়ার খাচ্ছে। জানি না, সাহেবরা বিয়ারকে অ্যালকোহলের সম্মান দেয় না হয়তো। কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'জুলিকে তুমি আগে চিনতে ?
'না।'
'স্ট্রেঞ্জ !'
আমি ওকে অনেক প্রশ্ন করতে পারতাম কিন্তু ইচ্ছে করেই চুপ করে গেলাম।

ছেলেটা আমার সঙ্গে কখনই খারাপ ব্যবহার করেনি। ওর ব্যক্তিগত অপছন্দ নিয়ে প্রশ্ন তুলবো কেন? এইসময় আমাদের পাশের টুলগুলোতে ঝড় উঠল। দুটি মেয়ে পাশাপাশি বসে রয়েছে। দু'জনে সাদা চামড়ার। একজন মোটাসোটা, স্বাস্থ্যবতী, দ্বিতীয়া একটু ক্ষীণা। দ্বিতীয়া প্রথমাকে কিছু বোঝাচ্ছে, আর সে কাঁদছে। কেন্টকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি?'
কেন্ট বলল, 'দাঁড়াও, দেখছি।' সে ঝুঁকে পড়ে কিছু বলল, যা আমি শুনতে পেলাম না। স্বাস্থ্যবতী চোখ মুছল। তারপর বেমালুম কেন্টের সঙ্গে গল্প করতে লাগল। আমি উঠে টয়লেটে গেলাম। এবং আবিষ্কার করলাম আমেরিকায় পাবের টয়লেটেও অশ্লীল শব্দ লেখার লোকের অভাব নেই।
ফিরে এসে দেখলাম খাবার এসেছে এবং কেন্ট প্রথমার সঙ্গে শেয়ার করছে সেটা। দ্বিতীয়া চুপচাপ বসে। আমাকে দেখে তিনি হাসলেন। অর্থাৎ, আমি কি ধরে নিতে পারি তিনি আমারটা শেয়ার করতে ইচ্ছুক? প্রায় বাধ্য হয়েই তাঁকে অফার করলাম। তিনি মাথা নাড়লেন, তাঁর খিদে নেই। কিন্তু তিনি আমার পাশে এসে বসলেন। আমি নীরবে খিদে মেটাচ্ছি আর দ্বিতীয়ার কথা শুনছি।
'তুমি কি বাংলাদেশী?'
'না।'
'পাকিস্তানী?'
'না। ভারতীয়।'
'ও। খুব খিদে পেয়েছে তোমার মনে হচ্ছে। আমি এখন খাই না।'
'তোমার বন্ধুর কি হয়েছে?'
'আর বলো না। ও হলো যুগোশ্লাভিয়ান। একজন আমেরিকানের সঙ্গে ছিল। এক জায়গায় কাজ করি আমরা। আমেরিকান ছেলেটি ওকে বিয়ে করতে চাইছে না। কিন্তু কালরাত্রের মধ্যে যদি ও কোনো আমেরিকানকে বিয়ে করতে না পারে তবে চাকরি যাবে কারণ ওকে দেশে ফিরে যেতে হবে।'
'সেকি? এই অল্প সময়ের মধ্যে ও পাত্র পাবে?'
'চেষ্টা করছে। শী ওয়ান্টস টু স্টে হেয়ার। তোমার বন্ধুকে রিকোয়েস্ট করছে পেপার ম্যারেজের জন্যে। বেচারা।'
'সেকি? কেন্ট তো বিবাহিত। বলেনি?'
'বলেছে। কিন্তু ডরোথি বিশ্বাস করছে না।'
এইসময় কেণ্ট খাওয়া শেষ করে বলল, 'আমার দুটো বাচ্চা আছে, বুঝলে?'
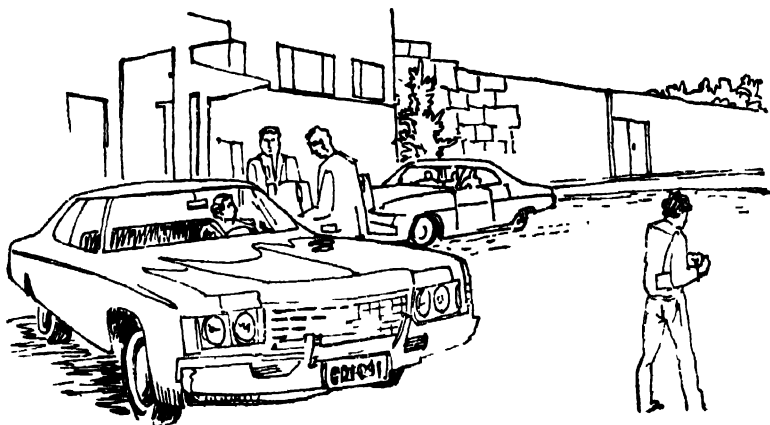
১৮

মেয়েটির জন্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। একেই বোধহয় 'বেচারা বলা চলে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওকে একটি স্বামীর ব্যবস্থা করতে হবে। এতদিন যার সঙ্গে স্টেট-টুগেদার করত সে দায়িত্ব নেবে না এবং চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলে মার্কিন সরকার ওকে ঘাড় ধরে বের করে দেবে। শিকাগো রাজ্যের নিয়ম বোধহয় লস-এঞ্জেলসে চলে না। এই মুহূর্তে চাকরি খুইয়ে মেয়েটি স্বদেশে ফিরতেও চায় না। সেখানে নাকি ওর জন্যে কেউ প্রতীক্ষায় নেই। কেন্ট বিবাহিত এবং বাচ্চা আছে জানার পর সে খুব গম্ভীর হয়ে গেল। কেন্টের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলো। ওর বান্ধবী ওকে বলল, 'এতো আপসেট হয়ো না। জিম তোমাকে একবার এ্যাপ্রোচ করেছিল না?' মেয়েটি মাথা নাড়ল, 'তখন তো আমি জনের সঙ্গে স্টেডি ছিলাম। তাই জিমকে পাত্তাই দিইনি। এখন গায়ে পড়ে ভাব করতে গেলে সন্দেহ করবে। আচ্ছা, একটা কথা আমি অনেকক্ষণ থেকে ভাবছি। কালকের সকালের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে কেমন হয় যে দুপুরের মধ্যে বিয়ে করতে চাই কোনো আমেরিকানকে? বয়স কোনো সমস্যা নয়। শুধু একটু ভদ্র হতে হবে।'

বান্ধবী লাফিয়ে উঠল, 'দারুণ আইডিয়া। লেটস গো।' যেন পরশ পাথর পেয়ে গেছে এমন ভঙ্গীতে ওরা দু'জন পাব্ থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রে বাড়িতে ফিরে এসে বনজ অঞ্জনাকে গল্পটা বললাম। দেখলাম ওরা মোটেই অবাক হলো না। বনজ বলল, 'মেয়েটা সত্যি বোকা। নইলে এমন সমস্যায়

পড়তে পারে জেনেও চাপ দিয়ে আমেরিকান বন্ধুটিকে আগেভাগে বিয়ে করে ফেলেনি! হয়তো। কিন্তু বিয়ে ব্যাপারটা কোনো পর্যায়ে চলে গেছে এমন ভাবলে বড্ড ভুল হবে। মেয়েটির অস্তিত্বের প্রবল প্রয়োজনেই সে এখন উন্মাদিনীর মতো আচরণ করছে। কিন্তু কেন্ট আমায় বলেছিল বিয়ের ব্যাপারে আজকের মার্কিন মেয়েরা অনেক বেশি সজাগ, পছন্দসই না হলে মোটেই নয়। এখন ওরা বিয়ে করতে চায় এমন ছেলেকে যে কখনও আলাদা হবার কথা ভাববে না। নিজের বউ-এর কথা বলেছিল কেন্ট। ওদেশে তো মেয়ে বড় হলে বাপ মা পাত্র খুঁজতে যায় না। আঠারো পার হবার আগেই ডেটিং হচ্ছে। আর এই ডেটিং চোখের দৃষ্টিবদল বা হাত ধরাধরিতে সীমাবদ্ধ থাকে না আজকাল। মেয়েটি দেখল ছেলেটি সুপুরুষ কিন্তু মদ খায় খুব। বাতিল করল। সুপুরুষ নয় কিন্তু বড় আড্ডাবাজ, পছন্দ হলো না। সুপুরুষ, আড্ডাবাজ নয়, মদ খায় না কিন্তু দারুণ অলস, তাও চলবে না। এখন সুপাত্র মানে, তোমার চেহারা মানানসই হলে ভালো, ভদ্র, মোটামুটি মাইনে, বেড়াতে ভালবাসো খুব, মদ খাও কিন্তু নেশা হবার আগেই থামাতে জানো। নিজের মত অন্যের ওপর চাপিয় দাও না, শেয়ার করতে জানো অর্থাৎ স্বার্থপর নও। তা এরকম পাত্র না পাওয়া গেলে মোটেই বিয়ে নয়। স্টে টুগেদার কর। দু-একটা বাচ্চা হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। তোমার সঙ্গে যখন বনবে না তখন আলাদা হয়ে যাব। বিয়ে করে সেটা ভাঙা চলবে না। মনোজ গল্প বলেছিল, একটি শান্তশিষ্ট আমেরিকান মেয়ে কোনো বয়ফ্রেন্ড ছিল না, সে ছেলেদের সঙ্গে মিশতো না, একুশ বছরের পর প্রেমে পড়ল। ছেলেটি তাকে বিয়ে করবেই। বিয়ের আগে ছেলেটি ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে আবিষ্কার করল মেয়েটি কুমারী। সঙ্গে সঙ্গে সে সাত হাত দূরে ছিটকে গেল। যে মেয়ে একুশ বছরে কুমারী থাকে সে নিশ্চয়ই বরফের চাঁই। একে বিয়ে করে জীবনটা বরবাদ করা যায়? কোনো ছেলে যার কাছে ঘেঁষেনি তার নিশ্চয়ই খারাপ ইতিহাস আছে।

ধান ভানতে হয়তো শিবের গীত গাওয়া হলো। কিন্তু এই অবস্থাতেও পাবু-এ দেখা মেয়েটি যেন আমাদের রূপকথার গল্পের রাজ কুমারীর মতো সকালে ঘুম ভাঙলে যাকে দেখবে তার গলাতেই মালা দেবে অবস্থায় পৌঁছে গেছে শুধুই একটা পুরুষকে বিশ্বাস করার ফলে।

সকালে জুলি টেলিফোন করল। মনে করিয়ে দিলো আজ সন্ধ্যার অনুষ্ঠানের কথা। বলল, 'আজ অনুষ্ঠানের পর আমার মায়ের বাড়িতে তোমাকে ডিনার খেতে হবে।'

বললাম, 'এখনই কথা দিতে পারছি না। আমার জন্যে সরকারি দপ্তর কি প্রোগ্রাম করে রেখেছে জানি না। যাই থাকুক, সন্ধে ছ'টায় তোমার গান শুনতে হাজির হবোই।'

কেন্ট এলো ঠিক সাড়ে ন'টায়। ওর সঙ্গে সরকারি অফিসে এসে জানতে পারলাম কোনো চিত্রাভিনেতার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করা যায়নি। একমাত্র সিডনি পয়েটার জানিয়েছেন সন্ধে সাতটা নাগাদ তিনি দেখা করতে পারেন। ওই সময়

একটা টেলিফোন করে নিতে। অফিস থেকেই সিডনির টেলিফোন নম্বর জেনে নিলাম। সিডনি পয়েটার সম্ভবত একমাত্র কালো অভিনেতা যিনি এক সময় হলিউডের ছবিতে দাপ'টে অভিনয় করেছেন এবং পুরস্কৃত হয়েছেন। ছাত্রাবস্থায় মেট্রো সিনেমায় ওঁর ছবি দেখতে আমরা লাইন দিতাম।

আজ দুপুরে হলিউড পার্কিং লটে গাড়ি রেখে ফুটপাত ধরে হাঁটতে চমক খেলাম। ফুটপাতে এক একটা পাথরের ওপর এক একজনের নাম খোদাই করা রয়েছে। বব হোপ, ক্যাথরিন হেপবার্ন, গ্রেটা গার্বো, গ্রেগরি পেক, আভা গার্ডনার, চার্লি চ্যাপলিন, এ্যালফ্রেড হিচকক থেকে আরম্ভ করে কার নাম নেই? কেন্ট জানাল, এই ফুটপাতে নাম না উঠলে হলিউডের অভিনেতা অভিনেত্রী পরিচালকরা জাতে উঠবেন না। তাঁদের প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবেই নাকি এখানে নাম লেখা হয়। শিবরাম চক্রবর্তী একদা আমাকে বলেছিলেন, 'যেদিন দেখবে তোমার লেখা বড় কাগজে ছাপা হচ্ছে সেদিনও তুমি লেখক হওনি। ছাপা হওয়ার পর যখন তোমার বই প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং-এ সেকেন্ড হ্যান্ড বিক্রির জন্যে ঝুলবে তখনই তুমি ষোল আনা লেখক।' কি জানি, এও হয়তো তেমনি।

একটু আগে বাঁ দিকে একটি স্ট্যাচুকে দেখেছিলাম একটা দোকানের সামনে। স্ট্যাচুর পরণে কোর্ট প্যান্ট, বাড়ানো হাতে টুপি ধরা। হঠাৎ দেখলাম ওই একই স্ট্যাচু ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। কেন্টকে জিজ্ঞাসা করলাম ওটা কোনো বিখ্যাত লোকের স্ট্যাচু কিনা কারণ একাধিক দেখা যাচ্ছে। কেন্ট হেসে বলল, 'সামনে গিয়ে দ্যাখোতো চিনতে পার কিনা?' স্ট্যাচুর সামনে দাঁড়িয়েই অস্বস্তি হলো। একটা চোখ বন্ধ করেই খুলল স্ট্যাচু। হাসি পেল। লোকটা শুধু গায়ের রঙও স্ট্যাচুকালার করেনি, ওই একই ভঙ্গিতে অনড় দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকে ওর টুপিতে পয়সা ফেলে যাচ্ছে। ভিক্ষে চাইবার আগে সে নিজের যোগ্যতা দেখাচ্ছে মূকাভিনয় করে। চমৎকার।

হলিউডে ঢোকার আগে আমরা লাঞ্চ সেরে নিলাম। এদিকটা একদম ফাঁকা। দু'পাশে সাজানো গাছের সারি। চওড়া সিঁড়ি নেমে এসেছে বিশাল বাড়িগুলো থেকে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম দুটি পাংক এক বাড়ির সিঁড়িতে বসে সিগারেট টানছে। নিউ ইয়র্কে দেখা পাংক মেয়েদের সঙ্গে এদের সাজগোজে কোনো ফারাক নেই। সেই বিকট করে চুল ছাঁটা, চুলে কিম্ভূতকিমাকার রঙের প্রলেপ, চামড়ার স্কার্ট। চোখমুখে উদাস দৃষ্টি। কোনো পাংক ছেলে কাছেপিঠে নেই। একটু সাহস হলো। কেন্টকে বললাম, 'ওদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

কেন্ট মাথা নাড়ল, 'অসম্ভব। ও চেষ্টা করো না।'

বললাম, 'কিন্তু করতে যে ইচ্ছে করছে আমার।'

'পাগল! ওরা মানুষের মতো ব্যবহার করতে জানে না।'

'আরে হাজার হোক ওরা মেয়ে। তুমি বোধহয় একটু বেশি ভয় করছ।'

কেন্ট বলল, 'ওরা কথাই বলবে না।'

'গিয়ে দ্যাখো না। বল, আমরা কথা বলতে চাই ভদ্রভাবে।' আমার কথা শুনে

কেন্ট খুব অসহায়ের মতো তাকাল। যেন তাকে আমি এরোপ্লেন থেকে লাফাতে বলছি। তারপর গুটিগুটি এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। মেয়ে দুটো ওকে আমলই দিচ্ছে না।'
কেন্ট বলল, 'হেলো !' দুটো মেয়ে নিরুত্তর রইল। সিগারেটটি খুব সাধারণ নয় মনে হলো। কেন্ট আবার বলল, 'লুক' আমার বন্ধু ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান। উনি লেখেন। নর্ভেলিস্ট।'
এইবার একটি মেয়ে মুখ ফেরাল, 'আমিও লিখি।'
সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে বেশ উৎসাহিত বোধ করলাম। মেয়েটি আঙুল তুলল। আঙুলটি মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঘুরে এলো, 'আই রাইট মাই ওন নভেল।'
কেন্ট খুবই বিমর্ষ চোখে আমার দিকে তাকাল। ভাবখানা এমন, সাবধান করেছি তাও তুমি শোননি। সে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আসলে উনি তোমাদের কাছে কিছু শুনতে চান।'
'ওকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বল।'
কেন্ট ফিরে এলো হাসিমুখ নিয়ে। বলল, 'এরা মনে হচ্ছে বেশিদিন পাংক্ হয়নি। এখনও অসভ্য হয়নি তেমন। তুমি বেশি প্রশ্ন না করলেই ভালো হয়।'
ঠিক মিনিট তিনেক পরে সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ওরা উঠে দাঁড়াল। তরতর করে আমাদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল, 'ফলো আস।'
এ আবার কি ? কোথাও নিয়ে গিয়ে ঝামেলা করতে চায় নাকি ? তবু একটু দূরত্ব রেখেই অনুসরণ করছিলাম। বাঁ দিকে একটা সুদৃশ্য টয়লেট। মেয়ে দুটো সেখানে ঢোকার আগে চিৎকার করল, 'নাউ ইউ ক্যান হিয়ার, ইফ ইউ ওয়াণ্ট টু।'
সমস্ত শরীরের রক্ত যেন মুখে চলে এলো। আমি কি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারি ? কেন্ট আমার হাত ধরল, দেখলে তো, আমি তোমাকে কতবার বলেছিলাম এরা মানুষ নয়, জানোয়ার। তাড়াতাড়ি চলো এখান থেকে, ওদের মুখ দেখাও অন্যায়।'
আমার কিন্তু অতটা রাগ হলো না। অপমানিত বোধ করেছিলাম। মেজাজ খারাপও হয়েছিল। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি অবাক হয়েছিলাম। ওই অল্প বয়সী মেয়ে দুটো কি স্মার্ট ভঙ্গিতে আমাদের সভ্য মানুষের সরল ইচ্ছেকে ব্যঙ্গ করে গেল। নিশ্চয়ই এটা অসভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন। কোনো নারী এই অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলবে না। কিন্তু অবহেলা দেখাবার জন্যে তো একটা সাহসের প্রয়োজন হয়। সেটা এরা অর্জন করল কোত্থেকে ? শুধুই প্রচলিত সংস্কার নিয়ম ভাঙার প্রবণতা ? পাংক্ হয়ে সমাজকে ব্যঙ্গ করা ? বিকল্প কিছু যারা দেখাতে পারছে না তাদের এই উৎসাহ বেশিদিন থাকতে পারে না সত্যি। কিন্তু আমরা যে ওদের অপছন্দ করছি সেটা বুঝেই কি ওদের ঘৃণার ব্যাপারটা এমন সহজ ভঙ্গীতে ওরা প্রকাশ করতে পারে।
হলিউডে ঢুকলাম। এর আগে ফিল্ম স্যুটিং দেখেছি টালিগঞ্জে এবং বোম্বেতে।

এ দু'টোরই তুলনা হয় না। টালিগঞ্জে ঢুকলে মনে হয় এতো পুরোন যন্ত্রপাতি, এতো বিশৃঙ্খল আবহাওয়া, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্টুডিওকে উন্নত করার বিন্দুমাত্র প্রয়াস যেখানে নেই সেখানেই সত্যজিত রায় ছবি বানান কি করে, মৃণালবাবু তপন সিংহ কি করে বছরের পর বছর ছবি করেন ? টালিগঞ্জে চলচ্চিত্র কর্মচারীরা নির্ভর করেন প্রযোজকদের ওপর। একটা সময় ছিল যখন ওখানে সারা মাসে দু-একটা ছবি হতো, ক্যান্টিনেও খাবার থাকত না। অথচ পান থেকে চুন খসলেই প্রযোজকদের ওপর খাঁড়া নেমে আসে। আন্দোলনের হুমকি যারা দেন তারা শ্রমিক কর্মচারীকে কাজের সময় আন্তরিক হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন না। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে তাই এখনও এখানে ছবি হচ্ছে। কিন্তু ধীরে ধীরে অনেক প্রযোজক চলে যাচ্ছেন ভুবনেশ্বরে। বাংলা ছবির উৎপাদন কেন্দ্র যদি ভুবনেশ্বর হয় এরপর তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। যন্ত্রপাতি, স্টুডিওর আবহাওয়া আর কর্মচারীদের সহযোগিতার জন্যে ভুবনেশ্বর এখনই অনেককে টানছে। পরিচালক নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় একটা ছোট্ট ঘটনা বলেছিলেন, টালিগঞ্জে কোনো প্রোডাকশন বয়ের কাছে জল চাইলে সে গ্লাসটা যেভাবে ভরে আনে যে নেওয়ার জায়গা থাকে না। চুমুক দেওয়ার ইচ্ছে হয় না কারণ যেখানে চুমুক দেবো সেখানেই নোংরা হাত রেখেছিল। নিজের কাজটা না শিখেই সে টালিগঞ্জে এসেছে। একজন সহকারী পরিচালককে কাজ দিতে বাধ্য করা হচ্ছিল আমাকে। আপত্তি ছিল না। কিন্তু জানলাম সে পৃথিবীর পাঁচটি সেরা ছবির নাম জানে না পাঁচজন পরিচালকের নাম বলতে পারছে না। এই ইনসিনসিয়ারদের নিয়েই এখানে কাজ করতে বাধ্য হতে হয়।

ধান ভানতে শিবের গীত হলো বোধহয়। কিন্তু পরের কোনো ভালো জিনিস দেখলেই নিজের খারাপ ব্যাপারটা বড় বেশি করে বাজে। হলিউডে আট ঘণ্টার একটা শিফট্ মানে আট ঘণ্টারই। তার বেশি করালে পারিশ্রমিক বাড়ে। কিন্তু আট ঘণ্টার কাজ তারা করেন যন্ত্রের মতো। দু'ঘণ্টার কাজ আট ঘণ্টাতে নয়। প্রতিটি সেকেণ্ডে প্রযোজকের যে খরচ হচ্ছে তার সঠিক মূল্য দিচ্ছেন তারা শ্রমের মাধ্যমে। যন্ত্রপাতির কথা ছেড়ে দিলাম পরিচালক এবং প্রোডাকশন বয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ঈর্ষণীয়। ইউনিয়ন আছে, আন্দোলন আছে। কিন্তু ফাঁকিবাজ এবং অসৎ কোনো কর্মচারীর স্বপক্ষে ইউনিয়ন কোনো আন্দোলন করে না। ফলে প্রযোজক ইউনিয়নকে ভয় পান। ইউনিয়নও নিজের মর্যাদা বোঝে।

ছবির স্যুটিং হচ্ছিল হলিউডের ভেতরেই তৈরি সিমেন্ট বাঁধানো চওড়া রাস্তায়। রাস্তার দুপাশে দোকানপাট যার পেছনের দেয়াল নেই। ইচ্ছে করলে সাইনবোর্ড পাল্টে শহর পরিবর্তন করা যায়। দোকানগুলোর যে পেছনের দেওয়াল নেই, কোনোটার পাশেরও তা রাস্তা থেকে বোঝার উপায় নেই। গড়ন একটু পাল্টে নিয়ে মধ্যযুগে চলে যাওয়া যায়। পরিচিত কোনো অভিনেতা অভিনেত্রীকে ফ্লোরে দেখলাম না। মাথার ওপরে খোলা আকাশ রেখে পরিচালক একটা ছোট স্কুটার রিক্সায় বসে তদারকি করছেন।

স্যুটিং বেশিক্ষণ দেখতে গেলেই বিরক্তি আসে। অতএব আমরা চললাম প্রাচীন

হলিউড দেখতে। টিকিট কাটতে হলো। আমরা একটা দেওয়াল খোলা বাসে বসলাম। ড্রাইভারের পাশেই গাইড রয়েছেন তিনি বলে যাচ্ছেন কোন বিখ্যাত ছবির স্যুটিং কোথায় হয়েছিল! হঠাৎ তিনি তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন। সাবধান ঝড় উঠেছে, বৃষ্টি নামল বন্যাও হতে পারে।' শোঁ শোঁ শব্দে হাওয়া বইছে। দু'পাশের গাছপালা মাথা নোয়াচ্ছে আবার তুলছে। বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেল সেই সঙ্গে। আমাদের বাস সন্তর্পনে চলছিল। হঠাৎ গাইড চিৎকার করল, 'যে যার সিটের হাতল ধরে বসে থাকুন। বন্যা আসছে।' দেখলাম বাঁ দিকের উঁচু পাহাড়ের ঢাল বেয়ে প্রচন্ড গতিতে জল নেমে আসছে। মুহূর্তেই সেটা রাস্তা ভাসিয়ে দিলো। এমনকি আমাদের বাস টলিয়ে দিলো। আর আঘাত করল সামনের একটা বিশাল গাছকে। গাছটা মড়মড় করে ভেঙে পড়ল জলে। আমাদের যখন হতবাক অবস্থা তখনই শোঁ শোঁ করে জল সরে গেল রাস্তা থেকে। নেমে গেল ওপাশে। গাইড বলল, 'লাইন ক্লিয়ার। লেটস মুভ।'
বাস চলতে আরম্ভ করল। বিস্ময় আরও বাকি ছিল। পড়ে যাওয়া গাছটা আমরা ডিঙিয়ে যাওয়া মাত্র আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম জলের চিহ্ন বিন্দুমাত্র নেই। অর্থাৎ কোনো পরিচালক যদি এইরকম একটা দৃশ্যের ছবি তুলতে চান, তার কাহিনীতে যদি এমন দৃশ্য থাকে তাহলে তাঁকে চুল ছিঁড়তে হবে না। স্রেফ এখানেই সেটা করে নিতে পারবেন। আর একটু এগোতে বাঁ দিকে বিশাল পুকুর দেখতে পেলাম, আয়তনে প্রায় দীঘিকে ছুঁচ্ছে। তার এক ধারে এক ভদ্রলোক মাথায় টুপি পরে সরু নৌকায় বসে এক মনে ছিপ ফেলে ফাতনার দিকে তাকিয়ে আছেন। গাইড বলল, 'হি ইজ মিস্টার মে। খুব ভালো মাছ ধরেন।' পরিচয় দিয়েই তিনি চিৎকার করলেন, 'হেই মিস্টার মে! উইশ ইউ গুড লাক।' মে তাঁর নৌকায় বসেই আমাদের দিকে ফিরে হাত নাড়লেন। এবং এই সময় বাসের একজন চিৎকার করে উঠল, শার্ক! শার্ক! সত্যি দেখলাম একটা শার্কের বিশাল ডানা জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে নৌকোর উদ্দেশ্যে। গাইড চিৎকার করে মে'কে সতর্ক করে দেওয়ার মুহূর্তে কান্ডটা ঘটে গেল। মে'র নৌকো শার্কের লেজের ধাক্কায় শূন্যে উঠে জলে পড়ে গেল। মুহূর্তেই জল লাল, আর টুপিটা ভাসছে। আমরা কেউ কথা বলতে পারছিলাম না। বাসের কোনো মহিলা কেঁদে ফেললেন। জ্বলজ্যান্ত একটা মানুষ মরে গেল চোখের সামনে। এবং তখনই জল তোলপাড় করে প্রায় বাসের গায়ে একটা দানবাকৃতি শার্ক উঠে এল মুখ হাঁ করে। আর্ত চিৎকার উঠল প্রত্যেকের একই সঙ্গে। হাঙরের মুখের ভেতর, দাঁত পর্যন্ত দেখা গেল। মুখ বন্ধ করে সে নেমে গেল সেই জলে। আর গাইড বললেন, 'যাকে আপনারা এই মাত্র দেখলেন সে কি চমৎকার অভিনয় করেছে জ' সিরিজের এক নম্বর ছবিতে। এই ইলেকট্রনিক্সের তৈরি শার্কটাকে তৈরি করতে প্রচুর খরচ হয়েছিল।' বাস চলতে আরম্ভ করতেই দেখলাম মে জল থেকে উঠে এল নৌকায়। এমনকি তার মাথার টুপিটাও যথাস্থানে। সে মাছ ধরছে নিবিষ্ট মনে। মে তাহলে রোবট। এমনকি হাঙরটাও।

একটু বাদেই আমরা যেন একটা টেকসাস ছবির ফেন্নারে ঢুকে পড়লাম। গুলি চলছে। ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে। পাহাড়ের ওপরে পাথরে ঠেস দিয়ে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন ডিন মার্টিন। সেইসব চোখা চোখা সংলাপ।
শেষমেশ আমাদের নিয়ে আসা হলো ক্যামেরার কারসাজি বিভাগে। সেই নির্বাক যুগে চলন্ত ছবিকে প্রজেকশনে ধরতে কিরকম সমস্যা হতো। ঘরে ঢুকে ছবির একটি চরিত্র যেন হাঁটতে হাঁটতে দেওয়ালে উঠে গেল। আবার তাকে নামিয়ে আনা হলো স্বস্থানে। পাশের ঘরটি আরও মজার। পেছনে একটি বড় পর্দা রয়েছে। সেখানে আল্পসের ছবি। পাহাড়ি পথ পাক খেয়ে একটা পিচের রাস্তা উঠে গেছে। দর্শকদের একজনকে ডাকা হলো ডেমনেস্ট্রেশনের সময়। সামনেই একটা ফিক্সড্ সাইকেল রয়েছে। প্যাডেল এবং চাকা থাকলেও নিচে ফ্রেমের সঙ্গে আটকানো বলে মুভ করে না। যে গিয়েছিল তাকে সাইকেল বসিয়ে প্যাডেল ঘোরাতে বলা হলো। ক্যামেরা চালু হলে দেখলাম ভদ্রলোক সাইকেল নিয়ে আল্পসের ওপরে। শেষে রাস্তার ওপরে ওকে আনা গেল। ফিগার কমিয়ে মানানসই করা হলো। দেখা গেল, পর্দায়, পাহাড়ি পথ বেয়ে ভদ্রলোক মহানন্দে সাইকেল চালিয়ে চলেছেন। অর্থাৎ অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে স্যুটিং স্পটে না গিয়ে শুধু প্রকৃতির দৃশ্য তুলে স্টুডিওতে এইভাবে কাজ সারা যায়। বোম্বাইতে এই কাজ কিছুদিন হলো শুরু হয়েছে। ধর্মেন্দ্র পহেলগাঁওতে না গিয়েও ওই ছবিতে এইভাবে অভিনয় করে গান গাইতে পারেন।
বিকেলের আগেই বাড়ি ফিরে এলাম। বনজ এখনও অফিসে। অঞ্জনাকে বললাম মনোজকে একটা টেলিফোন করতে চাই। অঞ্জনা চটে গেলেন। 'আপনি কিরকম লোক বলুন তো! আমাকে জিজ্ঞাসা করার কি আছে! যাকে ইচ্ছে যেখানে খুশি ফোন করুন। ভাত খাবেন?'
'ভাত'?
'হ্যাঁ মাছের কাঁটা দিয়ে পুঁইশাক আর চিংড়ি দিয়ে পোস্ত!'
'খানা লাগান। এটা কি লসএঞ্জেলস্?'
'ইচ্ছে করলেও সব জায়গায় সব কিছু পাওয়া যায় না শুধু আমেরিকা ছাড়া।'
অঞ্জনা ভাত বাড়তে গেলেন। আমি মনোজকে ধরলাম। ও ঘুমাচ্ছিল। জড়ানো গলায় বলল, 'আপনি ডেঞ্জারাস লোক মশাই। কোনো খবর নেই?'
বললাম, 'আজ হলিউড দেখলাম। মাথা খারাপ হয়ে গেল।'
'না, না। ওটা ঠিক রাখুন। হলিউড বড়লোকদের সিনেমা করার জায়গা। আমরা গরিবরা যারা আদার সিনেমা করি তাদের জন্যে হলিউড নয়। আমরা ক্যামেরা একদিনের জন্যে ভাড়া করে তিনদিন চালাই, টেকনিসিয়ানদের টাকা আর্দ্ধেক দিই। কলকাতায় তো প্রগতিবাদী তরুণ পরিচালকরা এমন করেন শুনেছি।' মনোজ বলল।
'দূর মশাই'। এসব গল্প কোথায় শোনেন? কলকাতায় যারা ক্যামেরা ভাড়া দেন তারা সঙ্গে কেয়ারটেকার পাঠান। শিফ্‌ট মেপে পয়সা নেয় তারা।' জানালাম।

'আপনার জুলির সঙ্গে দেখা হলো ?'
'হয়েছে'।
'কেমন' ?
'ভালো'।
'কপাল করে এসেছিলেন মাইরি। তিনবার ফোন করেছিল এখানে আপনি লস-এঞ্জেলসে পোঁছানোর আগে। ফরিদা আপনার খোঁজ করছিল। ফোন নম্বর দেবো ?'
'কেন' ?
'এমনি। নারী তো রহস্যময়ী'
'বড্ড বাজে বকছেন। আজ রাখছি।'
অঞ্জনা এসে বললেন, 'এতো তাড়াতাড়ি হয়ে গেল ? মনোজের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে আরম্ভ করলে ওঁর হুঁস থাকে না।'
কেন্টকেও খেতে বলল অঞ্জনা না না করেও শেষ পর্যন্ত রাজি হলো সে। টেবিলে বসে পুঁইশাকের কাঁটা বাছতে বাছতে গলদঘর্ম হলো সে। আর আমার পিসিমার কথা মনে পড়ল। এই বালবিধবা মহিলাটি আমাদের সংসার ছেড়ে মাত্র সাত দিনের জন্যে শ্বশুর বাড়িতে গিয়েছিলেন এগারবছর বয়সে। আমার পিতা-মহের সেবা করেছেন সাতাষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত, আমার বাবাকে মানুষ করে-ছেন তাঁর মাতৃ বিয়োগের পর এবং আমাকে আদর দিয়ে অমানুষ করেছেন। এইটেই তাঁর একমাত্র ত্রুটি। জলপাইগুড়ি শহরে আমি একা দাদু ও পিসিমার সঙ্গে থাকতাম। পিসিমা চা বানাতেন সরবতের মতো। মাছের ঝোল বা ডিমের তরকারি বানানো ছেড়ে দিয়েছিলেন আমার চৌদ্দ বছর বয়সেই কারণ গন্ধ সহ্য করতে পারতেন না। বাড়িতে শাক সবজির গাছ ছিল। চমৎকার নিরামিষ তর-কারি রাঁধতে পারতেন। ফুলকপির একটা তরকারি এমন হতো যে তাই দিয়ে পুরো ভাত খাওয়া যেতো। আজ অবধি তার তুলো তরকারী রাঁধতে দেখলাম না। হঠাৎ এক দুপুরে আমার পাতে ওই মাছের কাঁটা দেওয়া পুঁইশাক পড়ল। অবাক হয়ে তাকাতে তিনি বললেন, 'তোর নিরামিষ খেতে রোজ কষ্ট হয়। মাছ রাঁধতে পারি না তাই কাঁটা দিয়ে করলাম।'
অমৃতের স্বাদ মানুষ পায়নি। সেদিন আমার মনে হয়েছিল আমি অমৃত চাই না। অঞ্জনা যখন জানতে চাইল কেমন হয়েছে তখন বললাম, 'ফাস্টক্লাস'। ও খুশি হলো। সেই বালবিধবা পিসিমা একদিন আমায় বলেছিলেন, কখনও কোনো মেয়েকে দুঃখ দিবি না। মেয়েরা হলো মায়ের জাত। দুঃখ দিলে সেটা মহাপাপ হবে।' সেটা মাথায় ছিল কিনা জানি না তবে যে মেয়ে খুঁজে পেতে এমন বাঙালি মেনু তৈরি করে লস এঞ্জেলসে বসে তাকে খারাপ বলা যায় ?
দুপুরটা 'চট করে বিকেল হয়ে গেল, কেন্ট বসে টি ভি দেখছিল। ওকে আমি তাড়া দিলাম। ঠিক সময়ে সেই চার্চে পোঁছতে হবে আমাকে। জুলি আমার সম্মানে আজ গান গাইবে। এ জীবনে কোনো মেয়ে এরকম কান্ড করেনি। কেন্ট বলল, 'সিডনি পয়েটারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া গিয়েছে। মাত্র দশ মিনিট

তিনি কথা বলতে পারেন। কিন্তু তোমাকে ঠিক করে নিতে হবে কোথায় যাবে। সিডনি সাতটার সময় দেখা করবেন। দুটো সময় রাখা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

আমি প্রতিবাদ করলাম 'কেন নয়? জুলির গান ছ'টায়। ওখান থেকে সাড়ে ছ'টায় বেরিয়ে আমরা সিডনির ওখানে পৌঁছতে পারব না?'

'ডিফিকাল্ট'। জানালো কেন্ট। কিন্তু আমি দু'জায়গাতেই যেতে চাই। সিডনির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। চোখের সামনে সেই কৃষ্ণাঙ্গ চিত্রতারকার ছবি ভেসে উঠল। আমাকে ওঁর কাছে যেতেই হবে। কিন্তু তাই বলে জুলির গান শুনতে যাব না তা কি কখনও হয়? সেজেগুজে সময় হাতে নিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

জলপাইগুড়ি শহরে যখন রাস্তায় গোটা দশেকের বেশি গাড়ি চলত না তখনও আমার পিতামহ সন্ধ্যায় ট্রেন থাকলে দুপুর থেকেই তাগাদা দিতেন। কলকাতায় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় হাওড়ায় পৌঁছাতে গেলে গড়িয়াহাট থেকে অন্তত সাড়ে তিনটেতে বের হতে হয়। স্ট্র্যান্ড রোড, ডালহৌসি, হ্যারিসন রোড অথবা পোস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ধৈর্যের শেষ বিন্দুতে অবস্থান করতে হয়। একবার হাওড়ায় যাচ্ছি কজনে। পোস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে চল্লিশ মিনিট। আর আধঘণ্টা বাদেই ট্রেন ছাড়বে। ট্যাক্সিওয়ালা উপদেশ দিলো, 'মালপত্র সঙ্গে না থাকলে হেঁটে যেতে বলতাম। ট্রেন ধরতে চান তো মিনিট তিনেক দূরের গঙ্গার ধারে গিয়ে একটা নৌকো ভাড়া করে চলে যান। উপদেশ মান্য করায় সেবার ট্রেন ধরতে পেরেছিলাম। কলকাতা জেদী রাগী যাত্রীদের জন্যে নয়। মাঝে মাঝে মনে হয় কেউ যদি এমন খেলা আবিষ্কার করতে পারত যা বাসে বসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা যায় তাহলে মানুষের কষ্ট কম হতো। কিন্তু আমরা আছি খোদ লসএঞ্জেলসে। দেড়ঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েও ঘড়িতে যখন ছ'টা পনের তখনও পাক খাচ্ছি রাস্তায়। এতক্ষণ ছিলাম জ্যামে আটকে। কেন্ট যে দিকেই যাচ্ছে সেদিকেই জ্যাম। তারপর রাস্তা গোলালো। শেষমেশ যখন পৌঁছালাম তখন ছটা পঁচিশ। চার্চের অনুষ্ঠানগৃহে যখন পৌঁছালাম তখন মঞ্চে কেউ নেই, দর্শকাসন শূন্য। শুধু চার্লি দাঁড়িয়ে বুকে হাত ভাঁজ করে। কেন্ট গাড়িতেই ছিল। আমি ওঁর দিকে তাকাতেই জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছিল? সমস্যাটা বলতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোনদিক দিয়ে এসেছেন? পথে কি কি পড়েছিল?'

সেটা জানাতেই তিনি ঠোঁট কামড়ালেন। যেটুকু বুঝলাম তাতে এমন দাঁড়ায় কেউ যদি গড়িয়াহাটা থেকে শিয়ালদা বড়বাজার ডালহৌসি ঘুরে কালিঘাটে আসতে চায় তবে তার যা অবস্থা হবে আমাদের তা হয়েছে। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। কেন্টকে এর জন্যে জবাবদিহি করতেই হবে। চার্লি বললেন, 'বেচারা জুলি একদম ভেঙে পড়েছে। পনের মিনিট অপেক্ষার পর প্রোগ্রাম ক্যানসেল করেছে। কারো কথা শুনছে না। শুধু কেঁদেই চলেছে। আসুন ড্রেসিংরুমে।'

১৯

চার্লির পেছনে মিনিট খানেক হেঁটে পেঁছে গেলাম ড্রেসিংরুমে। গিয়ে লজ্জায় পড়লাম। একটা বিরাট আয়নার সামনে চেয়ারে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে জুলি। তার পাশে দাঁড়িয়ে আর একটি কালো মেয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। চার্লি নিচু গলায় বললেন, 'জুলি। মিস্টার মজুমদারের দোষ নেই। অযথা ঘুরে দেরি করে ফেলেছেন। কথা বল।'

জুলি মুখ তুলল। আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। লজ্জা থেকে অপরাধবোধের শিকার হয়েছি তখন। কোনোমতে বলতে গেলাম, 'আই অ্যাম সরি জুলি।' সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল সে 'নো! ইউ মাস্ট নট। আমার প্রাপ্য আমি পেয়েছি। কেন এসেছ এখানে। হোয়াই হোয়াই হোয়াই।'

চুপচাপ কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইলাম। পেছন থেকে চার্লি বললেন, 'জুলি একটু ধৈর্য ধরে ওঁর কথা শোন। প্লিজ, ডার্লিং, একটু শান্ত হও।'

'আমি কারো কোনো কথা শুনতে চাই না। লেট মি স্টে এ্যালোন।'

অভিজ্ঞতায় বলে মেয়েদের দু'টো শ্রেণী আছে। নিরানব্বুই ভাগ মেয়ে শিক্ষা সংস্কৃতির তারতম্য সত্ত্বেও অভিমান নামক মারাত্মক অসুখে ভোগে। এক ভাগের অভিমান থাকলেও মস্তিষ্ক পরিষ্কার থাকে। অন্তত সেই মুহূর্তে বোঝালে বোঝে। কিন্তু অপর সংখ্যাধিক্য শ্রেণী সেই সময় কোনো যুক্তি মানতে চায় না। এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ির গ্রামের মেয়ে ননীবালার সঙ্গে লসএঞ্জেলসের জুলি রানীর কোনো ফারাক নেই। পণ্ডিতরা বলেছেন মেয়েদের অভিমানের

সময় খবরদার বোঝাতে যেও না। শতকরা একভাগ তোমার ভাগ্যে জুটবে এমন কথা বলা যায় না। বরং সেই সময় তাদের চোখে চোখে রেখ। যেভাবে টাইফয়েড রোগীর জ্বর মাপতে হয় সজাগ হয়ে সেইভাবে। ওই নিরানব্বুই জনের মধ্যে আটানব্বুইজনেরই অভিমান কাটতে সময় লাগে বিশুদ্ধ বারো ঘণ্টা, কারণ তার মধ্যেই তাকে স্নান করতে হয় অথবা খাবার পরিবেশন করতে হয়। একজনের চলে দীর্ঘকাল। তারাই হয় মারাত্মক। রামদা তার স্ত্রীর অভিমানের কথা বলে-ছিলেন। নেমন্তন্নে যাওয়ার ছিল সন্ধেবেলায়। বন্ধুদের সঙ্গ না এড়িয়ে দু'-পাত্র বাঁচিয়ে ন'টা নাগাদ বাড়িতে পেঁৗছে দ্যাখেন বউদি সাজ খুলছেন। রাম-দাকে দেখামাত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে আরম্ভ করলেন হার, দুল, চুড়ি। অনেক অনুনয় বৃথা গেল। রামদা বলেছিলেন, 'জানো ভায়া, ওই সময় ঈশ্বর মেয়েদের একটা জিনিস জীবন্ত করে দেন। কবে কোনদিন দেরিতে বাড়ি ফিরেছি, কবে কথা দিয়ে রাখিনি এসব সন তারিখ মাস পর্যন্ত কোট করতে লাগল তোমার বউদি। আমার কিন্তু কোনো খেয়াল নেই। শেষে হাতে পায়ে ধরে বললাম, 'যাই বল, তোমাকে আমি ভালবাসি।' বউদি বললেন, 'ছাই।' রামদা আরো গাঢ় গলায় বলেছিলেন, 'দিব্যি দিয়ে বলছি।' বউদি ঠোঁট বেঁকিয়েছিলেন, 'আর কোনো মেয়ে তোমার দিকে তাকাবে না তাই আমায় ভালো বাসছ। রামদা বলে-ছিলেন, বোকার মতো বলেছিলেন, 'প্রমাণ চাও ?'

সঙ্গে সঙ্গে বউদি ডুকরে উঠেছিলেন, 'জানি তো। তার জন্যে তুমি হেদিয়ে মরছ!' গল্প শেষ করে রামদা বলেছিলেন, 'মেয়েদের অভিমান হলো এই জিনিস। হ্যাঁ বললে দোষ না বললে অন্যায়। শাঁখের করাত।'

জুলির ক্ষেত্রে এসব কতটা প্রযোজ্য বুঝতে পারছি না। বললাম, 'জুলি তুমি আমার বোন, তোমার কাছে আমি মিথ্যে বলতে যাব কেন ?'

জুলি চুপ করল। যেন এবার আমার কথা শোনার জন্যে একটা পরিবেশ তৈরি করল। আমি চার্লির দিকে তাকালাম। তিনি ইশারা করলেন, কথা চালিয়ে যাও।

বললাম, 'আজকের প্রোগ্রামে ঠিক সময়ে উপস্থিত থাকব বলেই অনেক আগে বেরিয়ে ছিলাম। কিন্তু পথে এত জ্যাম যে রাস্তা পাল্টে ঘুরে আসতে হয়েছিল।'

চার্লি এবার কথা বললেন, 'ওঁর এসকর্ট হয়তো রাস্তা চেনেন না জুলি।'

'ঠিক চেনে। লস এঞ্জেলসের রাস্তায় একজন অন্ধও ঠিক চলে আসতে পারে। আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল। ওই সাদা চামড়ার লোকটা ইচ্ছে করে ওকে এমন ঘুরিয়েছে যাতে ঠিক সময়ে আসতে না পারে। আর তোমাকেও বলি। ব্যাটাছেলে তো! সবসময় এসকর্টের ওপরে নির্ভর করে না থেকে নিজেই চলে এলে তো পারতে।' জুলির মুখের মেঘ এখন হালকা।

'আমার তো ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই।'

'এত প্ল্যান করেছিলাম সব মাটি হয়ে গেল। আমার যে কি কষ্ট হচ্ছে!'

'আমি বুঝতে পারছি।'

ছাই।'
অভিমান যখন মিইয়ে আসে তখন নীরব থাকতে উপদেশ দিয়েছেন পণ্ডিতরা। থার্মোমিটারে জ্বর নেমে এসেছে দেখে পুলকিত হয়ে গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়েছে কি টাইফয়েড। চড়চড় করে আবার পারা উঠবে। অতএব আমি চুপ করে রইলাম। আমার পেছনে চার্লি। হাত বাড়িয়ে রুমাল টেনে নিয়ে চোখ মুছল জুলি। তারপর বলল, 'যা হবার তা তো হয়ে গেছে। চার্লি দ্যাখো তো কাল হল পাওয়া যাবে কিনা।'
চার্লি মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল। এখন এই সাজঘরে আমি আর জুলি। জুলি বলল, 'তুমি, তোমাকে কখনও কেউ কষ্ট দিয়েছে?'
নীরবে মাথা নাড়লাম হ্যাঁ। এক পলক তাকিয়ে থাকল সে, 'কি রকম?'
'অকারণে ভুল বুঝে। আমি যা করিনি তাই আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে—।'
চোখ ছোট হলো জুলির, 'তুমি আমার কথা বলছ?'
'মোটেই না। ধরো, আমি কাউকে প্রচণ্ড ভালবাসি। সে-ও ওকথা জানে। কিন্তু তার ধারণা আমি নাকি বদলে যাচ্ছি। আর যেই তার মাথায় এই ধারণা ঢুকল অমনি সে আমার সমস্ত আচরণ থেকে দ্বিতীয় একটা মানে তৈরি করে নিতে লাগল। আমি কিন্তু এসব টের পেলাম না। শেষে একদিন সে বলে দিলো আমার পরিবর্তনের জন্যে অপমানবোধ করছে। আমি তখন হতভম্ব। যতই বোঝাতে যাই কিছুতেই সে বুঝবে না। কোনোদিন পাঁচ মিনিট দেরি হলে সে চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় আমি আগে এরকম করতাম না। এটা যে কি কষ্টকর ব্যাপার তা আমিই জানি।' অকপটে বললাম।
'খামোকা সে তোমার মধ্যে পরিবর্তন দেখবে কেন যদি সত্যি সেটা না হয়?'
মাথা নাড়লাম, আমি জানি না। তবে আমার এক পণ্ডিত দাদা এ ব্যাপারে মতামত দিয়েছেন।'
'কি সেটা? শুনি!' জুলির ঠোঁটে এই প্রথম হাসি ফুটল।
'মেয়েদের ভালবাসার কোনো উচ্চতা নেই। বিস্তার আছে। চারপাশে গড়িয়ে গড়িয়ে যায়।'
'হাউ ফানি! তারপর?'
'ওই কারণেই কোনো স্থির মূর্তি তারা তৈরি করতে পারে না। বন্যার মতো সব গ্রাস করে নিতে চায়। কোথাও খাদ থাকলে সেটাকে ভর্তি করে পরের জমিতে যেতে সময় লাগে। সেই সময়টাই নাকি মারাত্মক। বাচ্চারা যেমন অন্ধকারে নানা রকম মূর্তি কল্পনা করে নেয় মেয়েরাও তখন ভালবাসা মানুষকে নিয়ে সেইরকম মূর্তি বানায় মনে মনে। যেহেতু তাদের প্রেম ঊর্ধ্বমুখী নয় তাই কল্পনাটা বাস্তবে ঠোকর খায়। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে অপমান বোধ আক্রমণ করে বসে তাদের।' এই ব্যাখ্যাটা পরম শ্রদ্ধেয় সন্তোষ কুমার ঘোষের। চৌষট্টি বছর বয়সেও যে মানুষটা নিত্য প্রেম নিয়ে ভাবতেন তাঁর সামনে বসলেই মনে হতো আমি সমুদ্র দেখছি। অফিসের চেম্বার, মিনার্ভা হোটেল, রাতদিনের কোণার টেবিল অথবা ডায়মণ্ড হারবারের রাস্তায় কতো শুনেছি তাঁর বিশ্লেষণ।

মানুষটি আজ নেই। মাঝে মাঝে খুব নিঃসঙ্গ মনে হয় তাই।

যাহোক, জুলি কিন্তু সন্তোষদার সঙ্গে একমত হলো না। তার বক্তব্য, হিমালয়ের উচ্চতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই কিন্তু তার বিস্তার নেই একথা মূর্খও বলবে না। কোনো কোনো মেয়ের প্রেম নাকি সেই রকম। আমার পণ্ডিতদাদার দুর্ভাগ্য যে ভারতবর্ষে তিনি সেইরকম মেয়ের সান্নিধ্যে আসেননি। এই সময় চার্লি ফিরে এলো। এসে জানাল আগামীকাল হল পাওয়া যাবে না। আগে থেকেই সব বুক্‌ড হয়ে গেছে।

মাথা নাড়ল জুলি। আমি তখন ঘড়ি দেখছি। সিডনি পয়েটারের সঙ্গে দেখা করার কথা আমার। ওইটেও নষ্ট হোক তা আমি চাই না। জুলি বলল, 'এক কাজ করো। আমার মায়ের বাড়িতে চলো। ওখানে আমাদের ডিনার করার কথা। তুমি আমার গেস্ট। মায়ের বাড়িতে পিয়ানো আছে। ওখানেই তোমায় গান শোনাব।'

খুব খারাপ লাগছিল। কিন্তু বলতে বাধ্য হলাম, 'জুলি। তুমি খুব মুসকিলে ফেললে। একটু বাদেই সিডনি পয়েটারের সঙ্গে আমার এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রয়েছে যে।'

'সিডনি? ও মাই গড! তুমি সিডনির কাছে যাবে?' উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ল জুলি।' 'উনি আমাকে সময় দিয়েছেন।'

'আমি যদি যাই তাহলে তোমার আপত্তি আছে?'

জুলির প্রশ্নের উত্তর দিলেন চার্লি, 'না জুলি। আমি শুনেছি সিডনি খুব কড়া ধাতের মানুষ। যাঁর সঙ্গে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট শুধু তাঁর সঙ্গেই দেখা করেন। তুমি সঙ্গে গেলে সামান্য অস্বস্তিতে পড়বেন।'

জুলি সেটা বুঝল, 'ওকে! তাহলে তোমাকে আটকাবো না। সিডনির সঙ্গে তোমার দেখা হওয়া দরকার। কালোদের মধ্যে সে-ই প্রথম ফিল্মে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে।'

আশ্চর্য! মেয়েটা যেন মুহূর্তেই পাল্টে গেল। আর আবদার অভিমান নেই। এমন কি সেই দুঃখটাও এখন নিচে ঢাকা পড়েছে। আমাকে স্বামীর সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলো, 'তুমি পরশু যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।' হঠাৎ নিজের স্বরে বাষ্প আবিষ্কার করলাম।

'কাল কি করছ?'

'আমার হোস্ট বলেছেন সি ওয়ার্ল্ডে বেড়াতে নিয়ে যাবেন।'

'ও। তাহলে তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না?'

উত্তর দিতে পারলাম না। এই বঙ্গ সন্তান ঘন ঘন লস এঞ্জেলসে আসবে এমন উপায় নেই। জুলি হাসল, 'এই ভালো। আই উইল রিমেম্বার ইউ থ্রু আউট মাই লাইফ। ইউ মে আস্ক মি হোয়াই? আই ডোণ্ট নো, রিয়েলি আই ডোণ্ট নো। কিন্তু তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব। তোমার দেশের বাড়ির ঠিকানা। না, আই উইল নেভার রাইট ইট। চিঠি লেখা আমার ধাতে আসে না। কিন্তু কখনও যদি কলকাতায় যাই তবে তোমাকে চমক দেবো।'

ঠিকানাটা লিখে দিলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল উত্তর কলকাতার অপরিষ্কার ভিড়ের রাস্তা। ধরা যাক জুলি সেখানকার মুদির দোকানে আমার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করছে। সঙ্গে সঙ্গে জনা পঞ্চাশেক বাচ্চা পেছনে ছুটে যাবে। বয়স্করা রকে বসে রায় দেবেন, 'নিগ্রো মেয়েছেলে সমরেশবাবুর কাছে কোন ধান্দায় এসেছে রে!'

দোতলা থেকে বঙ্গললনারা উঁকি মেরে দেখে চোখ বড় করবেন, 'উঃ মা গো! কি কালো! কয়লাও হার মানে।'

তবু লিখলাম। জুলি জোরে জোরে উচ্চারণ করল যা বাংলা শব্দগুলো অদ্ভুত শোনাল। কেন্ট দাঁড়িয়েছিল গাড়ির সামনে, 'মজুমদার, আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

চার্লির সঙ্গে হাত মেলালাম। জুলি দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ ঠিক যেভাবে কোনো বাঙালি মেয়ে বিদায় দেবার সময় দাঁড়িয়ে থাকে। অথচ এই মেয়েটি প্রথম দেখার দিন পুরো লন ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরেছিল! গাড়িতে উঠে সিট বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে মাথা দোলালাম। চার্লি স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে নিজের দিকে টানল। চলন্ত গাড়িতে বসে ভাবছিলাম, কেন এমন হয়? জুলি আমাকে কখনও চিনতো না। অথচ এমন পরমাত্মীয়ার মতো ব্যবহার করতে পারল কি করে। ঈশ্বর পৃথিবীতে মানুষকে পাঠাবার সময় তাদের পূর্বস্মৃতিলোপ করে দেন, সম্পর্কের ওয়েভলেংথ ছিন্ন করে বলে দেন নতুন সম্পর্ক তৈরি কর। কিন্তু তারও মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায় কাজে। কারো কারো ভেতর জন্মান্তরের সম্পর্কবোধ হয়তো তাই থেকে যায়। আচমকা কাউকে, তেমন কাউকে দেখলে সেই বোধ তেজী হয়ে ওঠে, পৃথিবীর চোখে যার ব্যাখ্যা পাওয়া খুব মুসকিল।

কেন্ট গাড়ি চালাচ্ছিল গম্ভীর মুখে। ওর সঙ্গে ঝগড়া করে কোনো লাভ নেই। আমি এখনও জানি না কেন্ট ইচ্ছে করেই জুলির কাছে আসতে দেরি করেছে কিনা। হয়তো কিংবা নয়। আমি শুধু সন্দেহ করতে পারি কিন্তু প্রমাণ করা অসম্ভব। কেন্ট আমার সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি। যা ফিরে আসবে না তার দায় ওর ওপর চাপিয়ে খামোকা সম্পর্ক নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। কেন্ট হঠাৎ বলল, 'আই অ্যাম সরি মজুমদার।'

হেসে বললাম, 'আরে ঠিক আছে। ভাগ্যে ছিল না তাই হলো না।' বলতে অবশ্য ভালো লাগল না।

সিডনি পয়েটারের কাছে পৌঁছাতে আমরা দশ মিনিট দেরি করে ফেললাম। কোনো কোনোদিন এমন হয়। একবার ঘোর লাগলে কিছুতেই কাটতে চায় না। সুদৃশ্য পাড়ায় সুন্দর বাড়ির মালিক সিডনি তখন অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সময় রাখার ব্যাপারে কড়া মনোভাব শুনেছি ইংরেজদের আছে। লাখে এক আধজন বাঙালি পুরুষ মহিলা সেইটে রপ্ত করেছেন। তাদের নিয়েই আমার নাজেহাল অবস্থা। কয়েক লাখের কয়েক গণ্ডা যেন আমার ভাগ্যেই জুটে গেছেন। এখানে এসে দেখলাম সিডনিও ওই দলে। অনেক অনুরোধেও ওঁর সেক্রেটারি আর সাক্ষাতের সময় বের করতে পারলেন না। শেষে দুঃখের

বদলে ঘোল দিলেন, আমি টেলিফোনে কথা বলতে পারি।
তাই সই। সিডনি এখন স্নান করতে চলে গেছেন। সেখান থেকে বেরিয়ে সেজে-গুজে যাবেন পার্টিতে। এখন বাথটবে শুয়ে শুয়েই কথা বলবেন।
রিসিভারে কান লাগিয়ে বললাম, 'হেলো, আমি একজন ভারতীয়। দশ মিনিট দেরি করে ফেলেছি বলে দুঃখ প্রকাশ করছি।'
জড়ানো গলায় ইংরেজি উচ্চারিত হলো। যার বেশ কিছু শব্দের অর্থ বোধগম্য হয়নি আমার। সিডনি বললেন, সম্ভবত বললেন,'কিছু জিজ্ঞাসার থাকলে করতে পারেন।'
'আপনি কলকাতায় খুব পরিচিত। কিন্তু এখনকার ছবিতে বেশি দেখি না কেন ?'
'কারণ আমাকে সুযোগ দেওয়া হয় না।'
'তার কারণ কি ?'
আমার বয়সের আমার চেহারার চরিত্র থাকে না তাই।'
'অভিনেতা হিসেবে কাজ করতে না পারার বেদনা হয় না আপনার ?'
'সেটা আমার সমস্যা, প্রোডিউসারদের নয়।'
'আপনি এখন কি করছেন। এই মুহূর্তে নয়, এখন।'
'একটা ছবি তৈরি করছি।'
'একটা কথা। আমেরিকায় বেশির ভাগ মানুষ কালো। অথচ আমেরিকান ছবিতে সাদাদের ভিড় দেখি। কালোরা থাকলে হয় গুন্ডা নয় তেমন কিছু। কেন ?'
'দ্যাটস দ্য প্রব্লেম। ইন্ডাস্ট্রিটা ওদের হাতে। সাদা কালোর দ্বন্দ্ব বুঝি না। বুঝতে চাই না। কিন্তু অনেক কালো ছেলে প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও সুযোগ পাচ্ছে না চরিত্রের অভাবে। একজন কালো গায়ক যে সুবিধে পায় কালো অভিনেতা তা পায় না। সেক্সপীয়ার ওথেলো একটাই লিখেছেন। আমি যে ছবি তৈরি করতে যাচ্ছি তা কালোদের জীবন নিয়ে। সাদা বন্ধুদের হতাশ করতে হচ্ছে তাদের চরিত্র নেই বলে।' একটু থামল সিডনির গলা, 'ধন্যবাদ। এবার আমার স্নান শেষ করা উচিত। বাই।' লাইনটা কেটে গেল। কিন্তু ভদ্রলোককে আমি অভদ্র বলতে পারলাম না। টেলিফোনে এর চেয়ে বেশি আর কি বলা যেত। তবে আফশোষ থেকে গেল সামনাসামনি না দেখা হওয়ার জন্য। তারপরে মনে হলো, সিডনির ছবি দেখেছি ষাটের দশকে। তখন তিনি যুবক, তরতাজা। এখন নিশ্চয়ই বেশ বয়স্ক। চুলে পাক ধরেছে। দেখলে সিনেমার স্মৃতির সঙ্গে মেলাতে না পারারই কথা।

বোস দম্পতি আমার জন্যে অন্যান্য কাজ থেকে ছুটি নিয়েছেন। ওঁদের বিশাল বাড়িতে আমরা দুপুরের খাওয়া সেরে বেরিয়েছি। কেন্টকে আজ ছুটি দেওয়া হয়েছে। বেরুবার সময় একটা টেলিফোন এলো। প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক জানতে চাইছেন বিকেলে আমরা বাড়িতে থাকব কিনা। উনি খবর পেয়েছেন বোস-পরিবারে একজন লেখক বেড়াতে এসেছেন। বনজ তাঁকে বলে দিলো, থাকছি না।

নিউইয়র্কে মনোজও বলেছিল ব্যাপারটা। এদেশে কেউ কারো বাড়িতে টেলিফোন না করে যায় না। আমি যাঁর বাড়িতে যাচ্ছি তিনি কি পরিস্থিতিতে আছেন না জেনে যাওয়া একটা অপরাধ বলে মনে করে এরা। স্বদেশের বাঙালিরা মনে করে কারো কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে কিছু নেই। যখন তখন হুট করে পরিচিতর বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়লেই যেন তিনি কৃতার্থ করবেন। ধরুন, সকাল বেলায় আপনার কোনো কাজ করার সময় যা একা করতে চান। এই সময় না জানিয়ে আমি হাজির হলাম এবং আপনি যে কাজটা করতে পারলেন না তার জন্য সামান্য দুঃখিতও হলাম না। আপনি যদি পাঁচ মিনিট বাদে বলেন যে আর কথা বলতে পারছেন না কাজের জন্যে তাহলে সারা শহরে আমি আপনার অভদ্রতার বিবরণ বিলিয়ে বেড়াব। আর কাজটা যদি খুব গুরুতর হয় এবং আপনি বলে পাঠান যে দেখা করতে পারছেন না তাহলে সর্বনাশ ডেকে আনলেন। আমি এবং আমার মতো লোকগুলো বুঝতেই চাই না যে খেজুরে আলাপের জন্যে আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনাকে বিব্রত করছি। আপনার সুবিধে মতো সময়ের জন্য অপেক্ষা করা বাঙালির ধাতে নেই। বিদেশে গিয়ে তাদের ভালো গুণগুলো দেখে যদি প্রশংসা করা হয় তাহলে সে দালাল হয়ে যায়। কিন্তু নিজের দেশের বদব্যাপারটা ঢেকে ঢুকে রাখাতেই শান্তি। বিবেকানন্দের বরাত ভালো যে তিনি আঠার'শ বিরানব্বুইতে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। নইলে, 'হে আমেরিকার নারী, তোমাকে প্রণাম', বলার জন্যে সি আই-র দালাল হয়ে যেতেন।

লস এঞ্জেলস থেকে মেক্সিকোর বর্ডার খুব বেশি দূরে নয়। বর্ডার পেরিয়ে মরুভূমিকে ভদ্রস্থ করে নেওয়া রাস্তা ডিঙিয়ে গাড়ি নিয়তই ছোটাছুটি করে। আমেরিকার নাগরিকদের সেখানে যেতে ভিসার প্রয়োজন হয় না। মেক্সিকোতে ঢোকার আগেই জায়গাগুলোর নাম আর ইংরেজি থাকেনি। যে সময় ব্রিটিশরা আমেরিকাকে কলোনি বানাতে চেয়েছিল সেই সময় স্প্যানিশরাও চুপ করে বসে থাকেনি। তারাও পূর্বতট বেয়ে এখানে জেঁকে বসেছিল। ফলে যেদিকে তাকাই স্প্যানিশ নামের ছড়াছড়ি।

বোস পরিবার আমাকে নিয়ে এলেন স্যান দিয়াগোতে 'সি-ওয়াল্ড' দেখাতে। সমুদ্রের তলায় যাদের বাস তাদের এখানে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। সি-ওয়াল্ডের গেটের সামনে বিশাল মাঠে গাড়ি থিক থিক করছে। পার্কিং প্লেস পাওয়াই মুসকিল। আজ হালকা রোদ উঠেছে। শরৎকালের বিকেলের মতো। গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে খুব ভালো লাগছিল। বনজের ছোট মেয়ের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে। ও আমার আঙুল ধরে হাঁটছিল। বাংলার চেয়ে ইংরাজিতেই ও স্বচ্ছন্দ, খুব জেদাজেদি না করলে বাংলা বলতে চায় না। কলকাতার কথা বললে মাথা নাড়ে, 'টু মাচ ক্রাউড, টু মাচ হট, অনলি গ্র্যান্ড মা ইজ ফাইন।' আমেরিকার দ্বিতীয় জেনারেশনের বাঙালিকে নিয়ে মনোজ অনবদ্য লেখা লিখেছে, 'এই দ্বীপ এই নির্বাসন।' এই মেয়েটিও ক্রমশ তার চরিত্র হয়ে যাবে একদিন।

সি-ওয়ার্ল্ডের টিকিট যখন বনজ কাটতে গিয়েছেন তখন আমি একটি নোটিশ বোর্ডের দিকে সকৌতুকে তাকালাম। সেখানে পরিষ্কার লেখা রয়েছে হরেকৃষ্ণ দলের কোনো সদস্যের প্রবেশাধিকার নেই। আমেরিকার বেশ কিছু মানুষ তাহলে হরেকৃষ্ণ সম্প্রদায়কে অপছন্দ করেন। নিশ্চয়ই আইন সম্মতভাবে তাদের ভেতরে ঢোকা বন্ধ করা হয়েছে নইলে ওই নোটিশটি টাঙানো হতো না।

অনেকটা চিড়িয়াখানা দেখার কায়দায় আমরা ঘুরলাম। বিশাল কাঁচের বাক্সে জল ভর্তি করে তাতে বীভৎস চেহারার হাঙর রাখা হয়েছে। ওই কাঁচ ভাঙার সামর্থ্য নেই কিন্তু বিকট জন্তুগুলো যখন মুখ হাঁ করে তেড়ে আসে তখন কাঁচের দেওয়ালের বাইরে দাঁড়িয়েও আঁতকে উঠতে হয়। 'জ' ছবির চরিত্রটি যেন চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঢোকার মুখে অনেকটা ছোট চৌবাচ্চায় বাচ্চা হাঙরদের রাখা হয়েছে। ওদের ভাবভঙ্গি এখনও নিরীহ। বেরিয়ে এলাম। খানিকটা হাঁটতেই একটা ওপেন-এয়ার গ্যালারি দেখতে পেলাম। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। মাঝখানে টলটলে নীল জল। অনেকটা সুইমিং পুলের মতো। জলের গভীরে দুটো বিশাল জন্তু সাঁতার কাটছে। ওপর থেকে তাদের পরিচয় বোঝার উপায় নেই। একদম সার্কাসের মতো এ্যানাউন্সমেন্ট করা হলো, এখনই খেলা শুরু হবে। সুন্দরী সুদেহের অধিকারিণী এক মহিলা সাঁতারের পোশাকে সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতেই জল তোলপাড় হলো। শরীর থেকে জল ঝরিয়ে দুটো ডলফিন প্রায় হাতজোড় করার ভঙ্গিতে জলের মধ্যেই মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর চলল ওদের খেলা। দুটো ডলফিনকে দিয়ে ওরা কতরকমের খেলা খেলাল যার যেকোনো একটাই বিস্ময় উদ্রেক করে। সিংহকে শিক্ষিত করে ট্রেনার যেমন সার্কাসে খেলা দেখায় এরা ডলফিনকে দিয়ে তার পাঁচগুণ ভালো খেলা দেখাল। ডলফিনের পরের ব্লকের সিল-থিয়েটার। এক বোকাসোকা মোটা ভদ্রলোক যেন সিল পরিবারে বেড়াতে এসেছেন। বৃদ্ধ সিল-মাছ তাঁকে আপ্যায়ন করছেন। তাঁর জন্যে খাবার পেটে রাখল। কিন্ত পরিবারের কনিষ্ঠ সিলমাছটি ঢাকা তুলে সেটা চুরি করে খেয়ে গেল। ভদ্রলোক খেতে গিয়ে পাত্র শূন্য দেখলে বৃদ্ধ সীল মাছের কি আফশোষ। রেগে মেগে সে নাতিকে শাস্তি দেবার জন্যে পেছনে ছুটেছে আর নাতি নানান মজা করছে তখন দর্শকরা হেসে কুটোকুটি। একটা বাড়ির ভেতরের ঘরের সেট আর সামনে খানিকটা জল রেখে চমৎকার নাটক করে গেলেন পরিচালক সিল মাছদের নিয়ে। শুধু ওই দলটিকে যদি কলকাতায় আনা যেত···। বনজ মনে করিয়ে দিলেন কলকাতার উত্তাপে সিলদের বেঁচে থাকা মুসকিল হবে। এরপরে মিউজিয়াম। সমুদ্রের তলায় যারা বাস করে প্রায় অধিকাংশের অস্থি সেখানে রাখা আছে। এমন কি জলজ গাছেরা পর্যন্ত।

সকালে উঠেই সাজগোজ। অঞ্জনার মন খারাপ। বললেন, 'আপনারা হঠাৎ আসেন, আমাদের ভালো লাগে, আবার হঠাৎ চলে যান। কি বিচ্ছিরি হয়ে যায় সময়টা তারপর।' বাচ্চারা স্কুলে চলে গেল। ছোটটা যাওয়ার আগে গম্ভীর

মুখে জিজ্ঞাসা করল, 'আঙ্কেল, হোয়েন আই উইল সি ইউ এগেইন ?'
'আমি জানি না মা। তুমি যখন কলকাতায় যাবে.তখন হয়তো।'
'তুমি আর আসবে না এখানে ?'
'আমি জানি না।'
'আঙকল। একটা প্রশ্নের জবাব দেবে ?'
'বল।'
'তোমরা, বড়রা, এত জেনেও কেন প্রায়ই বল জানি না ? তোমরা কি মিথ্যে কথা বল ?'
'না মা। আমরা সত্যিই জানি না।'
কেন্টের পাশে বসে হাইওয়ে দিয়ে এয়ার পোর্টের দিকে যেতে যেতে মেয়েটার কথাগুলো বারংবার মনে পড়ছিল। সত্যি কি আমরা জেনেও না জানার ভান করি ? এরপরে যদি কখনও লস্-এঞ্জেলসে আসি তখন ওই ছোট্ট মেয়েটি অনেক বড় হয়ে যাবে। আর বড় হবার একটাই সুবিধে খুব সত্যি কথাগুলো সরল গলায় জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যাবে।
এয়ার পোর্টে গাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে আমরা যখন বোর্ডিং কার্ড নেবার জন্যে যাচ্ছি তখনই চার্লিকে দেখতে পেলাম। আমি অবাক। চার্লির আসার তো কোনো কথা ছিল না। কেন্টকে আমার টিকিট দিয়ে কার্ড নিতে বলে আমি চার্লির মুখোমুখি হলাম। চার্লি হাসলেন, 'অসুবিধে করলাম না তো ?'
'মোটেই না। খুব ভালো লাগছে আপনাকে দেখে। জুলি কোথায় ?'
'আসেনি। আমাকে পাঠাল। আসলে ও খুব সেণ্টিমেণ্টাল।'
মাথা নিচু করলাম। হঠাৎ চার্লি বললেন, 'আমি তো ঠিক কবি নই। গান লিখি। জুলি সেই গান গেয়ে আরাম পায়। আমি জুলিকে বলেছিলাম সঙ্গে আসতে তা ও বলল, আর কান্নাকাটি করতে চায় না। আমাকেই পাঠালো।'
পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে আমায় দিলেন চার্লি, 'এই গানটা সেদিন আমি লিখেছিলাম। জুলি অনুষ্ঠানে প্রথমেই এই গান গাইবে বলে ঠিক করে-ছিল। আচ্ছা, চলি। আবার নিশ্চয়ই আমাদের দেখা হবে। পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে, আবার দেখা হবে।' একটু নাটকীয়ভাবে চার্লি চলে গেলেন।
কাগজের ভাঁজ খুললাম—

> 'বিন্দু বিন্দু জলবিন্দু জমছে আমার মুখে
> আমার দেহ আমার এ প্রাণ কাঁপছে পরম সুখে
> রোদ্দুর নয় জলবিন্দু জমুক আমার বুকে।'

এই গানে কোথায় আমি আছি ? চার্লি এবং জুলি মিলিতভাবে কি বলতে চেয়েছিল ? উত্তরটা কি আমি জানি ? নাকি সেই ছোট্ট মেয়েটির কথাই সত্যি ! জেনেও বলছি জানি না।

২০

আমেরিকার পূর্বতটে এই অঞ্চলটিকে বলে কালিফর্নিয়া। লস এঞ্জেলস, সানফ্রান্সিসকো, লাভেগাস আর গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান বিরাট সংখ্যায় পর্যটক টানে। মনোজের কাছে শুনেছি লাভেগাস শহর নাকি দিনের বেলায় ঘুমায়। রাস্তায় বেরুলে একটিও মানুষ চোখে পড়বে না। দোকানপাটও প্রায় বন্ধ। সূর্যাস্তের পর শহর জেগে ওঠে। লাভেগাস বিখ্যাত তার জুয়োখেলার জন্যে। দুপা অন্তর ক্যাসিনো। লক্ষ লক্ষ ডলার প্রতি রাত্রে হাত বদল হয় সেখানে। কিন্তু সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা হয় কঠিন হাতে। সরকারি অফিসাররা থাকলেও শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব নিয়েছে ক্যাসিনোর মালিকরা। তারা কিছুতেই বদনাম অর্জন করতে রাজি নয়। তবু রোজ কেউ না কেউ মরছে মারামারি করে এবং এটাকে ঘটনা বলে মনে করা হয় না। কিন্তু লাভেগাস না সানফ্রান্সিসকো—এই দু'টোর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হলে আমি দ্বিতীয় শহরটিকেই বাছবো। কলেজে পড়ার সময় একটি আমেরিকান ছবি দেখেছিলাম যেটি তৈরি হয়েছিল সানফ্রান্সিসকো শহরকে ঘিরে। দারুণ রোমান্টিক ছবি। দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল শহরটাকে আমি চিনে নিয়েছি। সম্ভবত সেই নস্টালজিক ভাবনা সতেজ ছিল বলেই জুয়োর শহর ছেড়ে স্মৃতির শহরে এলাম।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে টিপসি বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হেঁটে গাড়ি ভাড়া দেওয়ার কোম্পানির দরজায় এলাম। কেন্ট সই সাবুদ করে সুন্দর একটা গাড়িতে উঠে

বসল। আমি তার পাশে। দারোয়ানটি হেসে বলল, 'হ্যাভ এ নাইস ডে!' খুব অল্প কয়েকটা শব্দ। সঙ্গে সামান্য হাসি। কিন্তু মন ভালো করে দিলো। বিদেশীদের অনেক কথাই সাজানো কিন্তু কোনো কোনো কথা যদি আমরা বলতে পারতাম তাহলে — ! ভেবে লাভ কি? কেন যে ভাবি!
ভি আই পি রোডের বদলে যদি দমদম এয়ারপোর্ট থেকে ইস্টার্ন বাইপাস রাস্তাটি শহরে আসত তাহলে মোটামুটি এয়ারপোর্ট থেকে সানফ্রান্সিসকো শহরে ঢোকার ছবিটা পাওয়া যেতো। কেন্ট শিষ্ দিচ্ছে আর গাড়ি চালাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন্ট, তুমি কি এমনি মাঝে মাঝেই বিদেশি ট্যুরিস্ট এলে তার সঙ্গে দেশটাকে ঘুরে দেখতে বেরিয়ে পড়?'
'না। যদি ছুটি ম্যানেজ করতে পারি তবেই। আমিও তো এক জায়গায় চাকরি করি।'
'তুমি ফিল্ম তৈরির কাজে আছ?
'হ্যাঁ। কিন্তু সেটাই আমার জীবিকা নয়। পড়াশোনা করেছি, কাজ শিখেছি কিন্তু এদেশে চট করে কাজ করার সুযোগ পাওয়া যায় না। কেউ সহজে জায়গা ছাড়ে না। তোমরা যে ছবিটা করতে যাচ্ছ তাতে যদি আমায় সুযোগ দাও তাহলে আমি সাহায্য করতে পারি।'
'ধন্যবাদ। কিন্তু আমরা হলিউডের ধরনে ছবি করার স্বপ্ন দেখি না। খুবই গরিব প্রডাকসন্স আমাদের। নিউইয়র্কে ফিরে তোমার সঙ্গে মনোজের আলাপ করিয়ে দেবো।' আন্তরিকভাবেই কথাগুলো বলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার স্ত্রী ফিল্মে কাজ করা পছন্দ করবেন?'
'ও আমার কোনো ব্যাপারেই আপত্তি করে না। এই যে আমি চলে এসেছি আর ও রয়ে গেছে দু'টো বাচ্চাকে নিয়ে, কোনো প্রব্লেম নেই। ও চাকরি করে। আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে মা বাবার কাছে যাই। লাঞ্চ করি। ওরাও আমাদের বাড়িতে আসেন।' কেন্ট হাসল।
'তোমার বাবার বাড়িতে কি জায়গা কম?'
'কেন?'
'এই বাচ্চাদের নিয়ে যে আলাদা থাক তাই জিজ্ঞাসা করছি।'
'না, না। এক সঙ্গে থাকলে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাবা মায়ের গোলমাল হবেই। কারণ দু'টো সংসারের দু'টো ধারা। বাবা মা চাইবেন আমার বউ তাঁদের মতো চলুন আবার আমার বউ উল্টোটা চাইবে। এটাকে সহজেই এড়িয়ে যাই আলাদা থেকে সপ্তাহে একদিন এক সঙ্গে কাটিয়ে।' কেন্ট হাসল, 'আমি তোমাদের দেশের ব্যাপারটা শুনেছি। এখানে কেউ যদি সাফার করে তাহলে ছেলেদের কথাই বলতে হয়। তারা নিজের ধারা ত্যাগ করে বউ-এর ধারায় চলতে বাধ্য হয়। কিন্তু মজাটা কি জান, প্রথম দু'তিন বছর ভালবাসায় এমন কেটে যায় যে ওসব ধারার কথা মনে থাকে না। তারপর যখন সন্তান আসে তখন মনে হয় স্বামী-স্ত্রী মিলে নতুন একটা ধারা তৈরি করলাম। নদীর মতো।'
কেন্টের এই ব্যাখ্যা আমার ভালো লাগল। পশ্চিমবাংলায় যৌথ পরিবার ভেঙে

যাচ্ছে বলে আমরা কতই না হাহুতাশ করি। অর্থনৈতিক সমস্যাকে দায়ি করি। কিন্তু সত্যি যদি বিয়ের পর ছেলে বউকে নিয়ে আলাদা থাকত, কোনো কোনো দুর্বলচিত্ত পিতামাতা সত্যিকারের কষ্ট পেলেও, সংসারে শান্তি আসত। অন্তত আর যাই হোক, পঞ্চাশ শতাংশ বউ যন্ত্রণা পেত না, পাঁচ শতাংশ পুড়ে মরত না।

সানফ্রান্সিসকো শহরে ঢুকলাম আমরা। ছিমছাম সুন্দর শহর। ঠান্ডাটা জম-কালো নয়। লম্বা চওড়া বাড়ি কিন্তু নিউইয়র্কের মতো আকাশছোঁয়া নয়। সানফ্রান্সিসকো এসে মনে হচ্ছিল আমি খুব পরিচিত শহরে ঢুকে পড়েছি। হয়তো সেই কবেকার দেখা সিনেমাটি সক্রিয় হয়েছিল। পার্কিং লটে গাড়ি রেখে হোটেলে ঢুকলাম আমরা। রিসেপশনিস্ট জানাল আমাদের নামে ঘর বুক করাই আছে। খাতাপত্তরে সই সাবুদ করতে করতে জানলাম আমার যা কিছু দামি সম্পত্তি হোটেলের লকারেই রেখে দিতে পারি। কোথাও করিনি ব্যাপারটা কিন্তু এখানে করলাম। আমরা যখন কথা বলছি তখন ওপাশের লিফট থেকে এক প্রবীণ বঙ্গ সন্তান নামলেন সঙ্গিনী নিয়ে। সঙ্গিনীটিও বাঙালি। বিদেশে বাঙালি বাঙালিকে দেখলে খুশি হয়। ইনি হলেন না। আমার সঙ্গে চোখা-চোখি হওয়া মাত্র মুখ ফিরিয়ে সঙ্গিনীকে কিছু বলতেই তিনি মুখ নামালেন। তারপর যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে গেলেন সামনে থেকে। বেশ মজা লাগল। দুজনের বয়সের ব্যবধান অন্তত বছর পঁচিশেক। আর মেয়েটিকে খুব চেনা মনে হলো অথচ বুঝতে পারলাম না। কৌতূহলী হয়ে রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই হোটেলে কোনো ভারতীয় আছেন নাকি?'

'হ্যাঁ।' রিসেপশনিস্ট ওদের বেরিয়ে যাওয়ার সময় পেছন ফিরে কাজ করছিল। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রেজিস্ট্রার খুলে বলল, 'ইন্ডিয়া থেকে এক দম্পতি এসেছেন গতকাল। মিস্টার এন্ড মিসেস এস রায়। রুম নাম্বার পাঁচশ সাত। ওরা দে আর ফ্রম ইওর সিটি, ক্যালকাটা।'

কেন্টের ঘর আমার ফ্লোরে নয়। ও আমার ঘরের টেলিফোন নম্বর নিয়ে চলে গেল অন্য লিফট দিয়ে। আমি স্যুটকেস হাতে লিফটে উঠলাম। পাঁচশ পনের নম্বর ঘর আমার। অর্থাৎ পাঁচতলার পনের নম্বরটি আমার জন্যে বরাদ্দ। লিফট থেকে নেমে কার্পেট মোড়া প্যাসেজ ডিঙিয়ে ঘর খুঁজতে খুঁজতে পেতলের চাকতিতে পনের নম্বর পেয়ে গেলাম। চাবি ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই চক্ষু জুড়ে গেল। আকাশী নীল আমার বড় প্রিয় রঙ। আর সেই রঙে ব্যাড-মিন্টন কোর্টের সাইজের ঘরটি সাজানো। স্যুটকেস ফেলে দিয়ে বিশাল লোভনীয় খাটে লাফিয়ে পড়লাম। আঃ, কি আরাম। দুবার পাক দিয়ে স্থির হতেই হঠাৎ মন খারাপ হয়ে গেল। অনেকদিন কলকাতাকে দেখিনি। কলকাতা এখন কেমন আছে? এখন এই মুহূর্তে যদি আমার প্রিয়জনদের কলকাতা থেকে তুলে নিয়ে এই বিশাল ঘরে বসে আড্ডা মারতে পারতাম তাহলে কি চমৎকারই হতো।

মন খারাপ লাগলে আমার শুয়ে থাকতে মোটেই ভালো লাগে না। চটপট উঠে

পড়ে ভারি পর্দা টেনে সরিয়ে দিয়ে শেষ বিকেলের রোদ ঘরে ঢুকতে দিলাম। বাড়িগুলোর মাথা পেরিয়ে, কারও বা ফাঁক গলে আচমকা নীল সমুদ্র দেখতে পেলাম। খুব বেশিদূরে নয় কিন্তু এক চিলতে। আর তখনই দরজায় শব্দ হলো। কেন্ট এলো বোধহয়। কার্পেট মাড়িয়ে দরজা খুলতেই মধ্যবয়সী পুরুষকে দেখতে পেলাম যার হাতে বেশ কিছু ম্যাগাজিন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়েস ?'
'ইওর ম্যাগাজিন স্যার।' সে একটি ম্যাগাজিন এগিয়ে দিলো।
'আই ডোণ্ট নিড এনি ম্যাগাজিন।' মাথা নাড়লাম।
'ইটস ফ্রি অফ কস্ট স্যার বিকজ ইউ আর গেস্ট অফ দি সিটি।' প্রায় জোর করেই ম্যাগাজিনটা ধরিয়ে দিয়ে সমীহ দেখিয়ে চলে গেল লোকটা। গেস্ট অফ দি সিটি! বেশ সম্মানিত মনে হলো নিজেকে। সরকার থেকে কি এদের সবাইকে আমার পরিচয় জানিয়ে দিয়েছে? দরজা বন্ধ করে একটু আলতো জোরে ম্যাগাজিনটা ছুঁড়ে দিলাম খাটের ওপর। পরে চোখ বোলানো যাবে। জামাকাপড় পাল্টে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে খাটের দিকে তাকিয়ে আমি হতভম্ব। ম্যাগাজিন ছুঁড়ে ফেলার সময় আর ফিরে তাকাইনি। হয়তো তখনই পাতা খুলে গিয়েছিল। ইলাস্ট্রেড উইকলির সাইজের ম্যাগাজিনের পাতায় একটি সুন্দরী লম্বা টুলের ওপর বসে মদির চোখে জন্মদিনের পোশাকে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। প্লে-বয় পত্রিকাটি দেখেছি। যৌন রসের মিশেল দেওয়া সেই পত্রিকাটির মতো কি? এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে পাতাটাকে চোখের সামনে ধরতেই পড়লাম, আমি লিসা, আমার ফিগার হলো ছত্রিশ, তেইশ সাঁইত্রিশ। উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি। নিচে যে টেলিফোন নম্বরটি রয়েছে সেটি ব্যবহার করে আমার সঙ্গে কথা বলে চলে আসতে পারো।'
পরের পাতায় একটি সুন্দর খাটে জনৈকা শুয়ে আছেন পায়ের ওপর পা চাপিয়ে। নিচে লেখা, 'আমি কিসি, ছত্রিশ তেইশ সাঁইত্রিশ। আপনি এলে আমার সময়টা ভালো কাটে। নিচের টেলিফোন নম্বরটা দয়া করে ব্যবহার করুন।' পাতায় পাতায় অপ্সরাদের নগ্ন শরীরের ছড়াছড়ি। ম্যাগাজিন না বলে ক্যাটালগ বলা চলে। কিছুক্ষণ দেখলেই মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করে। পেছনের দিকে লেটেস্ট এ্যাড ছাপা হয়েছে। তার ভাষাও অদ্ভুত। 'একটি ফ্ল্যাট সমুদ্রের ধারে ভাড়া নিয়েছি। মাসিক ভাড়া ছয়শ ডলার।' স্বাস্থ্যবান পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। টেলিফোন নম্বর।' 'বিয়ে নয়। শুধু স্টে টুগেদার করতে চাই। আপনাকে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে হতে হবে এবং যেটা দরকার সেটা হলো ভদ্রতা।' 'এই শহরে নতুন এসেছেন? একা? খারাপ লাগছে? যদি দিন সাতেক থাকেন তাহলে আর হোটেলে কেন? সমুদ্রের ধারেই আমার কটেজ। বেডটি, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আফটার নুন টি, আর ডিনারের জন্যে তিরিশ ডলার, বিশ ডলার বিছানার জন্যে দিতে হবে। মদ নিজের পয়সায়। সার্ভিস চার্জ যেরকম সার্ভিস চান সেইরকম। টেলিফোন করবেন বিকেল পাঁচটার পরে কারণ দুপুরে অফিসে থাকি।'
এই বিজ্ঞাপনটি পড়ে মনে হলো একটু বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে। অবশ্য যিনি

বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তিনি পুরুষ না মহিলা জানা যাচ্ছে না। কিন্তু পঞ্চাশ ডলারে থাকা খাওয়া তো বেশ সস্তা। আমার অনেক দিনের শখ ছিল সমুদ্রের ধারের একটা কটেজে থাকব। জানলা দিয়ে ঢেউ দেখতে দেখতে লিখব। যখন লিখতে ইচ্ছে করবে না তখন প্যান্ট গুটিয়ে সমুদ্র সৈকতে হেঁটে বেড়াব। অবশ্যই সেই সৈকতটাকে নির্জন হতে হবে। লাল কাঁকড়াদের দল আমার পায়ের আওয়াজে গর্তে ঢোকার জন্যে ছোটাছুটি করবে তখন দৌড়ে দু-একটাকে ধরব। ছড়ানো পায়ে ঢেউ এসে পড়বে আর আমি পৃথিবী বিস্মোরিত হয়ে বিয়ার খাব। ঝাউগাছে হাওয়ারা শব্দ তুলবে আর আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইব। না। এ আশা পূর্ণ হয়নি। পূর্ণ করার জন্যে যে উদ্যোগ নেওয়া দরকার তা নিইনি কোনোদিন। আজ এই বিজ্ঞাপনটি পড়ে খুব লোভ হচ্ছিল। থাকি বা না থাকি দেখে এলে ক্ষতি কি। এইসময় সেজেগুজে কেন্ট এলো।

ম্যাগাজিনটা দেখালাম ওকে। কেন্ট গম্ভীর মুখে বলল, 'সানফ্রান্সিসকোয় প্রসটিটিউশন খুব চালু। পৃথিবীর সব দেশের মানুষ আসে এখানে। জাহাজঘাটা রয়েছে। জাহাজীদের খুব ভিড়। তোমার সঙ্গে কদিন থেকে আমার মনে হয়েছে তুমি এসবে ইন্টারেস্টেড নও।'

'নই। কিন্তু এর জন্যে পুলিশ কিছু বলে না?'

'যতক্ষণ কেউ তোমাকে বিরক্ত না করছে ততক্ষণ না। এইসব মেয়েদের এজেন্সি চালায়। লক্ষ্য করে দ্যাখো চার পাঁচটা মেয়ের টেলিফোন নম্বর একই। ওটা এজেন্সির নম্বর।'

'এদের আয় কেমন? এজেন্সি কত নেয়?'

'মিনিমাম টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট। টেলিফোনে জিজ্ঞাসা কর না।'

'কি জিজ্ঞাসা করব?'

'তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হবে না। তুমি শুধু বল এই হোটেল থেকে বলছ। রুম নম্বর বলার দরকার নেই। এক্সপেরিয়েন্স হোক।'

হাত কাঁপছিল। তবু প্রথম ছবির টেলিফোন নম্বরটা টিপলাম। রিঙ হলো। একটি নারীকণ্ঠ বলল, 'হেলো।'

'আমি লিসার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কোত্থেকে বলছেন?

হোটেলের নাম বলতেই মহিলা বলল, 'সোজা চলে আসুন। আপনার হোটেল থেকে বেরিয়ে ডান দিকে মিনিট দশেক গেলে একটা ম্যাকডোনাল্ড দেখতে পাবেন। সেটাকে বাঁ দিকে রেখে খানিকটা এগিয়ে গেলে মার্চেন্টস নামে একটা হোর্ডিং দেখবেন। তার উল্টোদিকের বাড়িতে ঢুকে তিনতলায়। এক ঘণ্টার জন্যে দু'শো ডলার। রাত্রে থাকলে পাঁচশো। টাকাটা এখানে না দিতে চাইলে হোটেল বিলের সঙ্গে এ্যাডজাস্ট করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে হোটেল থেকে ক্রেডিট কার্ড নিয়ে আসবেন।' লাইন কেটে গেল।

বিমূঢ় শব্দটির অর্থ সংসদের অভিধানে রয়েছে 'কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানহীন'। বিহ্বল এবং সেইসঙ্গে আর একটি মানে করা হয়েছে, সম্পূর্ণ মুগ্ধ। আমি একই

সঙ্গে তিনটে অর্থাৎ সত্যিকারের বিমূঢ়। একি বাক্যাবলী শুনলাম ? ক্রেডিট কার্ড নিয়ে রেড লাইট এরিয়ায় যাওয়া ? গুজব শুনেছি একদা কলকাতার নামী কবির একজন বারবিলাসিনীর কাছে যাতায়াত ছিল। দু'তিনজন তরুণ কবি এবং লেখকের পরবর্তীকালে যাঁরা বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল জোতিষ্ক হয়েছিলেন বড় সাধ হয়েছিল রমণীতে রঞ্জিত হবার। সেই নামী কবির নাম করে তাঁর বিলাসিনীর কাছে তাঁরা গমন করেছিলেন। সেখানে তবু পরিচিত সূত্র ছিল কিন্তু এখানে তো পুরো আইনসম্মত ধাঁচের ব্যবস্থা।

তারপর যে চিন্তাটা মাথায় এল সেটা সম্ভবত বঙ্গ সন্তান হওয়ার কারণেই। পাঁচশো ডলার মানে ছয় হাজার টাকা। দুশো চব্বিশশো। এক ঘণ্টার জন্যে চব্বিশশো খরচ করতে চান কোন মূর্খ। শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প মনে পড়ল। ডাক্তার তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় কিছু খেয়ে যেতে। তাহলে দিনে চব্বিশ বার খেতে হয়। অথচ শিবরামদা ঘুমাতে ভালোবাসতেন এবং তা বারো ঘণ্টার কমে নয়। রইল বারো বাকি। এর মধ্যে তাঁর স্নান প্রাকৃতিক কর্ম করার জন্যে এক ঘণ্টা এবং অন্যান্য কাজের জন্য একঘণ্টা ব্যয় হতো। রইল দশ ঘণ্টা। শিবরামদা বলেছিলেন দশ ঘণ্টায় চব্বিশ বার খেতে হবে ডাক্তারের বিধান মানলে। বিধান মানে জানো ? চোদ্দ ঘণ্টা যদি ফালতু চলে যায় তো ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়ার লোভ দেখানো কেন বাপু ! অতএব ডাক্তারকে বললাম, পাকা কাজ নয় ঠিকা কাজ করব। দশ ঘণ্টায় ক'বার খাবো বলুন। মানুষের তো ক্ষমতা অসীম নয়। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া, কারণ তিনি মহামানুষ।

তাই বলে চব্বিশো টাকা কম কথা। কেন্টকে ম্যাগাজিনটা দিতে চাইলাম, 'তুমি এটার গতি কর।' কেন্ট হাসল, 'ওইসব বিজ্ঞাপন হলো, আরবদের জন্যে। তৃতীয় বিশ্বের কিছু কিছু লোক লোভে পড়ে ওখানে চলে যায়। কিন্তু তুমি এত বিচলিত কেন ?'

বললাম, 'দ্যাখো আমাদের দেশে এককালে অর্থবানরা রাত কাটাতেন বাইজীর বাড়িতে অথবা বাগানবাড়িতে। তাতে তাদের সম্মান হানি হতো না। তখন টাকার দাম বেশি ছিল। এখন কেউ প্রকাশ্যে ওসব করতে সাহস পায় না। টাকার দামও কমেছে। কিন্তু অতিবড় সুন্দরীও এই অংক স্বপ্নে ভাবতে পারবে না। আমাদের দেশে যাঁরা এই জীবিকায় আছেন এবং থাকবেন তাঁরা যদি কোনোরকমে পাশপোর্ট ভিসা করে এদেশে চলে আসেন তাহলে ফুলে ফেঁপে কি যে হয়ে যাবেন।'

কেন্ট হো হো করে হাসল। তারপর বলল, 'তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' আমার পাঠকরাও কি পারছেন। নিশ্চয়ই অনেকের নাক ইতিমধ্যে কুঁচকে উঠেছে। বেশ অশ্লীল অশ্লীল গন্ধ পাচ্ছেন। ছেলেবেলায় একবার পথ হারিয়ে আমি জলপাইগুড়ির স্বৈরিণী পাড়ায় ঢুকে পড়েছিলাম ভর বিকেলে। তারা আমাকে খুব আদর করেছিল। দশ বছর বয়সে ওদের দেখে একবারও অশ্লীল বলে মনে হয়নি। আসলে শব্দটাকে জানতাম না বলেই কোনো বোধের উদ্রেক হয়নি। অতএব স্যানফ্রান্সিসকোতে যেটা স্বাভাবিক তা বঙ্গ সন্তানদের কাছে

অশ্লীল বলে মনে হতেই পারে। দু'চারজন ছাড়া, যাদের কাছে অশ্লীল শব্দটির প্রকৃত ব্যাখ্যা অস্পষ্ট।

ম্যাগাজিনটা থেকে সেই সমুদ্র সৈকতে পঞ্চাশ ডলারে থাকা খাওয়ার টেলিফোন নম্বর টুকে নিলাম কাগজে। বিজ্ঞাপনটি পড়ে কেন্টও ঠাওর করতে পারল না এটি একই ব্যবসায়ের কিনা। তবে দশচক্রে যেহেতু ভগবানও ভূত হয়ে যান তাই ওই ম্যাগাজিনে ছাপার কারণে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে বসে প্রথমে চলে এলাম সমুদ্রের ধারে, বন্দরে। এইটুকুনি আসতেই মনে হলো, চৌরঙ্গী পাড়া দিয়ে চলছি। রাস্তাগুলো খুব বেশি চওড়া নয়। আর ফুটপাত ভর্তি লোক। একমাত্র নিউইয়র্কের ম্যানহাটন টাইমস্কোয়ার ছাড়া অন্য কোথাও যা দেখিনি। আর সেই জনতায় শুধু আমেরিকান নয়, চিনে, আরব থেকে জাপানি, পাঞ্জাবি পর্যন্ত চোখে পড়ল।

বন্দরে বেশ কয়েকটা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। বেশ বাতাস বইছে। লস এঞ্জেলসের মতো গরম নেই এখানে। কেন্ট দশ মিনিটের জন্যে ওর এক পরিচিতের সঙ্গে দেখা করতে গেল। আর আমি জাহাজটার সামনে বিশাল চাতালে নাটক দেখছিলাম। শম্ভুমিত্র অনেককাল আগে বিভাব করেছিলেন। খালি স্টেজে কল্পিত আসবাব নিয়ে নাটক। চমৎকার হয়েছিল। পরবর্তীকালে বাদল সরকার যে আর এক ধরনের নাট্য আন্দোলন করছেন তাতেও শুধু কুশীলব হলেই চলে যায়। কালো ছেলে মেয়ের এই দলটি নাটক করছে শরীর এবং অভিনয় শক্তি ব্যবহার করে চাতালের ওপর স্টেজ এবং আসবাব ছাড়াই। শুধু পেশীর সঞ্চালনে অভিনেতা অনেক কিছু বোঝাতে পারেন। অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেখে মনে হচ্ছিল, এঁরা জিমন্যাস্টিকের পরীক্ষায় পাশ করে এসেছেন। পথ-নাটিকা বলে এদেশে যে মোটা দাগের ব্যাপার নির্বাচনের আগে করা হয় তা এর ধারে কাছে আসতে পারে না। অভিনয়ের শেষে টুপি পেতে পেতে দর্শকদের ভালবাসার দান নিল কুশীলবেরা।

সমুদ্রের ধারে বেঞ্চিতে এসে বসলাম এবং তখনই গেরুয়া বসনা, মাথায় ঘোমটা, রসকলি আঁকা, গেরুয়া উলের চাদর জড়ানো এক মহিলা পাশে বসলেন। হরেকৃষ্ণ।

চমকে উঠলাম। 'আপনি হরেকৃষ্ণ পার্টি করেন?'

'পার্টি বলছেন কেন? আমি কৃষ্ণের সেবিকা। আপনি তো বাঙালি। আমি নবদ্বীপে ছিলাম কিছুদিন। বাংলাও বলতে পারি।' তিনি হাসলেন।

ভাঙা বাংলা শুনে কোনো সন্দেহ রইল না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে আপনাদের আশ্রম আছে?' তিনি মাথা নাড়লেন, 'আছে। তবে প্রচার করতে দেয় না। লুকিয়ে চুরিয়ে করতে হয়। এই যে লিফলেট।' চাদরের তলায় কাগজ দেখালেন, 'কলসির কানা মারুক তাই বলে' কথা শেষ করতে পারলেন না মহিলা। আচমকা বেঞ্চি থেকে উঠে দৌড়ালেন বাঁ দিকে। দেখলাম ডান দিক থেকে একজন পুলিশ অফিসার আসছেন। মহিলা এমনভাবে মিলিয়ে গেলেন যেন তিনি বাতিল বলে ঘোষিত কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী। কৌতূহল

হলো। চটপট উঠে বাঁ দিকে হাঁটতে লাগলাম। পুলিশ অফিসার সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে আমাকেও দেখছেন। অপরাধ তো কিছু করিনি। সমুদ্রের ধার ছেড়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকলাম। এখান দিয়েই কৃষ্ণপ্রেমিকা গিয়েছেন। দুপাশে দোকান। অনেকটা দার্জিলিঙের ধাঁচের। এবং আর কয়েক পা হাঁটতেই মহিলাকে দেখতে পেলাম। অত্যন্ত সিরিয়াস ভঙ্গিতে এক বৃদ্ধকে তিনি কিছু বোঝাচ্ছেন বন্ধ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। কাছাকাছি হতেই শুনলাম মহিলা বলছেন, 'নো, নট দ্যাট, হি ইজ আওয়ার ফ্রেন্ড, আওয়ার লর্ড, হি ইজ কৃষ্ণ, ইউ ক্যান গেট পিস, লাভ, এ্যান্ড এভরিথিং। তোমাকে কিছুই করতে হবে হবে না, শুধু দুবেলা বলবে হরেকৃষ্ণ হরেনাম। বল, আমার সঙ্গে হরেকৃষ্ণ।'

চুপচাপ ফিরে এলাম। কেমন একটা বোধ মনের মধ্যে তৈরি হলো যা ব্যাখ্যা করা মুসকিল। আমি কোনোদিন কৃষ্ণভক্ত তো দূরের কথা ধর্মীয় সংগঠনগুলো কর্তৃক আকর্ষিত বোধ করিনি। বৈষ্ণব পদাবলী অথবা চৈতন্য চরিতামৃত পড়েছি সাহিত্য হিসেবে। তার কাব্যধর্মীতায় মজেছি। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। হৃদয়ের তাৎক্ষণিক ভালো লাগা জীবনের সঙ্গে জড়াতে চাইনি। আমার শাক্ত-পদাবলীও ভালো লাগে। কথামৃত তো প্রায় বেদের মতো অমৃতসমান। জড়াতে গেলে তো সবার সঙ্গে জড়িত হতে হয়। কিন্তু এই মহিলা আমাকে অস্বস্তিতে ফেললেন অন্য কারণে। একজন মিশনারি যখন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে প্রচার করেন তখন আমাদের খারাপ লাগে। কিন্তু দরিদ্র বঙ্গবাসী কিছু সুবিধের আশায় ধর্মান্তরিত হয়ে যীশুকেই শেষ পর্যন্ত আশ্রয় করে থাকেন। বুদ্ধদেব ধর্ম প্রচার করতে বিদেশে দূত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম প্রচারের চেষ্টা শংকরাচার্যের পরই থেমে গিয়েছিল। সানফ্রান্সিসকোতে যদি আমি হরেকৃষ্ণ শব্দ দুটি পুলিশের তাড়া খেয়ে পালানো বিদেশিনী মহিলার কণ্ঠে শুনি তাহলে ব্যক্তিগত প্রতিরোধ থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার আত্মীয়া হয়ে যান। তিনি কোনো সংগঠনে আছেন, তাদের উদ্দেশ্য কি এসব চিন্তা মাথায় আসে না।

ফিরে এসে দেখলাম কেন্ট হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে। দেখামাত্র জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় গিয়েছিলেন?' হেসে বললাম, 'দরকার ছিল।'

আমেরিকান এসকর্টের একটা গুণ কখনও দ্বিতীয়বার কৌতূহল দেখায় না। ঘড়িতে এখন ছটা। অথচ সন্ধে হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। দুজনে সান-ফ্রান্সিসকোর বন্দরে এলোমেলো হেঁটে বেড়ালাম। বিচিত্র মানুষজন। কিছু গ্রীককে দেখলাম গলা খুলে গান গাইছে। পাশেই চীনে পাড়া। এখানকার চীনে পাড়া খুব বিখ্যাত। আর চীনে পাড়ায় চীনে রেস্টুরেন্ট থাকবে না এটা অসম্ভব ব্যাপার। ভাবতে অবাক লাগে এশিয়ার একটা রাষ্ট্রের মানুষ কিভাবে পৃথিবীর সমস্ত বড় শহরে শুধু জেঁকে বসেন নিজেদের পাড়াও তৈরি করে নিয়েছে। এখন যেকোনো গ্রাম্যচীনে পৃথিবীর অন্যতম শহরগুলোতে গেলে নিজেদের ঘর খুঁজে পাবে। কিন্তু এদের থাকতে হয় অনেক প্রতিবন্ধকতার

সঙ্গে লড়াই করে, চীনে পাড়া মানে বিভিন্ন নেশার আড্ডা এমন ধারণার প্রচারই প্রতিবন্ধকতাগুলো তৈরি করতে সাহায্য করেছে। তবে কলকাতার ট্যাংরায় চীনেরা যেমন প্রায় দুর্গ বানিয়ে বাস করেন, শহরের মধ্যে থেকেও আর একটি শহর তৈরি করে নিয়েছেন, শুনেছি তাঁরা পৌরকরও দিতে চান না। এতটা স্বাধীনতা এখানকার চীনেরা পায়নি। চীনা ভাষাও অনেক, ধর্মও বিভিন্ন। এবং বেশিরভাগ চীনে অত্যন্ত রক্ষণশীল। বাইরের সম্প্রদায়ের মানুষকে নিজেদের সঙ্গে জড়াতে দেন না।

খিদে পেয়েছিল। একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। আমাদের অতৃপ্তি মার্কা রেস্টুরেন্ট। কেন্টের চীনে খাবারে আগ্রহ খুব। দুটো লোমেন বললাম। চাও-মেন বললে ঠকতে হবে। সেই সঙ্গে মাংসের বড়া। অনেকটা চিলিচিকেন টাইপের। একটা বিশ্রি গন্ধ আছে। কেন্টকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল এই খাবারগুলোর এটাই বৈশিষ্ট্য। টেস্ট ভালো, কিন্তু গন্ধটা সহ্য করতে হবে।

কলকাতার চীনেরা বুদ্ধিমান। হয় তারা দীর্ঘদিন ভারতবর্ষে থেকে স্বদেশের রান্না ভুলে গিয়েছেন নয় ভারতবাসীর স্বাদ অনুযায়ী নিজেদের রান্নাটা পালটে নিয়েছেন। যদিও সানফ্রানসিসকোর চীনে রেস্টুরেন্টের খাবার আমেরিকান ছোঁয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

দাম খুব বেশি নয়। ম্যাকডোনাল্ডে এই রকমই পড়ে। এতে পেট ভরে না। একজন চীনে পরিচালক মাত্র চার লক্ষ টাকায় সাদা কালো ছবি তৈরি করেছেন সম্প্রতি। এত কম টাকায় আমেরিকায় বসে আজ অবধি কেউ ছবি তৈরি করতে পারেনি। চীনে ভাষায় তৈরি সেই ছবির পাত্রপাত্রী বিভিন্ন শহরের চীনে পাড়া থেকে সংগৃহীত। কাগজে দেখেছিলাম ছবিটি নিয়ে খুব হৈচৈ হচ্ছে। এমনকি তার সাবটাইটেল বানিয়ে আমেরিকানদের দেখানোও হয়েছে। চার লক্ষ দিয়ে ছবি করা যায় কোনো পরিচালক স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না ওখানে। আমাদের দেশে নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়রাও কষ্টেসৃষ্টে ছবি করলে চার সাড়ে চার লাখে গিয়ে দাঁড়ায়। এই চীনে পরিচালকটির সঙ্গে নব্যেন্দুদের যোগাযোগ হওয়া উচিত। শুনেছি ছবির বিষয় আর বলার ধরনেও নাকি ভদ্রলোক চমক সৃষ্ট করতে পেরেছেন। কিন্তু যে জিনিসটা নব্যেন্দুরা পাননি তা হলো ওই একটা ছবি থেকেই কয়েক লক্ষ ডলার রোজগার করা সম্ভব হয়েছে।

দাম মিটিয়ে বেরিয়ে আসার মুখে পাবলিক টেলিফোন নজরে পড়ল। পকেট থেকে কাগজ বের করে বোতাম টিপলাম। সাড়া পেতেই পয়সা ফেললাম। ছিমছাম একটি মহিলা কণ্ঠ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাই বলুন?'

বললাম, 'আমি একজন ইন্ডিয়ান, একটা বিজ্ঞাপন দেখে ফোন করছি।'

'হ্যাঁ বিজ্ঞাপন আমিই দিয়েছি বলুন।'

'ওটা কি এখনও খালি আছে?'

'এখনও। অন্তত জনদশেক ভালো মানুষের ছেলে এসে দেখে গিয়েছে। একজন বলেছে আগামী সপ্তাহ থেকে এসে থাকবে। আপনি কদিন থাকবেন?'

'কয়েকটা দিন।'

'আপনি ইন্ডিরা গান্ডির দেশের লোক ?'

'হ্যাঁ।'

'চলে আসুন। এসে দেখে যান। পছন্দ উভয়পক্ষেরই হলে থাকতে পারেন। ঠিকানাটা বলছি, লিখে নিন। আমি কেন্টকে রিসিভার দিলাম, ও আমার চেয়ে ভালো বুঝতে পারবে।

২১

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, আমার তরল আচরণ কেন্টের ভালো লাগত না। অবশ্য এই ভালো না লাগাটা ও কখনই সক্রিয়ভাবে বোঝাতো না। ওকে আমার প্রায়ই দার্শনিক মনে হতো। যে কোনো কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবে এবং মনে মনে তার বিশ্লেষণ করে। রসিকতা করে খুব সৌজন্য রেখে। শিল্প সাহিত্যের কোনো তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেলে খুশি হয়। তখন ওকে দেখে খুব সিরিয়াস বলে মনে হয়। অতএব হোটেল থেকে টেলিফোনে জিজ্ঞাসাবাদ করা-টাকে কোনক্রমে সহ্য করলেও আমি যে ওই মহিলার বাংলোয় যেতে চাইবো তা বিশ্বাস করতে পারেনি সে। সত্যি কথা বলতে কি কেন্ট-এর সঙ্গে আলাপ হলে আমেরিকান জাত সম্পর্কেই অন্যরকম ধারণা তৈরি হয়ে যাবে। আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনেরা কেন্টের মতো একজন বংশধর পেলে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারবেন।

কেন্ট বলল, 'মজুমদার, আমরা তো একটা ভালো হোটেলেই আছি, ওখানে যাওয়ার কি খুব প্রয়োজন আছে? দূরত্বটা অবশ্য তেমন কিছু নয়, তবুও!'

বললাম, 'কেন্ট, আমি একটু ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি। একটা সময় ছিল যখন আমার থাকার জায়গা ছিল না কলকাতা শহরে। তখন আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে থাকতাম।'

বাক্যব্যয় না করে সে আমাকে নিয়ে গাড়িতে উঠল। সমুদ্রের ধারে যাওয়ার জন্যেই সম্ভবত সমুদ্র ছেড়ে ভেতরে ঢুকলাম আমরা। কেন্ট জিজ্ঞাসা করল,

'তুমি ঘুরে ঘুরে থাকতে বললে। তোমাদের দেশে যাযাবর আছে বলে মনে হয় না।'

বললাম, 'যাযাবর আছে। তবে তারা জাতে বাঙালি নয়। ঘুরে ঘুরে থাকতাম মানে একসময় কলকাতা শহরের হেন জায়গা কম ছিল যেখানে আমি থাকিনি। পাক্কা ছ'মাস তিরিশ টাকায় মাস চালিয়েছি। একটাকা দিনের জন্য বরাদ্দ। তাতেই খাওয়া ঘোরা। অথচ সেই সময় আমার একটুও কষ্ট হতো না।'

কেন্ট আমার দিকে তাকাল, 'ইন্টারেস্টিং। তারপর ?'

আমি ছোট চোখে তাকালাম। আমেরিকানরা ইন্টারেস্টিং বললে, নাকি বোঝায় তোমার গল্প আর আমার ভালো লাগছে না, বলছ তাই শুনছি। কিন্তু কেন্টের মুখ দেখে আমার তা মনে হলো না। কিন্তু স্যানফ্রান্সিসকোর সমুদ্র আবার দেখা যাচ্ছে। এইসময় মাঝরাত্রে কুকুরের চিৎকার সামলে সুনীলদার অনুমতিতে পাওয়া তাঁর অফিসের টেবিলে শুতে যাওয়ার গল্প বলতে একদম ভালো লাগল না। একটা সময় ছিল যখন অভাব আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরত অথচ অভাবটাকে আমল দিতাম না বলেই কষ্ট পেতাম না। এখন আরামের প্রায় চূড়োয় উঠে সেইদিনগুলোকে মনে পড়লেই ঘটনাটা শোনাই পাঁচজনকে। দেখাই, আহা কি লড়াই করতে হয়েছে আমাকে। একেই যন্ত্রণাবিলাপ বলে কিনা জানি না। কিন্তু চোখ বন্ধ করলে তখনকার আমার মুখকে অত কষ্টেও যখন দুঃখী দুঃখী বলে মনে হয় না তখন তার গল্প বলে বুক ফুলিয়ে কি লাভ। দ্যাখো কি কষ্টে ছিলাম বলার সময় কি আড়ালে থাকেনা এই কথাটা, এটাও দ্যাখো আমি কোন স্তরে উঠে এসেছি ?

অতএব কেন্টকে বললাম, 'ওসব পুরোন গল্প আর আমার ভালো লাগে না। এখন নতুন অভিজ্ঞতার জন্যে বেঁচে আছি। আশা করি, আজ সেরকম একটা কিছু হবে।'

কেন্ট অবাক হলো, কিন্তু কিছু বলল না। ছেলেটির গুণ এইটেই। বুঝে নিতে পারে কখন থামতে হয়। একবার মাথা নেড়ে সে নিবিষ্ট মনে গাড়ি চালাতে লাগল।

সমুদ্রের ধার রাস্তা ঘেঁষে চলে গিয়েছে। মাঝে মাঝে সাইনবোর্ডে দিক নির্দেশ করা রয়েছে। কেন্ট বারংবার সেটা যাচাই করছিল। এদিকটায় বসতি বেশি নেই। বালি আছে, কিন্তু তার ওপর ঘাসও রয়েছে। আকাশে দিব্যি আলো ফুটে রয়েছে। ঢেউ খুব মারাত্মক নয় কিন্তু মৃদু আওয়াজ তুলছে। রাস্তাটা যেখানে বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানেই শুরু হয়েছে আর একটা কাঁচা রাস্তা যেটা সমুদ্রের দিকে নেমে গিয়েছে। কটেজটা তার গায়ে। পাশাপাশি পরপর তিনটে কটেজ। প্রথমটির নিচ তলায় অফিস। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে এক দীর্ঘাঙ্গিনী সিগারেট হাতে বেরিয়ে এসে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে পঞ্চাশে পা দিয়েছেন কিন্তু শরীর দেখে বোঝা যাচ্ছে না। আমেরিকার যে কোনো শহরের চেয়ে লস-এঞ্জেলস এবং সানফ্রান্সিসকোতে বেশি গরম পেয়েছি তবু সানফ্রান্সিসকো লসএঞ্জেলস-এর চেয়ে অনেক বেশি আরামদায়ক। কিন্তু

এখানকার সমুদ্রের ধারে মহিলাদের পোশাক স্বল্প হয়ে যেতে লক্ষ্য করেছি। ইনি পরেছেন একটা খাটো প্যান্ট আর হাতকাটা গেঞ্জি। আমরা গাড়ি থেকে নামতেই সিগারেট না-ধরা হাত আকাশের দিকে তুলে বললেন, 'হা-ই।' ওয়েল-কাম। ওয়েলকাম ইন মাই প্যারাডাইস।'

সুন্দরী ছিলেন। অবশ্যই। এবং ছিলেন বলাটা যুক্তিসঙ্গত কিনা তা নিয়েও একটু ভাবতে হবে। শুধু মুখ কিংবা শরীর নয়, মেয়েদের সৌন্দর্য যে তাদের বলার ধরনে, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে হাঁটাচলাতেও—এই ধারণা নিরানব্বুইভাগ বঙ্গললনা খেয়ালই আনেন না। ওইসব কুশলী একাংশকে সাধারণ মানের হলেও অসাধারণ দেখায়। ইনি সেই কায়দাটি জানেন। কেন্ট আর আমি পাশাপাশি এগিয়ে যেতেই তিনি সিগারেট না ধরা হাতটি বাড়িয়ে করমর্দন করলেন। সেটি ডান হাত নয়। এবং স্কাউটেই শুনেছি বাঁ হাতে করমর্দন করার চল ছিল। ভুল হলেও হতে পারে। কেন্ট আমার পরিচয় দিলো। তিনি তাঁর অফিসঘরে আমন্ত্রণ জানালেন। হোটেলের অফিসঘর যেমন হয় এটিও তেমনি। তফাৎ শুধু আমাদের চেয়ারে বসতে বলে তিনি দুহাতের পাঞ্জায় ভর করে শরীরটাকে টেনে টেবিলের ওপর রাখলেন, 'আপনি সমুদ্র ভালবাসেন? ওহো। তাহলে তো আপনার সঙ্গে আমার খুব মনের মিল। আসলে আমার ষষ্ঠ স্বামীর সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসে মনে হলো যদি কটেজ করা যায় তাহলে আমার মতো অনেক সমুদ্রপ্রেমিক চমৎকার থাকতে পারবে। ব্যস, যেই ভাবা সেই কাজ।'

কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আর আপনার স্বামী মিলেই এটা চালান?'

'না। আমি একাই একশ। ওর সঙ্গে গতবছর ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে।' মহিলার কথা শোনামাত্র দেখলাম কেন্টের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। এ ছোকরার নিশ্চয়ই পশ্চিমবাংলায় জন্মানো উচিত ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার কটেজ খালি আছে?,

'দুজনেই থাকবেন?'

কেন্ট আমার দিকে অসহায় চোখে তাকাল। আমি হেসে বললাম, 'না। আমি একাই থাকব। কিন্তু আমি সমুদ্র দেখতে পাবো এমন জানলা চাই।'

'সরি জেন্টলম্যান। সমুদ্র দেখতে হলে দু'পা হেঁটে আপনাকে সমুদ্রের কাছে যেতে হবে। আমি ইচ্ছে করেই জানলাগুলো এমনভাবে করিয়েছি যাতে সমুদ্র না দেখা যায়। হি ইজ সো বিগ, আমরা একে এটুকু অনার দেবো না কেন?' বলেই মহিলা চোখ বন্ধ করে কাঁধ ঝাঁকালেন।

আপনি কিন্তু বলেননি ঘর খালি আছে কিনা?'

'নেই। একার জন্যে নেই। কিন্তু আপনি আর একজনের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন। ইনফ্যাক্ট আমার কটেজের প্রতিটি রুমই ডবলবেডেড্। দামি জিনিস সঙ্গে থাকলে লকারে রেখে যান। সকাল থেকে রাত যা যা প্রয়োজন সব পেয়ে যাবেন। আপনার কি মনে হয় না দামটা খুব সস্তা?'

'খুব। তবে অজানা লোকের সঙ্গে থাকাটা কন্সিডার করলে—'

'দ্যাটস নাথিং। আপনাকে একদিনের টাকা এডভ্যান্স দিতে হবে।'

'আমি একবার একটু ঘুরে দেখতে চাই।'
'ও সিওর। চলুন আমি দেখাচ্ছি।'
মহিলার সঙ্গে বাইরে এলাম। বালির ওপর সমুদ্রের জল গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। আকাশ রঙ পাল্টাচ্ছে। হাওয়া দিচ্ছে চমৎকার কিন্তু দিন নেভেনি। মহিলা বললেন, 'আগে একটু সমুদ্রের গা ঘেঁষে হাঁটুন। মন ভালো হবে।'
হাঁটলাম। এই নির্জন বালুবেলায় জোড়ায় জোড়ায় সাদা নারী পুরুষ শুয়ে আছে, এবং একমাত্র কটি বস্ত্র ছাড়া তাদের অঙ্গে কোনো বাহুল্য নেই। বেশির-ভাগই উপুড় হয়ে এবং সমুদ্রের জল তাদের শরীর বেয়ে ঘাড় অবধি উঠে আবার নেমে যাচ্ছে। মহিলা বললেন, 'দিস ইজ হেভেন, তাই না ?'
এবং তখনই আমি আর কেন্ট একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমাদের চোখের সামনে এক জোড়া নারী পুরুষ চিৎ হয়ে শুয়ে। নারীটির শরীরে কিঞ্চিত বস্ত্র রয়েছে। ওদের চোখ বন্ধ। এবং নারীটি আমাদের দু'জনেরই চেনা।
কেন্ট প্রথম কথা বলল, 'মাইগড' ! শী ইজ হিয়ার !'
'মহিলা ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার কথা বলছ ? ওহো ! ওরা। সো সুইট। ওরা কাল বিকেলেই পেঁছেছে। হনিমুন ট্রিপ। ওদের চেন তোমরা ?'
কেন্ট বলল, 'মহিলার সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল।' বলতে না বলতে পুরুষটি চোখ খুলে পাশ ফিরে নারীটিকে চুম্বন করল। নারী চোখ বন্ধ করেই হাসল। আমরা দ্রুত জায়গাটাকে এড়িয়ে এলাম। কেন্টকে বললাম, 'দ্যাখো সেই বিকেলে বেচারা হন্যে হয়ে স্বামী খুঁজছিল যাতে আমেরিকায় থাকতে পারে বিয়ে দেখিয়ে। ভাগ্যবতী বলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে স্বামী পেয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, সেই স্বামী ওকে হনিমুনে নিয়ে এসে আদর করছে। আমাদের তো খুশী হওয়াই উচিত, কি বল ?' কেন্ট মাথা নাড়ল, কোনো উত্তর দিলো না।
বেশির ভাগ কটেজের দরজায় তালা। মহিলা বললেন, 'আগে আমার এখানে তালা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। মাঝখানে চুরি হতে আরম্ভ করল, তাই বোর্ডারদের তালা চাবি দিয়েছি।'
সিঁড়ি দিয়ে উঠে লম্বা বারান্দা। দুপাশে দুটো ঘর। বারান্দায় চেয়ার রয়েছে। একটা ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। অন্যটা আধখোলা। মহিলা দরজায় শব্দ করলেন, 'আমরা ভেতরে আসতে পারি ?' ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের আওয়াজ বেরুল, 'তিরিশ সেকেন্ড'।
কেন্ট ওঠেনি। সে বালির চরে দাঁড়িয়ে সূর্য দেখছে। সমুদ্রের ওপর নেমে এসেছে অনেকটা। লালে লাল আকাশ-সমুদ্র। এবার ভেতর থেকে আহ্বান এল। মহিলা আমার দিকে ইঙ্গিত করে ভেতরে ঢুকলেন। ওপাশের জানলা খোলা। তাই দিয়ে কিছু আলো ঢুকছিল। এ পাশের খাটের গায়ে পড়ারবাতি জ্বলছে। যিনি শুয়ে আছেন তাঁর হাতে বই ধরা। সেই অবস্থায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার কাছে এসেছেন।'
মহিলা বললেন, 'না-না, আপনি পড়ুন।' তারপর আমার দিকে ঘুরে বললেন,

'এইটে আপনার খাট। পাশে একটা ছোট টেবিলও আছে। ওপাশে টয়লেট যা ওঁর সঙ্গে শেয়ার করতে হবে। চমৎকার ব্যবস্থা। কি পছন্দ হয়েছে তো ?'
আমি আর একবার পার্শ্ববর্তিনীকে দেখলাম। অমন বিশাল চেহারা এ জীবনে আমি দেখিনি। শুয়ে আছেন, তবু মনে হলো পাঁচ ফিট এগারো কি ছ' ফিট লম্বা। ছেলেবেলায় একজন মহিলাকে আমি মুভিং ক্যাসেল বলতাম আড়ালে। তিনি এঁর কাছে শিশু। যেন বিছানায় একটি বিশাল তিমি শুয়ে আছে যার উর্ধ্বাঙ্গে আল্‌পস, মাঝখানে কুলু ভ্যালি এবং নিম্নাঙ্গে বিন্ধ্যাচল পর্বত দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। মহিলা না ফর্সা না কালো। মাথার চুলে কোঁকড়ানো ভাব আছে। আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে মালিকান বললেন, 'আপনার রুমমেট খুব পড়ুয়া। দিনরাত পড়ে বলে সমুদ্র দেখার সময় পায় না।' তৎক্ষণাৎ ওই বিশাল শরীর থেকে মিহি গলায় শব্দ বেরিয়ে এল, 'ভুল হলো। সমুদ্র দেখতে চাই না কিন্তু শব্দ শুনতে চাই।'
বলল।ম. 'সূর্যাস্ত হচ্ছে, বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে হয় না।'
ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার মুখে দেখলাম মহিলার বালিশের পাশে স্তূপ করে রাখা আছে পুরো পত্রিকা। এবং তাতেই তিনি ধ্যানমগ্না। হাতের বইটি সেই শ্রেণীর হওয়াটাই মনে হলো স্বাভাবিক। বালিতে নেমে আমি সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই মহিলার সঙ্গে আমাকে একঘরে থাকতে হবে ?'
'ওহো। ' ও মোটেই খারাপ নয়। গতবছরও এসেছিল। কেউ ওর বিরুদ্ধে কোনো কমপ্লেন করেনি। একটু মোটাসোটা বটে, কিন্তু তাতে তোমার কি ? তুমি এসেছ সমুদ্রের কাছে। দেখো, সারাদিন রাত এখানেই পড়ে থাকবে।' হাত নেড়ে সমুদ্রতট দেখিয়ে দিলেন তিনি। এই প্রথম কেন্ট আমার কোনো ব্যাপারে নাক গলাল। বোধহয় বেচারা আর চুপ করে থাকতে পারছিল না, বিনীতভাবেই বলল, 'আপনি জানেন না, ইনি তো ভারতীয়, আর ভারতীয়রা কখনই অপরিচিত মহিলার সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটায় না।'
আচমকা একরাশ বিরক্তি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ভদ্রমহিলার মুখে, 'তোমরা এখানে পৌঁছালে কিভাবে ? ওই কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে, তাই না ? ওই কাগজ যখন কোনো ভারতীয় পড়ে তখন সে একজন পাঠক হিসেবেই পড়ে নিশ্চই। আর ভারতীয় বলছ ? এই তো গত সপ্তাহেই একজন এসেছিল। কি নাম যেন হ্যাঁ, হ্যারি মিটার। আমাকে ভারতীয় দেখাতে এসো না তোমরা। মোদ্দা কথা বলো, থাকবে কি থাকবে না ? আমার যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে।'
কেন্ট সম্ভবত চূড়ান্ত কথাটাই বলতে যাচ্ছিল, ওকে বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনি খুব রেগে গিয়েছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, অত মোটা মানুষ এক ঘরে থাকলে আমার ঘুম হবে না। তাছাড়া আমার খুব নাক ডাকে। ওঁরও অসুবিধে হবে। আপনি যদি আমাকে পুরো ঘর দেন তাহলে ভালো হয় !'
ঠোঁট কামড়ালেন মহিলা, 'নাক ডাকে তা এতক্ষণ বলনি কেন ? আচ্ছা, আধঘণ্টা এখানে ঘোরাফেরা কর, আমি দেখছি।' বলে তিনি বড় বড় পা ফেলে চলে গেলেন তাঁর অফিসঘরের দিকে।

কেন্ট এবার শব্দ করে হেসে ফেলল, 'ওঃ সত্যি, তোমার মাথায় চমৎকার বুদ্ধি খেলে। নাক ডাকার ব্যাপারটা আমার বুদ্ধিতে কখনই আসত না। আমরা কি এবার শহরে ফিরে যেতে পারি ?'

হেসে বললাম, 'উনি যে অপেক্ষা করতে বললেন !'

জানতাম এতে কেন্ট খুব বিরক্ত হবে। হলোও। বলল, 'সত্যি কি তুমি এই-খানে থাকতে চাও। আমি তোমাকে বুঝতে পারছি না।'

'এখানে থাকতে অসুবিধা কি আছে ! নিজের মতো একটা ঘর পাওয়া গেলে, আর এ যাই হোক এটা তো কোনো ব্রথেল নয়।'

'না, তা নয়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সিঙ্গল মানুষরা এখানে ক'দিন এসে অন্যের সান্নিধ্য নিয়ে যায়। মালিকানকে দেখে মনে হলো যে রেট তিনি বিজ্ঞাপনে বলেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি অন্য খাতে নিয়ে নেবেন।'

কেন্টের কথাগুলো এর আগেই আমার মাথায় এসেছে। একেবারে নির্ভেজাল স্বাস্থ্যনিবাস এটা নয়। কিন্তু এতক্ষণ থেকেও আমরা কোনো গর্হিত ব্যাপার দেখতে পাইনি। আমেরিকান উপন্যাসে যেসব সমুদ্রতীরের কটেজের বর্ণনা পড়েছি তার সঙ্গে খুব অমিল নেই বলেই আমার ভালো লাগছিল এখানে এসে। কিন্তু বুঝতে পারছি না প্রতিঘরে একজন করে মহিলা এখানে অপেক্ষা করেন কিনা।

একটু অলসভাবেই আমরা গাড়ির দিকে এগোচ্ছিলাম। সূর্য এখন ডুবুডুবু। সমুদ্র থেকে দ'জোড়া নারী পুরুষ কটেজে ফিরছে। হঠাৎ তাদের একজন দাঁড়িয়ে পড়ল। সদ্য বিবাহিতা ডরোথি হাত নেড়ে চিৎকার করল কেন্টের দিকে তাকিয়ে, 'হাই !'

'আমি তোমাকে চিনি, কোথায় দেখেছি বলো তো !'

কেন্ট একটু অপ্রস্তুত গলায় বলল, হ্যাঁ, আমিও তোমাকে দেখেছি।'

তিন চারটে জায়গার নাম বলে গেল ডরোথি। কোমর জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডরোথির স্বামী। স্ত্রীর এমন উচ্ছ্বাসে একটু যেন বিরক্ত। মিলছে না দেখে ডরোথি আমার দিকে তাকাল। চোখ ছোট হলো, তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'লস-এঞ্জেলস। এই তো কয়েকদিন আগে। হোয়েন আই ওয়াজ ইন ট্রাবল। আমার সমস্যাটার কথা তোমরা জানো। জানো না ? আর ভুল হবে না। তোমরা শুনলে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে যে সেই সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেছে। পরের দিনই জনের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। মিট জন, হি ইজ এ নাইস বয়।'

আমরা দু'জন বাধ্য হয়েই নিজের নাম বলে জনের সঙ্গে করমর্দন করলাম।

জন বলল, 'ডার্লিং, তোমার ঠান্ডা লাগবে।'

ওর গালে হাত বুলিয়ে দিয়ে ডরোথি বলল, 'ও জন, কি ভালো তুমি। ঘর থেকে যাহোক একটা কিছু এনে দাও আমায়, কতদিন পরে দেখা হলো আমাদের, একটু কথা বলি। জাস্ট পাঁচ মিনিট, প্লিজ।'

কাঁধ সামান্য নাচিয়ে জন চলে গেল কটেজের দিকে। আমার মনে হলো এসব কথার আড়ালে ডরোথি জনকে বলল তুমি কেটে পড় আমি পাঁচ মিনিট বাদে

আসছি। এবার কেন্ট বলল, 'যাক, তোমাকে নিশ্চিন্ত দেখে ভালো লাগছে। একদিনেই বর পেয়ে গিয়েছে, ইউ আর লাকি।'
'না না, আমি জানতাম পাব। তবে না পেলে দেশে ফিরে যেতে হতো বলে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। একসঙ্গে থাকব বলে সবাই লাফিয়ে আসে কিন্তু বিয়ে করতে বললে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না এই দেশে।' বিপদ পার হয়ে এসে পিছু তাকিয়ে যেভাবে মানুষ কথা বলে সেইভাবে বলল ডরোথি।
'জনকে কিভাবে খুঁজে পেলে?' জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না।
'ওয়েল, ওটা একটা গল্পই বলতে পার। আমার এক বান্ধবীর কথায় সেই রাত্রে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এসেছিলাম আগামীকালই বিয়ে করতে চাই। বেলা বারোটা পর্যন্ত কেউ এল না। নট এ সিঙ্গল কল। আমার মনের অবস্থা বুঝতেই পারছ। সেই রাতটা কেটে গেলেই পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারে বেআইনিভাবে আমেরিকায় আছি বলে। হঠাৎ জনের কথা মনে পড়ল। ওঁর সঙ্গে দু'বছর আগে দেখা হয়েছিল। তখন জন বিবাহিত। শুনেছিলাম ওর স্ত্রী ডিভোর্স নিয়েছে। কোর্ট ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে জন ইম্পোটেন্ট। বেচারা খুব মন মরা হয়ে ছিল। কোনো মেয়ে কাছে ঘেঁষত না। সোজা ওর কাছে চলে গেলাম। আমাকে দেখে জন খুব অবাক হলো। আমি ওকে বিয়ের প্রস্তাবও দিলাম। ও ওর অসুবিধার কথা বলল। আমি বললাম মাইনাস সেক্স পুরুষ মানুষের আলাদা যে অস্তিত্ব আছে আমি তাকে অনার করব। ও যেন প্রাণ ফিরে পেল. আমরা সেদিনই বিয়ে করলুম।'
এইরকম গল্প কি মহাভারতে আছে? ব্যাসদেবের ওপর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। কিন্তু জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না. 'সবই ঠিক, তবে তুমি তো এখনও যুবতী. নিজের কথা ভেবেছ? মা হতে চাইবে না তুমি?'
ডরোথি রহস্যময় হাসি হাসল, 'দেখা যাক। একবার অভিজ্ঞতা হয়েছে জনের, এবার মনে হয় খুব একটা কনজারভেটিভ হবে না। আচ্ছা, চলি। আমাদের জন্যে তোমরা একটু শুভেচ্ছা রেখ।' হাত নেড়ে কটেজের দিকে চলে গেল ডরোথি। কেন্ট চাপা গলায় বলল, 'অদ্ভুত।'
আমি জিজ্ঞাসা করলাম. 'বিয়ের পর ডরোথি আমেরিকান সিটিজেনশিপ পেতে পারে নিশ্চয়ই কিন্তু তারপর যদি ডিভোর্স হয়ে যায় তাহলে কি ও সেটা হারাবে? তোমার কি মনে হয় কেন্ট?'
কেন্ট হেসে ফেলল. 'মনে হয় না। কিন্তু এভাবে চললে তো একসময় আমেরিকা ডিভোর্স মেয়েতে ভর্তি হয়ে যাবে।'
আমরা গাড়ির কাছে পৌঁছতেই একটা পুলিশের জিপ যেন ঝড় তুলে ছুটে এলো। আমাদের সামনে ব্রেক কষে দাঁড়াতেই দু'জন অফিসার লাফিয়ে নামল। একজন আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা এখানে থাকেন?'
কেন্ট বলল, 'না। বিজ্ঞাপন পড়ে দেখতে এসেছিলাম।'
গাড়ির আওয়াজ পেয়ে সেই সুন্দরী দরজায় এসে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'গুড ইভিনিং অফিসার্স। গাড়ি অত জোরে চালানো ঠিক নয়। এখানে স্পিড

মিট চল্লিশ।'

কজন অফিসার শক্ত গলায় বললেন, 'নাউ ইউ আর ইন ট্রাবল সারা।'

ওঃ ফাইন। ট্রাবল ছাড়া আমার চলে না।'

তোমার এখানে যারা আছে তাদের একবার আমি দেখতে চাই।'

না। ইউ কান্ট। তাতে আমার বিজ্ঞাপনের গুডউইল নষ্ট হবে।'

হু কেয়ারস!'

কি ব্যাপার বলতো? তুমি আজকে অন্যরকম গলায় কথা বলছ। ভেতরে এস, একটা ড্রিঙ্ক নাও। কাম অন।'

সরি আই অ্যাম অন ডিউটি' তারপর এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে একটা ছবি বের করে দেখাল, 'এই মহিলা তোমার এখানে আছে?'

সুন্দরী ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায়'?

চার নম্বর কটেজে।'

অফিসার ইঙ্গিত করতেই তার সহকারী চলে গেলেন চার নম্বর কটেজের দিকে। সুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও কি করেছে?'

ইউ নো বেটার দ্যান মি।'

আই ডোন্ট নো এনিথিং।'

দ্যাটস ইওর প্রিভিলেজ। যখনই কিছু জিজ্ঞাসা করি তখনই শুনি তুমি কিছু জানো না। এই মেয়েটি একজন প্রস্টিটিউট। তাতে আমাদের মাথা ঘামানোর কিছু নেই। তুমি তো এদেরই শেল্টার দাও। বাট ওর ব্যবসা পড়ে যাওয়ার পর ইদানিং, ড্রাগ, র‍্যাকেটে জড়িয়ে পড়েছে। খুব ভালো ক্যারিয়ার ওর টেনশন বেড়ে গেছে বলে এখানে রেস্ট নিতে এসেছে। কিছু বলবে?'

সুন্দরী কথা না বলে ঘাড় নেড়ে জানালেন, তার কিছু বলার নেই। আমরা গাড়িতে উঠলাম। পুলিশের জিপকে কাটিয়ে কেন্ট যখন গাড়িতে স্পিড দিচ্ছে তখন দেখলাম দ্বিতীয় অফিসার রিভলবার দেখিয়ে সেই বিশাল শরীরটিকে হাঁটিয়ে আনছে। কেন্ট চাপা গলায় বলল, 'ভগবান তোমাকে আবার ধন্যবাদ।'

২২
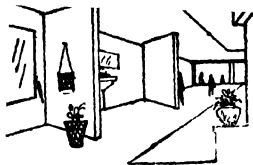
স্যানফ্রান্সিসকো শহরে আড্ডাবাজরা বেশ প্রশ্রয় পায়। প্যারিসের রেস্টুরেণ্টে একটি অলিখিত নিয়ম আছে। কেউ যদি সেখানে টেবিল দখল করে বসে খাবারের অর্ডার দেয় তাহলে সে নিজে যতক্ষণ দাম চুকিয়ে বেরিয়ে না যাচ্ছে ততক্ষণ তাকে বিল সার্ভ করা হয় না। অর্থাৎ কোনো বেয়ারা এসে বলবে না অনেকক্ষণ বসে আছেন এবার দামটা দিয়ে কেটে পড়ুন। পরে নিজেরও এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্যারিসের অসীম রায়কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম। তাঁর নিজেরও একটি রেস্টুরেণ্ট রয়েছে। অসীমবাবু বলেছিলেন, 'খদ্দের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেও আমরা কাউকে উঠে যেতে বলি না। একবার বললে চারধারে দুর্নাম ছড়িয়ে যাবে ওই রেস্টরেণ্টে খেয়ে বসতে দেয় না। ব্যস। ভিড় হালকা হয়ে যাবে।' এতে দোকানের মালিকের ক্ষতি হয় না। কারণ রেস্টুরেণ্টের খাবারের দাম বেশ বেশি। মনে আছে মধ্যরাতে ক্ষুধার্ত হয়ে প্যারিসের একটি রেস্টু-রেণ্টে আলো জ্বলতে দেখে ঢুকতে চেয়েছিলাম কিন্তু দারোয়ান বাধা দিয়েছিল। অথচ কাঁচের দেওয়ালের ওপাশে টেবিলে টেবিলে নারী পুরুষকে আড্ডা মারতে দেখেছিলাম। দারোয়ান জানিয়েছিল রাত সাড়ে এগারটায় শেষ খাবার সার্ভ করা হয়ে গেছে। এখন রেস্টুরেণ্ট বন্ধ। খদ্দেররা, যাঁরা ঢুকেছেন, তাঁদের ইচ্ছে মতন বেরিয়ে যাবেন। মনে হয় কেউ তিনটের পরে থাকবেন না। আমাদের দেশে এগারটা বেজে গেলেই চেয়ারগুলো টেবিলে উঠে যায়। ওদেশে সেটা করে কেউ যদি আড্ডাবাজকে সরাতে চায় তাহলে ঢি ঢি পড়ে যাবে।

স্যানফ্রান্সিসকো অবশ্যই প্যারিস নয়। কিন্তু রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারার প্রবণতা আছে। মাঝে মাঝে কয়েকটা মোড়কে আমার গড়িয়াহাটের মোড় বলেই মনে হয়েছে তবে অত ভিড় নেই। কিন্তু চারপাশে হোমোসেক্সুয়াল আর লেসবিয়ানে ভর্তি একটা পাড়া দেখলে যে হৃদয়ে আতঙ্ক ঢোকে তা আগে জানতাম না। একই রাস্তায় হোমো আর লেসবিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরুষরা পুরুষদের পছন্দ করছে এবং রেস্টুরেন্টে ঢুকে যাচ্ছে। তাদের সাজগোজ ভাবভঙ্গিতে অবশ্যই একটা মেয়েলি ছাপ আছে। আমেরিকান উপন্যাসে তো এদের কথা ছড়িয়ে আছে। অনেক চিত্রতারকা অথবা গায়ক এই রোগে আক্রান্ত। অথচ এরা কিন্তু রোগ বলে মনে করে না। সাধারণ আমেরিকান কিন্তু এদের পছন্দ করেন না। যদিও এ ব্যাপারে কাউকে পাত্তা দেওয়া প্রয়োজন মনে করে না লেসবিয়ানরা' দুটি পুরুষ বা দুটি নারী পরস্পরের কাঁধ-জড়িয়ে ধরে হাঁটছে দেখলেই সাধারণ আমেরিকান তাদের হোমো কিংবা লেসবি বলে মনে করেন। কথাটা শুনে আঁতকে উঠলাম। আমাদের দেশে এলে তাঁরা কি বলতেন? মনে আছে কলেজে আমাদের সঙ্গে রবীন নামের একটি ছেলে পড়ত। তার হাবভাব চাল চলনে মেয়েলিপনা বড্ড বেশি ছিল। এমনকি মেয়েরা পর্যন্ত তাকে নিজেদের লোক বলেই মনে করত। এই রবীনকে নিয়ে অনেক ছেলের মধ্যে একটা স্নায়ুযুদ্ধ হতো মাঝে মাঝেই। যেন সে একটি রমণী এমনভাবেই ব্যাপারটা উপভোগ করত রবীন। ও মেয়েদের গলায় চমৎকার গান গাইত। পরে ভেবে দেখেছি যে সব ছেলে মেয়েদের কাছে একদম পাত্তা পেত না তারাই রবীনের আপাত-সান্নিধ্য চাইত। শুনেছি রবীন এখন কোনো স্কুলে পড়ায়, বিয়ে থা করে ছেলের বাবাও হয়েছে। কিন্তু স্যানফ্রান্সিসকোতে এসে ববীনের কথা খুব মনে পড়ছিল। তবে রবীনের পোশাক ছিল সাধারণ ছেলেদের মতো।

কেন্টের পছন্দ হচ্ছিল না ফুটপাথে দাঁড়াতে। হঠাৎ ঠান্ডা হাওয়া নেমেছে। আমাদের পাশে একটি মেয়ে সর্বাঙ্গ চামড়ার পোশাকে মুড়ে দাঁড়িয়ে আছে হাতে সিগারেট নিয়ে। চট করে রাত ন'টায় পার্ক স্ট্রিটের কথা মনে আসে। কিন্তু মেয়েটি আমাদের দিকে মোটেই তাকাচ্ছে না। আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে তার কোনো আগ্রহ নেই। বছর তিরিশের মধ্যে বয়স এবং সত্যিই সুশ্রী। চুল ছেলেদের মতো ছাঁটা। কেন্ট গম্ভীর গলায় বলল, 'শি ইজ লেসবি।' কোনোরকম বিদ্রূপ নেই গলায়। যেন উনি একজন ইঞ্জিনিয়ার এইরকম ভঙ্গিতে উচ্চারণ। মিনিট খানেকের মধ্যে উল্টো ফুটপাথে পরীর মতো সুন্দরী এক যুবতীকে দেখা গেল। পরনে সাদা ঝালর দেওয়া গাউন, পিঠের মাঝামাঝি চুলের ঢল। আমাদের পার্শ্ববর্তিনীকে দেখা মাত্র সে হাত তুলে চিৎকার করে উঠল খুশিতে। দেখলাম পার্শ্ববর্তিনী শুধু মাথা দুলিয়ে সেটি গ্রহণ করলেন। মেয়েটি প্রায় উন্মাদিনীর মতো ছুটে পেরিয়ে এল চওড়া রাস্তা। এসে দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল পার্শ্ববর্তিনীকে। তিনিও মেয়েটিকে সামান্য আদর করলেন। তারপর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ঢুকে গেলেন পাশের রেস্টুরেন্টে। বিশ্বাস করুন, একটি পুরুষ এবং একটি নারী যদি দৃশ্যটিতে থাকত তাহলে ঘটনাটাকে

প্রেমের বিশেষ নিদর্শন বলে ভাবতে একটুও খারাপ লাগত না। আমার অনভ্যস্ত চোখ কটকট করছিল। কেন্টকে সেটা বললাম। দার্শনিকের মতো কেন্ট কিছু কথা বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি কখনই এসব করব না। কিন্তু ধরো যৌন জীবন বাদ দিয়ে নারী এবং পুরুষ পরস্পরের কাছে যা যা পেতে পারে তা একজন নারী যদি আর একজন নারীর কাছে অথবা একজন পুরুষ যদি আর একজন পুরুষের কাছে পেয়ে গিয়ে সুখী হয় তাহলে আমার কী বলার থাকতে পারে।'

সত্যি কথা। আমাদের দেশে চিরকাল যৌনতাকে আড়ালে রাখা হয়েছে। যৌন জীবন সম্পর্কে বাল্যকালে বা যৌবনে কোনোরকম কৌতূহল মেটানোর কথা অভিভাবকরা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না কিছুকাল আগে। ইদানিং স্কুলে পাঠ্য হিসেবে ছেলেমেয়েরা বিশদ জানতে পারছে। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে আমরা যখনই কিছু ভেবেছি তখন যৌনজীবনকে বাদ দিয়েছি সচেতনভাবে। রাধা এবং কৃষ্ণের মধ্যে ওই সম্পর্কের কথা যেমন আমরা চিন্তাও করতে পারি না তেমনি প্রেম সম্পর্কিত ভাবনা ভাবতে গেলে নরনারীকে অতীন্দ্রিয় ভাবতেই ভালো লাগে। সেক্ষেত্রে দু'জন লেসবিকে মেনে নিতে এত অস্বস্তি হচ্ছে কেন। অস্বীকার করব না, লেসবিদের দেখতে যতটা খারাপ লাগেনি হোমোদের দেখতে তার চেয়ে অনেক খারাপ লেগেছে। কেমন যেন ঘিনঘিনে ভাব এসেছে মনে। অথচ তারা কোনো অশালীন আচরণ করেনি আমাদের সামনে। পুরুষ বলেই এই রকম অনুভূতি হলো কিনা জানি না।

খিদে পেয়েছিল জব্বর। একটা বড় রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম আমরা। প্রতিটি টেবিল ভর্তি। আর মাঝে মাঝেই উচ্চস্বরে চিৎকার এবং হাসি ছিটকে উঠছে। সাধারণত কোনো টেবিল আগে থেকে কারো দখলে থাকলে সেখানে চেয়ার খালি পেলেও বসা শোভন নয়। কিন্তু কেন্ট আমাকে যে টেবিলে নিয়ে এলো সেখানে একজোড়া বৃদ্ধ দম্পতি রয়েছেন। পাকা ফলের মতো টুকটুকে শরীর। বৃদ্ধা একদা নিশ্চয় দারুণ সুন্দরী ছিলেন। হাত মুখ নাড়ার সময় এখনও অহঙ্কার ফুটে উঠছে। কেন্ট জিজ্ঞাসা করলো, 'আমরা আপনাদের সামনে বসতে পারি?' বৃদ্ধ বৃদ্ধার দিকে তাকালেন। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন. 'আমি কি জানতে পারি তোমরা ওই ওদের দলে পড় কিনা?'

কেন্ট হেসে ফেলল, 'না। উনি আমেরিকায় বেড়াতে এসেছেন। আর আমি ওঁকে এসকর্ট করছি। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।'

বৃদ্ধ বলল, 'থ্যাঙ্ক গড। বসো তোমরা।'

মেনু দেখে খাবারের হুকুম দিলাম। আশে পাশের সমস্ত টেবিল দুটো ভাগে ভাগ হয়ে আছে। লেসবিরা আমাদের টেবিলে বসছে না। লক্ষ্য করলাম দুই লেসবি মহিলার একজন একটু পুরুষালি আচরণ করছে। সেটা অন্যজন খুব সমীহের সঙ্গে গ্রহণ করছে, ওরা কী বিষয় নিয়ে এত কথা বলছে বুঝতে পারছিলাম না। আমাদের ঠিক পাশের টেবিলে একজন লেসবি, যে কিনা পুরুষালি বই পড়ে শোনাচ্ছিল তার সঙ্গিনীকে। কানে আসছিল শব্দগুলো। এই

হট্টগোলের মধ্যেই সঙ্গিনী ঝুঁকে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হলো লেখাটা আমার চেনা। হেমিংওয়ে পড়ছে পুরুষালি মেয়েটি। ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি। রোমাঞ্চিত হলাম। এতক্ষণ যে বিরূপ ভাবনা মনে শক্ত জমি তৈরি করেছিল মুহূর্তেই চুরমার হয়ে গেল। মনে পড়ল কফি হাউসের তিনতলার কোণে বসে একটি ছেলেকে সুধীন দত্ত পড়ে শোনাতে দেখতাম তার প্রেমিকাকে। এর পরে আমরা কি বলতে পারি! সন্তোষদার একটা কথা মনে পড়ে গেল। অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপার তার একান্ত নিজস্ব। তোমার ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে বিচার করতে যেও না। মানুষের মনের আচরণ কোনো ফর্মুলা মাফিক চলে না। যে যার নিজের মতন। তুমি শুধু তোমারটা দ্যাখো। হ্যাঁ, ব্যক্তির বাইরে যে মানুষ সে নিয়মটিয়ম মেনে চললেই হলো।' চট করে শুনলে কথাগুলোতে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু জীবনে অভিজ্ঞতা এলে ব্যাপারটা দৈনন্দিন সত্যিতে পরিণত হয়।

এরা আড্ডা মারছে তো মারছেই। ঘড়ির কাঁটা এখন একটা ছাড়িয়েছে। কিন্তু আমাদের সামনের বৃদ্ধবৃদ্ধার বাড়ি যাওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনা দেখছি না। নিয়মিত ব্যবধানে তাঁরা ওয়েটারকে ডেকে একটা না একটা খাবারের হুকুম দিয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ এখানে খাবার না চাইলে কলকাতার মতো তুলে দেওয়া হয়। সেইজন্যেই বোধহয় কফিহাউসে বেকারদের চমৎকার আড্ডা জমে। পাশের টেবিলে এখন হেমিংওয়ে নিয়ে আলোচনা চলছে। দাম মিটিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। নির্জন রাস্তা। গাড়িতে ওঠার আগে দেখলাম একটি কিশোর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তার নিজস্ব ঘরানার সঙ্গী সংগ্রহের জন্যে। ইচ্ছে হলো বলি, 'খোকা বাড়িতে ফিরে যাও।'

হোটেলে ফিরে কেন্ট চলে গেল গাড়ি রাখতে। এখন মধ্যরাত। রিসেপশনিস্ট ভদ্রলোক আমার অচেনা। বিকেলে যিনি ছিলেন তাঁর ডিউটি সম্ভবত শেষ হয়ে গিয়েছে। কাউন্টারে পৌঁছে ঘরের চাবি চাইলাম। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ইউ আর, প্লিজ?'

'মজুমদার। এবার নিশ্চয়ই পাশপোর্ট দেখতে চাইবে। আমাকে ইনি হোটেলে চেক্-ইন করার সময় দ্যাখেননি। উটকো লোকও তো এসে চাবি চাইতে পারে। রিসেপশনিস্ট কিন্তু সেদিকে গেলেনই না। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তো ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন?'

মাথা নাড়লাম। এবার আর একটু কাছে এগিয়ে বললেন, 'আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের হোটেলের একটি পরিবারে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। তারাও ভারতীয়। আপনি যদি ওদের একটু সাহায্য করেন।'

'কি সমস্যা?'

'ওদের মধ্যে নিশ্চয়ই খুব ঝগড়া হয়েছে। রেগেমেগে ভদ্রলোক সেই যে বেরিয়ে গেছেন আর ফেরেননি। মহিলাটি খুব ভেঙে পড়েছেন। কয়েকবার কাউন্টারে এসেছেন। আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম কারণ ভদ্রমহিলার ভাষা পুরোটা বুঝতে পারছি না। আপনি যদি দয়া করে কথা বলে নেন তাহলেই

বোঝা যাবে পুলিশকে জানানো প্রয়োজন কিনা। ভদ্রলোক আমাকে একটা রুম নম্বর লিখে দিলেন।

মধ্যরাত্রে মানুষের হৃদয় বড় নির্মল থাকে। পরম শত্রুর সঙ্গে তখন ভালো ব্যবহার করা যায়। কিন্তু কারো প্যারবারিক সমস্যায় নাক গলানোর সময় কিনা তা আমার অভিজ্ঞতায় ছিল না। প্রথম কথা, ভদ্রমহিলা তাঁদের দাম্পত্য কলহ নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে নারাজ হতেই পারেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর স্বামী ফিরে ঘটনাটা শুনলে অসন্তুষ্ট হলে কিছু বলার নেই। এসব কথা বলতেই রিসেপশনিস্ট বললেন, 'না, না, উনি খুব ভেঙে পড়েছেন। ভাষার সমস্যা না থাকলে আমরাই সাহায্য করতাম। আমি বলছি উনি কিছু মনে করবেন না।'

কেন্ট এখনও ফেরেনি। লিফটে চেপে সোজা ওপরে উঠে এলাম। হোটেলের ঘরে এখন ঘুমন্ত মানুষ। করিডোর ভুতুড়ে বাড়ির মতো ফাঁকা। দরজার ওপর নজর রাখতে রাখতে নির্দিষ্ট ঘরটির সামনে দাঁড়ালাম। ভারতীয় যে মহিলাটি এখানে আছেন তিনি যদি কেরালা বা কচ্ছের মানুষ হন তাহলে আমার কোনো সাহায্যই কাজে লাগবে না। হঠাৎ সেই দম্পতির ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমরা যখন চেক্-ইন করছিলাম তখন ভদ্রলোক খুব দ্রুত বেরিয়ে গিয়েছিলেন স্ত্রীকে নিয়ে।

তিনবার নক্ করার পর দরজাটা খুলল। কিন্তু পুরো নয়। চেন হুকে আটকানো রয়েছে। বড়জোর আধ ইঞ্চি ফাঁক হয়েছে। এবং পরিষ্কার বাংলায় কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন ভেসে এল, 'কে'?

যাঃ। বঙ্গ তনয়া সানফ্রান্সিসকোতে বিপদগ্রস্তা। অতএব বললাম, 'আমি একজন বাঙালি। হোটেল থেকে আপনার বিপদের কথা শুনলাম। যদি দয়া করে দরজা খোলেন তাহলে এ ব্যাপারে কথা বলতে পারি।'

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। একটু চটজলদি। আধা সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী এক বঙ্গললনা আমার দিকে শব্দের পিচকারি ছুঁড়লেন, 'আপনি বাঙালি। ও! ভগবান, তুমি আছ। ভয়ে আমার হাত-পা হিম যেন হয়ে যাচ্ছিল এতক্ষণ। আসুন।'

সোজা গিয়ে চেয়ারে বসলাম। মহিলার পরনে শাড়ি, সিল্কের। মুখচোখের কাট্ ভালো। তবে গায়ের রঙ চাপা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হয়েছে বলুন তো?'

'কাল থেকে আমার সঙ্গে ঝগড়া করছিল। দুপুরে একবার বেরিয়েই ফিরে এসেছিল। আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম। এসে দেখি ও নেই।' মহিলা কাতর গলায় শব্দগুলো উচ্চারণ করেই আচমকা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। মধ্যরাত্রে কোনো মহিলা যদি আমার সামনে ওভাবে কাঁদেন তাহলে ভাবাবেগ সামলে থাকা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে যায়। কিন্তু একজন অপরিচিতা পরস্ত্রীকে আমি শুধু দূর থেকেই সান্ত্বনা দিতে পারি। জিজ্ঞাসা করলাম একটুও না নড়ে, 'আপনি এতো ভেঙে পড়ছেন কেন?'

'ও পালিয়েছে। আমি জানি ও পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে? যাঃ। পালাবে কেন?'

'না। আমি জানি। এখানে এত সাদা চামড়ার মেয়েমানুষ দেখে, তাদের কত রঙঢঙ দেখে মজেছে। আমাকে আর মনে ধরছে না।' কান্নাটা থামছিল না। বললাম, 'এসব কেন বলছেন ? আপনাদের মধ্যে কোনো কারণে মতান্তর হয়েছিল। হয়তো ওঁর অভিমান হয়েছে তাই, দেখুন না এখনই চলে আসবেন হয়তো।'

'না। ও আসবে না।' একদম আকাশবাণীর ঘোষিকার গলায় বললেন মহিলা।

'এমন হতাশ হচ্ছেন কেন ?'

'আমি জানি। আমার সঙ্গে ওর অন্য কোনো ঝগড়া হয়নি। দু'দিন আগে হঠাৎ আমাকে দেশে চলে যেতে বলেছিল। আমি বলেছিলাম একসঙ্গে এসেছি, একসঙ্গে যাবো। তাছাড়া কতো সব কায়দা করে প্লেনে ট্রেনে যেতে হবে। আমার ভয় লাগে।' মহিলা কথা বলছিলেন আর কাঁদছিলেন। দৃশ্যটা আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। অথচ ইনি যা বলছেন তাতে ভদ্রলোকের চরিত্র বুঝতে পারছি না। কেউ কি বাইরে এসে এভাবে নিজের স্ত্রীকে ফেরত পাঠায় নাকি ? সম্ভবত রাগ ঊর্ধ্বগামী হয়ে গিয়েছে একটু বেশি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা কতোদিন আমেরিকায় আছেন ?'

'দশ দিন।'

'কোথায় মানে কোন শহরে ছিলেন এর আগে। আপনি আর কাঁদবেন না। এখন কান্নাকাটি করে তো কোনো কাজ হবে না। ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা বুঝতে হবে।'

'নিউ ইয়র্ক আর লাভগাস না কি যেন।' লাভেগাস শব্দটির উচ্চারণ বুঝিয়ে দিলো মহিলার পড়াশোনা বেশি নয়। বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করা ছেলে-মেয়েদের অনেকেই ইংরেজি মোটামুটি লিখতে পারে কিন্তু অনভ্যাসের কারণে বলতে গিয়ে দেখেছি আটকে যায়। হয়তো একটা সঙ্কোচ কাজ করে। ইনি সেই দলেও পড়েন না। কিন্তু এবারে কান্না থেমেছে। রুমালে চোখ মুছলেন। তবু জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি এভাবে কাঁদছেন কেন ? এত ভেঙে পড়ছেন কেন ?'

'একা ফিরে যেতে হবে বলে।'

উত্তরটা আমার মোটেই ভালো লাগল না। ঘরের জিনিসপত্রের দিকে নজর বোলালাম। তারপর হেসে বললাম, 'আপনি বলছেন উনি চলে গিয়েছেন কিন্তু ঘরে তো ওঁর কিছু জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছি। আপনি মিছিমিছি ভাবছেন।'

'না।' মহিলা উঠে দাঁড়ালেন, 'ওঁর স্যুটকেস নেই। সঙ্গে একটা টাকার ব্যাগ থাকে, সেটাও নেই। আমার এই পাসপোর্ট টিকিট বাইরে বের করে দিয়েছেন। সঙ্গে এই টাকাগুলোও ছিল।' দেখলাম ড্রেসিং টেবিলের ওপর গোটা একশ ডলার পড়ে রয়েছে। অন্তত তিনি যে মহিলার ব্যাপারে ভেবেছেন তা বোঝা যাচ্ছে। হোটেলের বিল মিটিয়েছেন কিনা তা বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি এখানে কাজ করেন ?'

হাসলাম। 'না। আমিও বেড়াতে এসেছি। কলকাতায় থাকি।'

'কলকাতা ?' চকিতে ওঁর মুখে যেন হাজার পাওয়ারের আলো জ্বলে উঠল। প্রায় ছুটেই এলেন কাছে, 'আপনি কলকাতায় থাকেন ?'
'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি যা বলছেন তাতে তো ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে যাচ্ছে। আপনার স্বামী কেন নিজের পাসপোর্ট এবং স্যুটকেস নিয়ে না বলে চলে যাবেন ? আমি রিসেপশনিস্টকে বলছি পুলিশকে খবর দিতে।' আমি উঠে দাঁড়ালাম।
করুণ গলায় মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা পুলিশকে না জানালে হয় না ? আপনি যদি কলকাতার প্লেনে আমাকে তুলে দেন, টিকিট তো আছে—।'
'আশ্চর্য ! আপনার স্বামী আপনাকে ছেড়ে এখানে থেকে যাবেন আর আপনি কিছু না বলে দেশে ফিরে যাবেন ? তা কি হয় ? একমাত্র পুলিশই পারে তাঁকে খুঁজে বের করতে।' আমি এগিয়ে গেলাম টেলিফোনের দিকে।
হঠাৎ কাতর গলায় মহিলা বললেন, 'শুনুন।'
চমকে ফিরে তাকালাম। মহিলা অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। 'উনি আমার স্বামী নন। পুলিশকে আমি কী বলব।'
এমন অবস্থায় কখনও পড়িনি। বজ্রাহত শব্দটির অর্থ এতক্ষণে বোধগম্য হলো। কোনোমতে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম। 'উনি আপনার স্বামী নন ?'
মাথা নেড়ে না বললেন মহিলা, 'মাস দুয়েক হলো আমার কাছে আসতেন। খুব দিলদরিয়া লোক। দু'মাসে আমাদের ভাব হয়ে গিয়েছিল বেশ। নিজেই ব্যবস্থা করে আমার পাসপোর্ট বের করলেন। আমাদের বাড়িওয়ালি আপত্তি করেছিল। দিল্লী, বম্বে যাওয়া যায় কিন্তু একদম আমেরিকা বলে কথা। এত গল্প বলতেন আমার খুব জেদ চেপে গেল। এ জীবনে তো হবে না, উনি যদি দেখান তাহলে কেন দেখতে যাব না। সবাই কি ইচ্ছে করলেই আমেরিকা যেতে পারে। বাড়িওয়ালি বলেছিল সেদেশে যেতে ওঁর আমার জন্যে বিশ হাজার খরচ হবে। ওই টাকা খরচ করার মতো প্রেম কি হয়েছে ? আমি বলেছিলাম, হয়েছে। বাড়িওয়ালি নিশ্চয় ঈর্ষা করেছে আমার সৌভাগ্যকে। সব কিছু করে উনি আমাকে নিয়ে রওনা হলেন। প্রথম তিনদিন খুব ভালো ছিলাম। জীবনে এতো ভালো দৃশ্য এত সুখ কখনও পাইনি। একটা ইংরেজি সিনেমা দেখেছিলাম ঠিক সেইমতো সবকিছু। তারপর যেখানেই যাই উনি আমাকে হোটেলে রেখে রাত্রে একা বেরিয়ে যেতেন। ভোরের আগে ফিরে দুপুর পর্যন্ত ঘুমাতেন। আমাকে নিয়ে ঘুরতে যেতেন না। আমি বললে বলতেন, একটা বয় ফ্রেন্ড জুটিয়ে নিজেই ঘুরে বেড়াও না। এদেশে নাকি শ্যামলা মেয়ের খুব ডিমান্ড। তারপর বলতে লাগলেন, সাদা মেয়েদের শরীরের গল্প। কি তাদের ব্যবহার। বললেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে এসে তিনি নাকি খুব ভুল করেছেন। আমাকে দেশে ফিরে যেতে বলতে লাগলেন। তারপর তো এই। আমি কী করব।'
বিরাট গল্পটা মুখ বুজে শুনলাম। তারপর এগিয়ে গিয়ে ওঁর পাসপোর্ট তুলে নিলাম। নীলা দেবী। তিন, রয় স্ট্রিট। মহিলার ছবিটি সদ্য তোলা।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'রয় স্ট্রিটে থাকেন ?'
মাথা নাড়লেন মহিলা, 'না। দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটে।'
অন্যমনস্ক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সেটা কোথায় ?'
'সোনাগাছি'।
এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। না। বারবণিতা বলতে যে ছবি মনে আসে তার সঙ্গে ওঁর কোনো মিল নেই। গল্প শুনেছি অনেক। কিন্তু চাক্ষুষ এই প্রথম করলাম।
'আপনার নাম নীলা ?'
'হ্যাঁ'। 'ওঁর নাম কী ?'
'আমরা দেবুবাবু বলে জানতাম। ডি. রায়।'
'বাড়ি কোথায় ?'
'বালিগঞ্জে। ঠিকানা জানি না।'
'এরকম অচেনা লোকের সঙ্গে চলে এলেন ?'
'আসলে রোজ আসতেন। কত গল্প করতেন। আমাকে বড় বড় হোটেলে নিয়ে যেতেন। এমন ভালবেসেছিলাম যে অন্য কিছু ভাবার সুযোগ পাইনি।'
চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা আমাকে আপনার খুব ঘেন্না হচ্ছে না ?'
এরকম বোধ আমার আসেইনি। মাথা নেড়ে না বললাম।
মহিলা বললেন, 'বাইশ বছর বয়সে এই লাইনে এসেছি। সাত বছর হয়ে গেল। কাউকে ঠকাইনি কখনও। কিন্তু আমাকে কেন এভাবে ঠকতে হলো ?'
'এনিয়ে হা হুতাশ করবেন না। আপনার এখন কলকাতায় ফিরে যাওয়া দরকার। আমি চেষ্টা করছি একটা ব্যবস্থা করার।'
'আমি সারা জীবন আপনার ঝি হয়ে থাকব দাদা। যা বলবেন তাই করব। আমি নিশ্চয় খারাপ মেয়ে কিন্তু—।'
'ঠিক আছে, এসব না বললেও চলবে।'
টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তুললাম। রিসেপশনিস্টের সাড়া পেয়ে জিজ্ঞাসা কবলাম, 'আমি মজুমদার বলছি। ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলেছি। ওঁদের ঘরের বিল কি আউটস্ট্যান্ডিং আছে ?'
রিসেপশনিস্ট একটু সময় নিয়ে বললেন, 'ওঁরা যে অ্যাডভান্স করেছিলেন তাতে আগামীকাল দুপুর পর্যন্ত চলবে।'
'থ্যাঙ্কস। পরে কথা বলব।' রিসিভার নামিয়ে রাখতেই সেই পত্রিকাটি দেখলাম। টেবিলের ওপর যা আমার ঘরেও দেওয়া হয়েছিল। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বিভিন্ন ছবির ওপর বাংলায় 'দারুণ' 'দারুণ' লেখা দেখতে পেলাম। শেষে একটি টেলিফোন নম্বরের ওপর তিন চারবার গোল দাগ দেওয়া নজরে পড়ল। মহিলাকে বললাম, 'আপনি নিশ্চিন্তে এখানে বিশ্রাম করুন। উনি যদি না ফেরেন তাহলে দেশে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা হবে।' আমি বেরুতে যাচ্ছিলাম পত্রিকাটি নিয়ে মহিলা বাধা দিলেন, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?'

'আমার ঘরে।'
'দাদা, আপনি কবে দেশে যাবেন ?'
'আমার দেরি আছে ফিরতে। আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন ?'
'এই বিদেশে খুব একলা লাগছে আমার।'
'আপনি চান উনি শান্তি পান ?'
কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন মহিলা। তারপর বললেন, 'উনি যদি আমাকে যেমন এনেছিলেন তেমন ফিরিয়ে নিয়ে যান তাহলে আর কিছুই চাই না আমি।'
'ঠিক আছে। আমি দেখছি।'
'দাদা, আপনার নাম কী ?'
'মজুমদার।' কথাটা বলতেই মুখে হাত চাপা দিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন মহিলা। হতভম্ব হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। সেই অবস্থাতেই তিনি বললেন, 'রায় আমার নকল উপাধি। লাইনে আসার আগে আমরাও ছিলাম মজুমদার।'

২৩

পুলিশ বলেছিল যদি সকাল দশটার মধ্যে ভদ্রলোক কোনো যোগাযোগ না করেন তাহলেই তারা খোঁজখবর নেবে। হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে ওঁর কোনো দায় নেই কারণ পুরো টাকা তিনি আগাম দিয়ে দিয়েছেন। যে মহিলা ওঁর সঙ্গে এসেছেন তিনি সাবালিকা। শুধু একটা লোক না বলে চলে গিয়েছে, কোথায় কিরকম আছে এইটেই একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর পুলিশ খুঁজে দেখতে পারে। আমেরিকায় ভদ্রমহিলা এসেছেন নিজস্ব আইডেণ্টিটি নিয়ে। অতএব তাঁর ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

কিন্তু এসবের কিছুই প্রয়োজন হলো না। ভদ্রলোক সেই সকালেই ফিরে এলেন। ঘুম থেকে উঠে আমি যখন ভাবছি কিভাবে ওঁকে দেশের প্লেনে তুলে দেওয়া যায় তখন রিসেপশন থেকে আমাকে ফোন করে ঘটনাটা জানাল। বেশ অবাক হলাম। উনি গেলেনই কেন আবার কোন দায় মেটাতে ফিরে এলেন? ভদ্রমহিলার কথায় আমার মনে হয়েছিল আমেরিকার নারীর টান তাঁর কাছে এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে ভারতীয় নারীকে তিনি বর্জন করেছেন। তাহলে ফিরে এলেন যে বড়! প্রচণ্ড রাগ হলো। নিজেদের মধ্যে তারা যা করতে চান করতে পারেন কিন্তু সেই সূত্রে যখন বাইরের লোককে ডেকে সাহায্য চাওয়া হয় তখন সেখানে আমরা কৈফিয়ৎ চাইতেই পারি। স্নান শেষ করে পোশাক পরে সোজা ওঁদের দরজায় নক করলাম। মিনিট খানেকের মধ্যেও কেউ দরজা খুলল না। গিয়ে কেন্টকে ব্যাপারটা বললাম। সে আমার সঙ্গে রিসেপশনে নেমে এলো।

রিসেপশনিস্ট বলল, 'ওঁরা একটু আগে বেরিয়ে গেছেন।'
'বেরিয়ে গেছেন মানে ?'
'ওঁরা হোটেল ছেড়ে দিয়েছেন। সকালেই নিউইয়র্কের ফ্লাইট ধরবেন।'
অস্বীকার করব না একই সঙ্গে দু'রকম অনুভূতি এলো। প্রথমেই মনে হলো, যাক, ভদ্রমহিলার দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আর আমাকে চিন্তা করতে হবে না। তারপরেই খেয়াল এলো আচমকা ফিরে এসে ভদ্রলোক কেন তড়িঘড়ি পালিয়ে গেলেন মহিলাকে নিয়ে। মহিলার কাছে নিশ্চয়ই তিনি আমার কথা শুনেছেন। বুঝেছেন হোটেলে থাকলে আমার মুখোমুখি হতে হবে। সেই ঝুঁকি তিনি আর নিতে চাননি। লোক লজ্জাবোধ এখানে প্রবল হয়েছিল।
তাতো হলো ? কিন্তু ভদ্রমহিলা কী করে ওঁর সঙ্গে ফিরে গেলেন আমাকে একবারও না জানিয়ে ? যে পুরুষ তাঁকে এতো বড় অপমান করেছিল কোন মানসিকতায় তাঁকে আবার তিনি গ্রহণ করলেন ? সেটা কি দেশে ফিরে যাওয়ার সুবিধে হবে বলেই ?
নারী চরিত্র আকাশের মতো রহস্যময় যাঁরা বলেন তাঁরা ভুল বলেন বলে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে। আমার বিশ্বাস মেয়েদের মন এতো সরল এবং সাধারণ-গতিতে চলে যে আমরা সেই স্বাভাবিকটা না বুঝে আরোপিত জটিল ভাবনা নিয়ে তাদের বুঝতে চেয়েই ওইসব কথা বলে থাকি। একজন নারী অল্পেই খুশি হন এবং দুঃখবোধও তার আসে অল্পে। কিন্তু তিনি যাকে একবার গ্রহণ করে ফেলেন ভালবাসা দিয়ে তাকে কোনোদিন মুছে ফেলতে পারেন না মন থেকে। সেই পুরুষ তাঁকে প্রতারিত অপমানিত করলে তিনি ততক্ষণই মুখ বুজে পড়ে থাকেন যতক্ষণ তাঁর সহ্যশক্তি সঞ্চিত থাকে। তারপর যখন তিনি সেই পুরুষের ছায়া থেকে সরে আসেন তখন তাঁকে ঘৃণা করতে যে মন দরকার হয় তাও তিনি খরচ করতে রাজি নন। এই পর্যন্ত বোঝা যায় সরলরেখায়। কিন্তু সেই নারী যদি ওই পুরুষের অত্যন্ত বিপদের দিনে নিজের মর্যাদা বিকিয়ে দিয়ে ছুটে যান সাহায্য করার তাগিদে তখনই তিনি রহস্যময়ী হয়ে ওঠেন সাধারণের চোখে। এইসময় আমরা ভাবতে চাই না ওঁর হৃদয়ে প্রথম পুরুষটি যে ছাঁচ ফেলেছিল সেটি তো কোনোদিন নষ্ট হয়নি। পরবর্তীকালে অন্যপুরুষ এলেও তারা হয়তো মেঘের মতো সেই ছাঁচের ওপর ঘোরাফেরা করছে মাত্র। যে মুহূর্তে তিনি নিজেকে প্রথম পুরুষের কাছে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন তখনই তাঁর সমস্ত অভিমান সরে গেছে আচমকা।)
সারাটি দিন আমরা সানফ্রান্সিসকো শহর চষে বেড়ালাম। দুপুরে একটা পঞ্চ-মুখী সিনেমা হলে ঢুকলাম। পঞ্চমুখী বললাম এই কারণে যে প্রধান দরজা একটিই। ভেতরে ঢুকে পাশাপাশি পাঁচটি কাউন্টার। তাতে পাঁচটি ছবির টিকিট বিক্রি হচ্ছে। যেটি ইচ্ছে সেটিতে টিকিট কেটে ঢুকে পড়। আমি একটি স্প্যানিশ ছবির টিকিট কাটলাম। কেন্ট বৃটিশ ছবির। সিঁড়ি দিয়ে তিন নম্বর অডিটোরিয়ামে ঢুকে দেখলাম শ' তিনেকের বেশি আসন নেই। ছবি আরম্ভ হতে মিনিট দুয়েকও বাকি নেই কিন্তু দর্শক সংখ্যা কুড়িতেও পৌঁছায়নি।

আমার মতো বাউন্ডুলে আছেন জনা তিনেক, বাকিরা জোড়ায় জোড়ায়। খুব আরামদায়ক হলো। সপ্তদশ শতকের পটভূমিকায় একটি ডন জুয়ান টাইপের ছেলের নারীশিকারের এ্যাডভেঞ্চার ছবির বিষয়বস্তু। সাব টাইটেল আছে। মজার কথা হলো ছবিতে যখনই নায়ক চুম্বন করছিল তখনই প্রেক্ষাগৃহে তা প্রতিধ্বনি হচ্ছিল। গুনিনি, তবে মনে হয় তের চোদ্দবারের পর্দার চুম্বন দৃশ্য দর্শকরা আত্মস্থ করেছেন। বলে রাখা ভালো, পর্দায় যখন সেরকম দৃশ্য আসে-নি তখন দর্শকরা নিজেদের সংযত রেখেছিলেন এবং এটা কম কথা নয়। তবে শব্দ যে ব্রহ্ম তা ছ-সাত জোড়া মানুষ অন্ধকারে আমাকে নতুন করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

সানফ্রান্সিসকো শহর আমার ভালো লেগেছিল। এর পেছনে ছেলেবেলায় দেখা সিনেমার স্মৃতি কাজ করছিল যেমন তেমনই কলকাতার আড্ডাবাজ মনও সক্রিয় ছিল। এই শহরেই আমি আমেরিকানদের অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ আটপৌরে জীবন যাপন করতে দেখেছিলাম। লস-এঞ্জেলস কিংবা নিউইয়র্কের মতো দ্রুত গতিতে ছোটার চেষ্টায় এখানকার মানুষ যোগ দেয়নি বলেই মনে হয়েছিল। তাছাড়া আমেরিকান নয় এমন মানুষের সংখ্যাও বেশি বলে যে কসমোপলিটন চেহারা নিয়েছে তা আমার মতো ভারতীয়ের পক্ষে খুব স্বস্তিজনক।

সানফ্রান্সিসকো ছেড়ে আমেরিকান এয়ার লাইন্সের টিকিটে উড়ে এলাম আবার নিউইয়র্কে। আমার দ্রষ্টব্য শহরের মধ্যে কেন যে আমি নিউইয়র্কের নাম রেখে-ছিলাম এইটে এখনও বুঝতে পারি না। মনোজের সঙ্গে তো শহরটাকে নানান চেহারায় আগেই দেখে গিয়েছি। নতুন করে কেন্ট আমাকে আর কি দেখাতে পারে। আমরা বাঙালিরা যে পাকাপোক্ত প্রাকটিক্যাল নই এ সত্য বুঝেছি মজ্জায় মজ্জায়।

মনোজ জানত কবে আমি নিউইয়র্কে ফিরব কিন্তু তাঁকে এয়ারপোর্টে আসতে নিষেধ করেছিলাম। এখনও আমি সরকারি অতিথি এবং সঙ্গে যখন কেন্ট আছে তখন আর আমার কী দরকার। নিউইয়র্কে কেনেডি এয়ারপোর্টে নেমেছিলাম পাঁচটা নাগাদ। ভাড়া-গাড়িতে চেপে কেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'কোন রাস্তায় যাবো তুমি বলতে পারবে ?'

পনেরো দিনেও যদি একটা পাড়া চিনতে না পারি তাহলে আমার সঙ্গে হুতোম-পুরের হুতোমের পার্থক্য কি ? কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে কুইন্সের দিকে হাই-ওয়ে ধরে যেতে যেতে সতর্ক চোখ রাখলাম। পরিষ্কার মনে আছে রাস্তাটা যেখানে বাঁ দিকে বাঁক নিচ্ছে সেখানেই মনোজ সরে এসেছিল হাইওয়ে থেকে। তারপর একটা অপেক্ষাকৃত ছোট নির্জন রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে ওর বাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। অন্তত দুটো সেরকম বাঁক পড়ল এবং প্রতিবারেই আমার মনে হলো এইখানেই আমাদের হাইওয়ে ছাড়তে হবে। কিন্তু ঘড়ি বলছে আরও কিছুটা সময় আমরা হাইওয়েতে ছিলাম। এবার কেন্ট ঘোষণা করল আমরা কুইন্স ছাড়িয়ে যাচ্ছি।

অস্বস্তি হলো। নারীর কাছে হার মানতে লজ্জা নেই কিন্তু নিজের কাছে,

অসম্ভব। ওকে গম্ভীরভাবে বাঁ দিকের রাস্তা ধরতে বললাম। প্ল্যানড সিটির এই-টেই মুস্কিল। সবই একরকম মনে হয়। পুরোন মন্দির, বাজার অথবা সিগারেটের দোকান দেখে রাস্তা চেনার একটা সহজ ব্যাপার আছে। এখানে রাস্তার দু'-পাশের গাছগুলো পর্যন্ত একই মাপে ছাঁটা। আমি শুধু দু'পাশে বেল্লেরোসের দু'শো ছেচল্লিশ নম্বর রাস্তা খুঁজছি। নম্বরগুলো অন্তত একশ পিছিয়ে। কেন্ট কি ইতিমধ্যে বুঝতে পেরে গেছে আমি হুতোমপুরের ? যদিও আমি খুব গম্ভীর গলায় নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তবু আমার গলার স্বর নিজের কানেই ক্রমশ নির্জীব হয়ে আসছে। হঠাৎ মাথায় একটা মতলব এলো। ছোট দোকান-পাটের একটা চত্বব চোখে পড়তে কেন্টকে বললাম গাড়ি থামাতে। বড্ড কফি তেষ্টা পেয়েছে। সে গাড়ি পার্ক করে আমার সঙ্গেই হেঁটে এলো কফি কর্নারে। তিরিশ সেকেণ্ডের বেশি অপেক্ষা করতে হয় না কফির জন্যে। চুমুক দিতে দিতে চারপাশে তাকাতেই পাবলিক টেলিফোন বুথ দেখতে পেলাম। কেন্ট তখন মৌজ করে বলছিল, 'তোমার বন্ধু মনোজের সঙ্গে আলাপ করতে আমি খুব আগ্রহী! তোমরা এমনভাবে ছবি করতে যাচ্ছ দেখে আমি হাত লাগাতে চাই।'
'নিশ্চয়ই। মনোজও তোমাকে পেয়ে খুশি হবে।' কফি শেষ করে আমি গম্ভীর মুখে টেলিফোন বুথের কাছে গিয়ে পয়সা ফেললাম। মনোজের গলা পাওয়া গেল। অনেকদিন পরে বাংলায় বললাম, 'ভাই মনোজ আপনার বাড়িতে আসতে গিয়ে পথ হারিয়েছি। সঙ্গে এসকর্টটি আছেন। কিন্তু এটা তাকে বুঝতে দিতে চাই না।'
মনোজ হাসল, 'কোত্থেকে কথা বলছেন ?'
সাইনবোর্ড দেখে ঠিকানাটা আওড়ে গেলাম। মনোজ হাসল হো হো করে। তারপর বলল, 'রিসিভার রেখে উল্টোদিকে তাকালেই একটা রাস্তা দেখতে পাবেন। সোজা চলে আসুন রাস্তাটা ধরে যতক্ষণ না একটা মোড় পাচ্ছেন। মোড়ে এসেই ডান দিকে ঘুরলেই আমাদের বাড়ির সামনে এসে পড়বেন।'
নিজেকে চড় মারতে ইচ্ছে করল। এ যেন নন্দনের সামনে দাঁড়িয়ে কাউকে ফোন করে বলা যে আমি রবীন্দ্রসদন চিনতে পারছি না। চল্লিশ সেকেণ্ডেও লাগল না মনোজের বাড়ি পৌঁছে যেতে। এই ক'দিনেই নিউইয়র্কের আবহাওয়ার পরি-বর্তন ঘটতে শুরু করেছে। সন্ধের সময়টা যেখানে ভারি গরমজামা লাগত সেখানে মনোজ একটা হাফ স্লিভ পরে দাঁড়িয়ে। হাত জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন হলো পরিভ্রমণ জম্পেশ ?'
হাসলাম। শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমার কোনোদিনই কোনো কিছুতে মন ভরে না।
কেন্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। পরে আলাপ করবে বলে কেন্ট গাড়ি নিয়ে চলে গেল কাছাকাছি কোনো হোটেলে। যাওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করল আগামীকাল কখন আসবে ? কারণ নিয়মমত আগামীকালও আমি সরকারের অতিথি। বারোটার সময় ওকে আসতে বলে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই মনে হয়েছিল নিজের বাড়িতে এসেছি। আসলে মনোজের বাড়িতে প্রথম দিকে এমন

আলস্য নিয়ে কাটিয়েছিলাম যে এই পনের দিনের ছোটাছুটির পর পরিচিত বিছানায় শরীর রাখতে খুব আরাম লেগেছিল। এবং তখনই কলকাতার কথা মনে পড়েছিল। এতদিন বাদে কলকাতা আমার সমস্ত সত্তা ধরে জোরে টান মারল। মনোজ বসেছিল খাটের পাশে। ওকে মোটামুটি বৃত্তান্ত বললাম। লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের পল স্পের যা বলেছেন তা ওকে উৎসাহিত করল। ডকুমেন্টারিটা শেষ হলেই ও পলের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। মনোজ বলল, 'জয়ন্তী ফোন করেছিল।'

'জয়ন্তী, সে আবার কে?'

দূর মশাই। আলাপ করেন অথচ নাম ভুলে যান কেন? জয়ন্তী আপনার পিংকি।'

সত্যি লজ্জিত হলাম। রমেনবাবুর ছোট মেয়েকে ক্রমাগত এই দ্বীপ এই নির্বাসন উপন্যাসের পিংকি বলে ভাবতে ভাবতে ওর আসল নামই ভুলে গিয়েছিলাম। জানলাম পিংকি আসবে এই সপ্তাহেই। ওর গলার স্বর টেলিফোনে যা শুনেছে তাতেই মনোজের পছন্দ হয়েছে। কোনো জীবন্ত মানুষকে গল্পকারের নিজের লেখা চরিত্রের সঙ্গে মিলে গেলে যে আনন্দ হয় তার কোনো তুলনা নেই। মনোজের স্ত্রী এলেন, 'আপনারা তো ন'টা নাগাদ খেয়ে দেয়ে বেরুবেন?'

ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকালাম। ক্ষোভ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যতদিন নিউইয়র্কে ছিলাম ততদিন তো তাই করেছি। একটি বাঙালি কলকাতা থেকে এসে প্রতিরাত্রে তার স্বামীকে নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়—এটা কোনো স্ত্রীর ভালো লাগতে পারে না। মাথা নাড়লাম, 'না। আজ আমি বিছানা ছেড়ে উঠছি না।'

আবার হাসল মনোজ। 'এইজন্যই বাঙালিকে সবসময় জাগতে বলা হয়। এরই মধ্যে দম ফুরিয়ে গেল আপনার?'

টরেন্টো থেকে সাইমন স্কট, বোস্টন থেকে ফুয়াদ চৌধুরি, মনোজ, আমি আর কেন্ট সারাটা দিন ধরে আলোচনা করলাম। প্রথম দু'জনকে মনোজ আসতে বলেছিল আগে থেকেই। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো 'নির্বাসিন' ছবি হবেই এবং সেটা নিউইয়র্কেই শুটিং হবে। চিত্রনাট্যের খসড়া পড়ে শোনালাম। মনোজ ইতিমধ্যে তার ইংরেজি করে রেখেছিল। অতএব সাইমন অথবা কেন্টের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। এবং এখানেই মজার ব্যাপার হলো। মনোজের গল্পের সারাংশ হলো এইরকম যা চিত্রনাট্যে ছিল—'প্রবাল সোম নামক এক মধ্যবয়সী এম কম পাশ মানুষ খড়্গপুরে কেরানির চাকরি করতেন। তাঁর বড় মেয়ে সপ্তদশী ছোট মেয়ে বছর পাঁচেকের। সংসার কোনোমতে চলত। ওঁদের এক পারবারিক বন্ধু আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাঙ্কে কাজ করতেন। ভিয়েৎনাম যুদ্ধের সময় যখন আমেরিকায় অনেক চাকরি খালি হয়েছিল তখন তারা এশিয়ান দেশগুলো থেকে লোক নিয়েছিল। বন্ধুর পরামর্শে প্রবাল আমেরিকায় একটি অ্যাকাউন্টেন্টের চাকরির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকেন সেটা পাবেন না। ইতিমধ্যে প্রবালের বড় মেয়ে প্রেমে পড়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একটি ছাত্রের সবার

অজান্তে। জানা গেল যখন তখন সে অন্তঃসত্ত্বা। ক্ষিপ্ত প্রবাল কন্যাকে প্রহার করেন এবং ঘরে বন্দী করে রাখেন অন্নজল না দিয়ে। বাঙালি পিতা এ ছাড়া মেয়েকে সাহায্য করতে জানতেন না। কন্যা বিলাপ করত। প্রবাল ও তাঁর স্ত্রী নিজেদের অদৃষ্টকে দায়ী করতেন। তৃতীয় দিনে প্রবালের কনিষ্ঠা কন্যা দিদির কান্নায় বিচলিত হয়ে দরজা খুলে দেয়। এবং দিদি একটি জলের উঁচু ট্যাঙ্ক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। মৃত বিধ্বস্ত দিদির দিকে তাকিয়ে সেই শিশুটির মনে হয় বাবাই খুন করেছে। বাবা দিদির মৃত্যুর জন্য দায়ী। লোক লজ্জা ব্যক্তিগত শোক যখন প্রবল তখনই প্রবাল আমেরিকায় চাকরি পান। প্রায় পালিয়ে বাঁচতে তিনি চলে আসেন প্রথমে একা। দু'বছর পরে কন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে আসেন। বাড়ি কিনেছেন। সিটিজেনশিপ পেয়ে গেছেন। এখন প্রতি মুহূর্তে এক ডলার কত টাকা ভেবে শান্তি পান। মেয়ে সপ্তদশী হয়েছে আমেরিকানদের সঙ্গে মিশে। প্রবাল বঙ্গ সংস্কৃতি বর্জন করেছেন। স্ত্রীকে নিয়ে হ্যাট প্যান্ট পরে ছুটির দিনে পার্কে বসে বিয়ার খেয়ে আমেরিকান মেয়েদের দেখে মনে মনে আফশোষ করেন বড় দেরিতে এলেন এদেশে। বাড়িতে লুঙ্গি পরেন কিন্তু কেউ এলে ঝটপট স্যুট পরে দরজা খোলেন। বাঙালির অভ্যাসকে ব্যঙ্গ করেন কিন্তু দরজা বন্ধ করে টয়লেটে বসে পান খান আরাম করে। মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছেন কিন্তু বলে দিয়েছেন তার ছেলে বন্ধুদের সারি হবে এই-রকম, ভালো বাঙালি ছেলে, ভালো ভারতীয় ছেলে, ভালো সাদা চামড়ার আমেরিকান কিন্তু কখনই কালো চামড়ার মানুষ নয়। মেয়েটি আমেরিকান সংস্কৃতি গ্রহণ করলেও বাবাকে হিপোক্র্যাট বলে মনে করে। সে দিদির মৃত্যুর জন্য বাবা-কেই খুনী মনে করে এখনও। এবং হয়তো সেই কারণেই সে একটি কালো আমেরিকান ছেলেকে ভালোবেসে ফেলে। প্রবাল ব্যাপারটা জানতে পেরে বর্তমান জীবন বিস্মৃত হয়ে মেয়েকে প্রহার করতে উদ্যত হয় ছেলেটির সামনেই।

ছেলেটি বাধা দিলে মেয়ে বলে, 'না, ওঁকে ছেড়ে দাও। দিদিকে যেভাবে খুন করেছেন ঠিক সেভাবেই আমাকে খুন করে যদি খুশী হন তাহলে ওঁকে সেটা হতে দাও।' প্রবাল প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। আমেরিকানদের বহিরঙ্গে অনুকরণ এবং অন্তরে গোঁড়ামি নিয়ে থাকা এই লোকটিকে উপেক্ষা করে তাঁর মেয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। গল্পের শেষে বিপর্যস্ত প্রবাল যখন মেয়ের জন্য কাঙাল তখন মেয়ে দ্বিধায় পড়ে সে কি করবে। তার আমেরিকান বান্ধবী বলে, 'জানো, আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি আমার বাবা তাঁর সমস্ত ইগো ত্যাগ করে আমার দিকে ভালোবাসার হাত বাড়াবেন!' সেইসময় মেয়েটি আশ্রয় নিয়েছিল বান্ধবীর ঘরে। টেলিফোন নম্বর জানতে পেরে বিধ্বস্ত প্রবাল যখন মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চেয়ে রিঙ করেছিল তখন শ্বেতাঙ্গিনী রিসিভারটা তুলে কথা বলে মেয়েটিকে ওই অনুভূতির কথা জানিয়েছিল। মেয়েটি যার নাম পিংকি রিসিভার নিয়ে হেলো বলতেই খড়কুটো আঁকড়ে ধরার ভঙ্গিতে প্রবাল কঁকিয়ে উঠলেন, 'মাগো, আমি আর পারছি না।'

এই ছিল মূল কাঠামো। সেইসঙ্গে এসেছিল প্রচুর চরিত্র। যারা বিদেশের

একদা ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করছে। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের বিরোধ যেখানে প্রবল সেখানে দেখা গেছে পিংকি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে ভালোবাসে প্রবাল সোমের মতে প্যানপ্যানানি সত্ত্বেও। পূর্ব পাকিস্তানী এক ভদ্রলোক চাকরির লোভে জাহাজে কাজ নিয়ে এদেশে এসে ফিরে যাননি আর। রেস্টুরেন্ট খুলেছেন বেনামে কারণ তিনি নাগরিকত্ব পাননি। পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হয়েছে অথচ তাঁর ফেরার উপায় নেই। গোপনে তিনি শুধু দেশে টাকা পাঠিয়ে যান। এই মানুষটির কাছে প্রথম প্রজন্মের মানুষেরা যেমন অহংকার নিয়ে আসে দ্বিতীয় প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আসে উত্তপ্ত স্নেহ ভালোবাসা পেতে। পিংকির বন্ধু এই বয়স্ক মানুষটিও। যতদূর সম্ভব উপন্যাসের প্রতি অনুগত থেকে চিত্রনাট্য লিখেছিলাম। যদিও প্রচুর ঘটনা ও চরিত্র বাদ দিতে হয়েছিল। শৈবাল আর টিয়া নামের যুবক যুবতী স্থান পেয়েছিল শুধু পিংকি প্রবাল সোমের সূত্রেই।

মজার কথাটা হলো, শোনার পর কেন্ট মাথা নেড়ে বলেছিল, 'নাঃ, এটা একদম অবিশ্বাস্য। ওদের আমেরিকায় আসার পরের ঘটনা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলছি না কিন্তু মিস্টার সোম তো এখানে আসতেই পারবেন না।'

মনোজ চমকে উঠল, 'কেন? আপনি কি জানেন না সাত্তষট্টিতে— ?'

কেন্ট হাত নেড়ে ওকে থামাল, 'তা নয়। ওকে তো ইন্ডিয়ান পুলিশ এ্যারেস্ট করবে মেয়েকে হত্যা করার অপরাধে। লোকটা এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে যাতে ওর মেয়ে আত্মহত্যা করে। প্ররোচনা দেওয়াটা তো ক্রাইম। ওকে কি করে এদেশে আনলেন আপনারা ?'

মনোজ আমার দিকে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলাম। মনোজ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে বসল। আমাদের দেশে মানসিক অত্যাচারের কারণে সন্তান বা পিতামাতা আত্মহত্যা করলে শতকরা নিরানব্বুইটি ঘটনা নিয়ে থানা পুলিশ হয় না। বাবা মাকে যদি সন্তান খেতে না দেয় এবং তাঁরা যদি অনশনে থেকে বাধ্য হন মরে যেতে তবে তার জন্যে কখনই সন্তানের শাস্তি হয় না। প্রবাল সোমের বড় মেয়ে আত্মহত্যার কারণ হিসেবে লোকে প্রেম ও সন্তান ধারণকেই স্বাভাবিক মনে করবে। পিতা হিসেবে মারধর করে প্রবাল কোনো অন্যায় করেছেন বলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ মনে করবে না। পিতার আচরণ ওইটেই স্বাভাবিক বলে ধরে নেবে সবাই।

কেন্ট এবং সাইমনকে এসব কথা বোঝাতে সময় লাগল অনেক। হঠাৎ সাইমন একটা প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা, আমি শুনেছি আগে তোমাদের দেশে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে তার সঙ্গে পুড়িয়ে মারা হতো। এবং এটাকে কেউ ক্রাইম মনে করত না। এখন তো এসব ক্রাইম বলে মনে করা হয়। না ?'

মনোজ বলল, 'নিশ্চয়ই। আইন এক্ষেত্রে চূড়ান্ত শাস্তি দেবে।'

'এখন তাহলে কেউ ওসব করতে সাহস পায় না ?'

'না। প্রত্যেক দেশের মানুষেরই অতীতে কিছু কিছু খারাপ ব্যাপার থাকে ?'

'কিন্তু এখন কোনো যুবক স্বামী মারা গেলে তার বিধবাকে নিয়ে কি করা হয় ?'

'তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাপের বাড়িতে ফিরে যান। অনেকেই চান সম্মানের সঙ্গে স্বামীর বাড়িতে থাকতে। সম্পর্কটা অন্য আত্মীয়দের সঙ্গে কি রকম তার ওপর নির্ভর করছে সব।'
'যদি তার বাবা মা না থাকে। সে কি আবার বিয়ে করবে? তাকে স্বামীর আত্মীয়রা বিয়ে করতে সাহায্য করবে?'
মনোজ স্বীকার করল শতকরা এক ক্ষেত্রেও এই মানসিকতা তৈরি হয়নি।
'তাহলে সেই যুবতী মেয়েটি সারাজীবন একা থাকবে কেন?'
'হ্যাঁ। এই নিয়মটা ভাঙা দরকার।' মনোজ বলল, 'তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওই মেয়েটি একা বেরিয়ে আসতে পারে না অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাবে। আমাদের দেশে এখনও আত্মীয়রা উদ্যোগ নিয়ে বিবাহ ঘটান। কোনো পুরুষ যুবতী বিধবাকে চট করে বিয়ে করতে চাইবে না।'
'প্রেম হলে?'
মনোজ হাসল, 'প্রেম! যে দেশে এখনও প্রেম মানে চাপাচাপি ব্যাপার সেদেশে কোনো বিধবা প্রেম করছে জানলে রীতিমতো অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়।'
'আইনের চোখেও!'
'না। সমাজের চোখে।'
'তোমাদের দেশে সমাজ আছে এখনও?'
'না। নেই। তবে এসব ক্ষেত্রে তারা যেন কোত্থেকে উদয় হয়।'
সাইমন কিছুক্ষণ ভাবল। আমরা ওর মুখের দিকে দেখছিলাম। হঠাৎ সে বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। যারা বিধবাদের পুড়িয়ে মারত তাদের সঙ্গে এই লোকগুলোর পার্থক্য কি। পুড়িয়ে মারলে একেবারেই চুকে গেল, সারাজীবন বাঁচিয়ে রেখে তিল তিল করে মারাটা আরও জঘন্য অপরাধ। এর জন্যে আইন নেই কেন?'
এই লেখা যাঁরা পড়ছেন এইসব সত্যি কথা শুনতে আমাদের অস্বস্তির ব্যাপারটা তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আলোচনাটা কোথায় পৌঁছে গেল। দুটো দেশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য নিয়ে একটা গোঁজামিল সমাধান টানতে আমি রাজি নই। মানুষের সম্পর্কগুলো যদি হৃদয় থেকে জন্মায় তাহলে পৃথিবীর কোনো দেশেই তা আলাদা হতে পারে না। আমরা তো এতদিন শুনতে পেতাম আমেরিকানরা পাখা উঠলেই বাবা মাকে কলা দেখিয়ে বিয়ে করা বউকে নিয়ে আলাদা থাকে। সেই বৃদ্ধ বৃদ্ধা পিতামাতা, যাঁরা মনোজের প্রতিবেশী তাঁরা আমার ভ্রান্তি দূর করেছিল। এদেশে এক বাড়িতে থেকেও স্বচ্ছল ছেলে তার বউকে নিয়ে স্বার্থপরতার যে চূড়ান্ত নিদর্শন বাবা মা ভাই-বোনকে দেখায় সেটা কি আরও বেশি বেদনাদায়ক নয়? যা সত্যি, যা স্বাভাবিক তা মেনে নেওয়ার সময় আমাদেরও হয়েছে। অসুস্থা স্ত্রীকে কেন রান্না করে স্বামীকে খাওয়াতে হতো, বা হয়? কিন্তু এখন তো স্বামীও রান্নাঘরে প্রয়োজন হলে ঢুকছেন অথবা বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে? এই ব্যাপারটা কি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে কেউ কল্পনা করতে পারতেন?

ওঁদের বলেছিলাম, 'আর বড় জোর দশ বছর। আমাদের মেয়েরা যেভাবে শিক্ষিত হচ্ছেন, আত্মমর্যাদাবোধ যেভাবে বাড়ছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের যে চেষ্টা চলছে তাতে দশ বছরের মধ্যে পুরো পাল্টে যাবে ব্যবস্থাটা। একজন পুরুষ শুধু বাণী উচ্চারণ করতে পারেন, কাজের কাজটা করবেন নারীরাই। সেদিন আসতে বেশি দেরি নেই।'

প্রায় বিকেল নাগাদ আমরা সিদ্ধান্তে এলাম শুটিং শুরু হবে শীতের মাস দুই-তিন আগে। টানা। ফুয়াদ ইতিমধ্যে বাংলাদেশের দু'জন শিল্পীর সঙ্গে কথা বলে রেখেছে। তাঁরাও আগ্রহ দেখিয়েছেন। আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে যেসব শিল্পী নিউইয়র্কে আসবেন তাঁদের সঙ্গে চুক্তি করব। আমরা কেউ নিজে-দের কাজের জন্যে পারিশ্রমিক নিচ্ছি না। কিন্তু যোগ্যতা ও কাজ বুঝে লাভের অংশ বরাদ্দ করা হবে। সেইসব কাগজ মনোজ ইতিমধ্যে তৈরি করে রাখবে। কলকাতার ও ঢাকার শিল্পীরা থাকবেন এ পাড়াতেই। একটা বাড়ি মাস-দুইয়ের জন্যে ভাড়া নেওয়া হবে। এবং স্থির হলো পদ্মিনীকে যেহেতু আর পুরো প্রযোজনার দায়িত্ব দেওয়া যাচ্ছে না তাই আধিভাগ অংশ মনোজ ও পদ্মিনীর মধ্যে থাকবে।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় বাঙালির সমস্যা নিয়ে একটা ছবি নিউইয়র্কে হতে চলেছে এমন সম্ভাবনা বিকেলবেলায় যেন আমাদের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে চলে এলো। ওরা চলে গেলে বুঁদ হয়েছিলাম কিছুক্ষণ। এইসময় টেলিফোন বাজল। মনোজ কথা বলে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আজ রাত্রে কি ঘুমাবেন?' হেসে ফেল-লাম। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে অন্দরমহলের দিকে তাকালাম। মনোজ বলল, 'একটা রাত না ঘুমোলে কতটা আর খারাপ ভাববে! আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন। কলকাতায় আপনারা যে আড্ডায় যান তার সঙ্গে ওঁর সংযোগ আছে। উনি আজ রাত্রে আপনাকে নতুন কিছু দেখাতে চান। ইচ্ছে হলে এক রাউন্ড ঘুমিয়ে নিন। ঠিক ন'টায় আপনাকে ডেকে দেবো।'

২৪

জামসেদপুর টেলকোর সঙ্গে রাতের কুইন্সের খুব মিল। তবে টেলকোতে ডিসেম্বরের শেষে যে ঠান্ডা নামে কুইন্সের গরম পড়ার আগের মুহূর্তে সেই ঠান্ডা। মনোজ গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'রবীন্দ্রনাথ হেমন্ত নিয়ে এত কম, মুষ্টিমেয় গান লিখলেন কেন বলুন তো? বর্ষা বসন্ত তো জোয়ারের মতো অফুরন্ত, আর যত কিপটেমি হেমন্তের বেলায়?'

চোখের সামনে শীতমাখা হাইওয়ে। হুস্‌ হাস গাড়ির ছুটে যাওয়া, মসৃণ রাস্তায় একটুও ঝাঁকুনি না খেয়ে চারপাশের দৃশ্য আলস্য নিয়ে দেখা আর এর মধ্যে মনোজ একি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো? হেসে উঠলাম, 'কিপটেমি হবে কেন? যা পেরেছেন তাই লিখেছেন।' 'এই সমরেশ, এমন বোকার মতো কথা বলবেন না। বর্ষা নিয়ে একশো ষোলটা গান, বসন্ত নিয়ে ছিয়ানব্বই, শরৎ এল তিরিশটি গানে, গ্রীষ্ম ষোলটায় আর শীত পর্যন্ত জায়গা পেল বারোবার সেখানে হেমন্ত মাত্র পাঁচখানা গানে।' মনোজ গাড়ির স্পিড বাড়াতে গিয়ে বাড়াল না।

'আসলে আমাদের দেশে শরৎ-এর পর এত চট করে শীত চলে আসে যে হেমন্তকে চেনা যায় না। আমি তো বলব রবীন্দ্রনাথ ঠিকই করেছেন বেশি গুরুত্ব না দিয়ে।'

'কিন্তু জীবনানন্দ! হেমন্তের বিকেল? শীতের চেয়ে হেমন্ত কি অনেক বেশি বিষণ্ণতা আনে না? তাকিয়ে দেখুন রাত্রের রঙও কেমন মায়াময় এখন!' মনোজের কথায় আবার তাঁর কথা মনে পড়ল। গীতবিতান যাঁর কাছে গীতার

চেয়ে বেশি হৃদয়গ্রাহ্য ছিল। তিনি যখন পুজোর গান প্রেম নিবেদনের জন্যে কোনো নারীর উদ্দেশে ব্যবহার করতেন তখন মোটেই ঈশ্বর চিন্তা আসতো না। সন্ধ্যা পেরিয়ে যাওয়া রাত, ঘন হয়ে রাতের নামা নিউইয়র্কের নীল শুষে নেওয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে একই লাইন অন্যতর মানে নিয়ে এলো, 'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ তেমনি করে গাও গো।' সন্তোষকুমার ঘোষ বলতেন, 'যৌবন চলে গেল অথচ বার্ধক্য ইতস্তত করছে, এ বড় যন্ত্রণার সময়। এই হেমন্তে শুধু মানিয়ে নেওয়া, আকাশের সুরে সুর মিলিয়ে গান গেয়ে যাওয়া।'

ম্যানহাটনের মুখে একটা নির্জন রাস্তায় ফুটপাতের গা ঘেঁষে গাড়ি থামলো মনোজ কিন্তু ইঞ্জিন বন্ধ করল না। এখানে পার্কিং নেই বলেই ওই ব্যবস্থা। পুলিশের গাড়ি দেখলেই চাকা গড়াবে। ঘড়িতে এখন রাত সাড়ে এগারোটা। ঠান্ডাটা এখন বেশ জম্পেশ লাগছে। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে গাড়ির লাইটারে ধরিয়ে নিলাম। কলকাতা থেকে আসা আমার নিজস্ব ব্র্যান্ডের সিগারেট কবে শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি স্টেট এক্সপ্রেসে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কেনার সময় দেখেছি আমার নিজস্ব ব্র্যান্ডের চেয়েও সস্তা পড়ছে। যিনি আসছেন তাঁর সম্পর্কে মনোজ আমাকে একটা ধারণা দিয়েছিল। বিবাহিত কিন্তু কারিৎকর্মা পুরুষ। বেশি কথা বলেন বলে মনোজের না— পছন্দ। কিন্তু কলকাতা থেকে কোনো ঈষৎ পরিচিত লোক এলে এখানকার কেউ যদি যেচে কথা বলতে চায় তাহলে তাকে নিষেধ করতে যাওয়া ঠিক নয়। হঠাৎ মনোজ বললো, 'তিনি আসছেন।'

দেখলাম একটা লম্বা শরীর, ওভার কোর্টে মোড়া দ্রুত পা ফেলে ফুটপাত পেরিয়ে এগিয়ে আসছে। লোকটাকে বাঙালি বলে মনে হচ্ছে না।

গাড়ির কাছাকাছি আসতেই মনোজ হাত বাড়িয়ে পেছনের দরজা খুলে দিলো। ভদ্রলোক একটানে শরীরটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে চিৎকার করলেন, 'হাই'! শুভ সন্ধ্যা ভদ্রমহোদয়। আমি কি আপনাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি? আমার তো মনে হয় সেটা করিনি।'

মনোজ বললো, 'শুভ, ইনি সমরেশ।'

'নমস্কার মশাই। আচ্ছা, আপনাকে কলকাতায় দেখিনি কেন বলুন তো? শুভ একেবারে সামনের সিটের গায়ে ঝুঁকে পড়লেন। ওঁর নিশ্বাসও টের পেলাম।

মনোজ বললো, 'কলকাতা তো বড় শহর শুভ, তাই না?'

'দূর? মোটেই না। লেখকদের কয়েকটা আড্ডা আছে। লেকক্লাবে রবিবারের সকাল, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ক্লাবে শনিবারের রাত তাছাড়া অনেকগুলো বাড়ি আছে যেখানে গেট টুগেদার হয় তার একটাতেও আপনাকে দেখিনি।'

'আপনি ওসব জায়গায় যেতেন?'

'যেতেন মানে? কলকাতায় গেলে অন্য কোথাও যাই না। আমি আপনাকে একটু বোঝার চেষ্টা করি। দাঁড়ান। মনোজের কাছে সব শুনেছি। আমেরিকার কি কি দেখা বাকি আপনার?'

'সব। কারণ আমি বাকির লিস্টে কি আছে জানি না।'
'আপনি কি খুব গোঁড়া টাইপের লোক ?'
'মানে ?'
'শুনেছি, মিট করিনি, কোনো কোনো বাঙালি লেখক আছেন সতীলক্ষ্মী টাইপের। পিসিমা মাসীমামার্কা গল্প লিখে করে খান। আপনি কি সেই ধরনের ?' শুভর প্রশ্ন শুনে মজা লাগলো। মনোজ হেসে উঠলো হো হো করে। শুভ একটুও বিব্রত না হয়ে বলল। 'আপনি জল না পাথর না জানলে এই রাতটাকে ব্যবহার করব কি করে ? পাথর পাথরই কিন্তু জল কেমন না পাত্র যেমন !'
'জল কিনা জানি না তবে পাথর নই এটুকু ধরতে পারেন।' সত্যি কথাটাই জানালাম। শুভ বলল, 'গুড। এতেই চলবে। মনোজ বাঁ দিকে গাড়ি ঘোরান।' মনোজ নির্দেশ পালন করল। আমরা জানলাম শুভ যেখানে থাকেন সেখান থেকে ম্যানহাটনে আসতে বাসে লাগে এক ঘণ্টা। বউ শুয়ে পড়ার পর তিনি বেরিয়েছেন। লাস্ট বাসে সেখানে ফেরা যাবে না কারণ ম্যানহাটন থেকে তাহলে সাড়ে বারোটায় উঠে যেতে হয়। তিনি ফিরবেন ভোর সাড়ে চারটের ফার্স্ট-বাসে। যখন বাড়ি পৌঁছাবেন তখনও ওঁর স্ত্রী নিদ্রিতা থাকবেন। স্ত্রীকে সমীহ করেন কিনা মনোজ প্রশ্ন করলে শুভ খেঁকিয়ে উঠলেন, 'এটা আবার একটা প্রশ্ন হলো ? কেটে গেলে রক্ত পড়ে কিনা কাউকে জিজ্ঞাসা করেছেন ?'
মানুষটি একটু কথা বলেন বেশি কিন্তু আমার মন্দ লাগছে না। দক্ষিণ কলকাতায় বিশেষ করে একধরনের মানুষ দেখেছি বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে অনর্থক ভারি ভঙ্গি করে কথা বলেন। শুভর মধ্যে সেটা নেই। অনর্গল ইংরেজি শব্দের কায়দাবাজী আছে কিন্তু দু মিনিটেই বোঝা যায় প্যাঁচ বেশি নেই। শুভ বললেন, 'আপনাকে আমার গার্ল ফ্রেন্ডের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা খুব স্টেডি। এই একটি মেয়ে মশাই যার সঙ্গে চার বছর আছি কিন্তু চার বারের বেশি চুমুও খাইনি। ঠান্ডা মেয়ে আমার একদম ভালো লাগে না।'
'আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন কেন ?' তাছাড়া এতো রাত্রে—।'
'মনোজ, ডান দিকে গাড়ি ঘোরালো।' শুভর সিদ্ধান্ত বদল করতে সময় লাগে না।
মনোজ আদেশ মান্য করে জিজ্ঞাসা করল, 'শুভ, স্ত্রী ছাড়া আপনার প্রেমিকার সংখ্যা কত ?'
'নেই। কারণ স্ত্রীই আমার প্রেমিকা। আমার প্রথম। যে আসে তাকেই সুনীল গাঙ্গুলি শুনিয়ে দিই। তোমার আগের নারী সব প্রেম নিয়ে গেছে। ব্যাক ক্যালকুলেট করতে গিয়ে আগের নারী হিসেবে পাই স্ত্রীকেই। এঁরা সবাই মেয়েবন্ধু।'
শুভর নির্দেশে পার্কিং প্লেসে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমরা হাঁটা শুরু করলাম। গাড়ির বাইরে এসে মনে হলো জমে যাবো। হু হু বাতাস বইছে। পকেটে হাত পুরেও স্বস্তি নেই। রাস্তায় লোকজন খুব কম। দোকানপাটও বন্ধ হয়ে

গেছে। অবশ্য বার-রেস্টুরেণ্টের নিওন সাইনগুলো জ্বলছে। শুভ বাঁ-দিকের একটা উঁচু বাড়ির সামনে পেঁাছে বললেন, 'ফলো মি'। কার্পেট বিছানো সিঁড়ি বেয়ে শুভ তাঁর লম্বা চওড়া শরীর নিয়ে গটগটিয়ে উঠলেন। ওপরের সাইন-বোর্ড বলছে এটা ক্লাব। ঝকঝকে উর্দিপরা বিশাল চেহারার এক কালো যুবক দাঁড়িয়ে আছে প্রবেশদ্বারের সামনে। শুভ তাকে বললেন, 'হাই জো।'

জো মাথা নাড়ল, আমাদের দেখল তারপর ঈষৎ সরে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পথ করে দিলো। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে একটা ছোট্ট ঘর পেলাম যার একদিকে কাঁচের ঢাকা কাউণ্টারের ওপাশে বেশ বৃদ্ধা এক শ্বেতাঙ্গিনী বসে আছেন। শুভ পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দেখালেন এবং দশ ডলার দিলেন। তারপর বললেন 'আপনাদেরটা আমি দিয়ে দিচ্ছি।' মনোজ আপত্তি করল, 'আপনি দেবেন না, কেউ নাবালক নই।'

কোথায় যাচ্ছি কেন যাচ্ছি জানি না। তবু চল্লিশ ডলার বেরিয়ে গেল। মনোজ বলল, 'এ সেই রেস থেকে পাওয়া ডলার। গায়ে লাগবে না।' শুভর লাগল দশ কিন্তু আমাদের মাথাপিছু কুড়ি। বৃদ্ধা যে কার্ডদুটো এগিয়ে দিলেন তাতে লেখা তিন মাসের মধ্যে কার্ডধারী এখানে যতবার আসবেন তাঁকে দশ ডলারের বেশি প্রতিবারে দিতে হবে না। বুঝলাম শুভ কেন সুবিধেটা পেলেন। কার্ডের পরে বৃদ্ধা আমাদের দিকে তিনটে চাবি এগিয়ে দিলেন। মনোজ জিজ্ঞাসা করলে, 'চাবি দিয়ে কি হবে?'

অত্যন্ত স্মার্ট ভঙ্গিতে শুভ আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'আপনার জন্যে লকারের চাবি দেওয়া হলো। ভেতরে ঢুকলে লকার রুম পাবেন। সেখানে চাবির নম্বর মিলিয়ে লকার খুললে পরিষ্কার তোয়ালে দেখবেন। জামা কাপড় খুলে ওই লকারে রেখে তোয়ালে পরে নেবেন।'

আমি হতভম্ব, 'খামোকা তোয়ালে পরতে যাব কেন?'

'এই ক্লাবে সবাই তাই পরে। প্রকৃতির কাছাকাছি আসা আর কি। ভেতরটা একদম শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, ঠান্ডা লাগার সুযোগ নেই। অবশ্য যদি আপনারা পোশাক না খুলতে চান কেউ জোর করবে না। তবে সেক্ষেত্রে আপনারা মূল স্রোতের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন। এখন আপনাাদের যা অভিলাষ তাই করুন।'

মনোজ আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আমরা দর্শক হিসেবেই থাকতে চাই।' লকারের দুটো চাবি ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হলো। শুভ দরজা ঠেলে আমাদের পাশের হলঘরে নিয়ে গেলেন। বিশাল হলঘর। আমাদের ইচ্ছেমতন বিচরণ করতে বলে শুভ চলে গেলেন লকার রুমে, সম্ভবত তোয়ালে পরতে। হালকা নীল আলোয় হলটাকে রহস্যময় মনে হচ্ছিল। হলের এক কোণায় পার্কের মতো সাজানো চাতাল। তাতে জল বয়ে যাচ্ছে। অজস্র কাগজের ফুল ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। যেন সিনেমার সেট তৈরি, একটুবাদেই শুটিং শুরু হবে।

এই মুহূর্তে আমার বিশেষ কথাটি বলা প্রয়োজন। অশ্লীলতার প্রকৃত ব্যাখ্যা আমার নিজস্ব বোধ যেভাবে নিয়ে থাকে তার সঙ্গে পাঠকদের একাত্ম হবার কোনো কারণ নেই। জ্ঞানত, লেখালেখি শুরু করার পর এই নিয়ে লেখার

প্রবৃত্তি হয়নি। মনে আসে তিন নম্বরের সুধারাণী নামক একটি উপন্যাসে সোনাগাছির সেই অশিক্ষিতা বারবণিতা যখন আন্তজার্তিক বারবণিতা সম্মেলনে আমন্ত্রিতা হয়ে প্যারিসে যাচ্ছিল তখন এরোপ্লেনের টয়লেটের সামনে চুম্বনরত নারীপুরুষকে দেখে সে বর্ণনা করেছিল সহযাত্রীর কাছে এই বলে, ওরা ব্যবসা করছে এখানে? অর্থাৎ এই নারীটির কাছে জগত তার জগতের দৃষ্টিতেই প্রতিষ্ঠিত। অনেকেই বলেছেন এতে নাকি অশ্লীলতা এড়ানো গেল। আমি বুঝি না। কিন্তু শুভবাবু আমাদের যে জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে লকার রুমে গিয়েছিলেন তার বিস্তৃত বর্ণনা নিশ্চয়ই ভারতীয়দের কুৎসিত লাগবে। মিনিট পনেরোর মধ্যে আমার বমি পেয়েছিল। টয়লেটে ঢুকে বমিও করেছিলাম এবং যতক্ষণ না বাইরের খোলা আকাশের নীচে দাঁড়াতে পেরেছি ততক্ষণ গা ঘিনঘিন ভাবটা যায়নি।

অতএব একই অনুভূতি আমি আপনাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চাই না। কিন্তু সারমর্মটি বলা প্রয়োজন। আমি শুভর কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং না গেলে আধুনিক জীবনের এক ধারার চূড়ান্ত পরিণতি আমার অগোচরে থাকত।

নরনারীর জীবনে প্রেম ভালবাসাপ্রসূত অথবা ব্যতিরেকেই যে যৌনসম্পর্ক আসে তাকেই এতকাল সুস্থাচার বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু এই স্বাভাবিক ব্যাপারই কোনো কোনো মানুষ এবং মানুষীকে আর টানছে না। স্যাডিস্টদের আমরা জানি। যারা একধরনের যন্ত্রণা সৃষ্টি করে আনন্দিত হয়। কিন্তু আমি জানতাম না দুটো হাত ওপরের হাতকড়ায় স্বেচ্ছায় বেঁধে দশ ডলার খরচ করে ভেতরে কোনো মানুষ ঢুকতে পারে শুধু পশ্চাৎ দেশে এবং পিঠে কোনো রমণীর হাতে চাবুকের আঘাত খেতে। তার শরীরে যখন লাল দাগ ফুটে ওঠে তখন মুখে তৃপ্তির হাসি ফোটে। সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে স্বামী এখানে আসে কারণ স্ত্রী শরীরে আঘাত পেতে চান যা স্বামীটি দিতে পারে না। বিবস্ত্রা স্ত্রী যখন ক্লিওপেট্রার মতো অহংকারী হয়ে বসে থাকেন তখন স্বামী আহ্বান করেন ইচ্ছুক পুরুষদের। তারা সার বেঁধে দাঁড়ায় সামনে। অত্যন্ত অবহেলায় স্ত্রী একজনকে নির্বাচিত করলে অন্যাদের মুখ ভার হলেও বিনা প্রতিবাদে সরে দাঁড়ায়। সেই পুরুষটি যখন স্ত্রীকে চাবুকের আঘাত করে তিনি উল্লাসে চিৎকার করেন আর দর্শকদের মুখ দেখে মনে হয় তারা কোনো স্বর্গীয় দৃশ্য দেখছে। এখানে মদ বিক্রি হয় না। নেশা যাদের উত্তেজনা দেয় এরা তাদের দলে পড়ে না। আমরা চমকিত হয়েছিলাম এক বৃদ্ধদম্পতিকে দেখে। অন্তত নব্বুই-এর কাছে বয়স এবং তারা সভ্যপোশাকে কোণের দুটো চেয়ারে পাশাপাশি বসেছিলেন। মনোজ তাদের জিজ্ঞাসা করেছিল এই বয়সে এখানে তারা কেন আসে?

বৃদ্ধ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধা তাকে ধমকে চুপ করিয়ে রাখলেন। তারপর নিজেই জবাব দিলেন, সারাজীবন আমার স্বামীকেই কৈফিয়ৎ দিইনি কখনও তুমি কোন ছাড়!

শুভকে না জানিয়ে আমরা বেরিয়ে এসেছিলাম। বুঝতে পারছিলাম আমরা তোয়ালে না পরায় শুভ প্রথম দিকে অস্বস্তিতে ছিল শেষে আমাদের অস্তিত্ব ভোলবার চেষ্টা করছিল। এসব গল্প বিক্ষিপ্তভাবে আদিমকাল থেকে চালু আছে। কিন্তু এদের উৎসাহ দেবার জন্য একটা আইনসংগত ক্লাব চালু রাখার প্রয়োজন ওদেশের মানুষ আজ অনুভব করেছে। শ্লীল-অশ্লীলের দোহাই পেড়ে কোনো লাভ নেই। নরনারীর স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মিলন শ্লীল নয় বলে মানুষ মনে করে বলেই এতো দরজা জানলা বন্ধ করতে হয়। সেই বিখ্যাত গল্প মনে পড়ে গেল। একজন জার্মান ও একজন বাঙালির একই সংগে পত্নী বিয়োগ হয়েছে। দুজনেই শোকে মুহ্যমান। জার্মান শেষ পর্যন্ত বলল, 'এই নির্জন পাহাড়ে আমার স্ত্রীকে কবর দিতে হবে। একটা ভালো কাপড় দরকার ওকে ঢেকে দেওয়ার জন্যে। সারাজীবন তো ওকে আমার ঢাকার দরকার হয়নি।' বাঙালি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ওকে পুরোপুরি দেখতে আমার তিরিশ বছর লাগল।' জার্মান অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের বিয়ে হয়েছে কতো বছর?'

বাঙালি জবাব দিলো, 'তিরিশ বছর।'

কেন্ট চলে গিয়েছিল হাতে হাত মিলিয়ে। আমাকে নাকি তার ভালো লেগেছে। ঠিক যাকে বলে হুমড়ি খেয়ে দেখতে চাওয়া ট্যুরিস্ট, আমি তা নই। মনোজের সংগে সে নিয়মিত যোগাযোগ করবে ছবিটার ব্যাপারে। আমি মনে মনে হেসেছি। কেন্টকে নিশ্চয়ই আমাদের এই ভ্রমণবৃত্তান্ত সরকারি দপ্তরকে জানাতে হবে। তাঁরা জানতে পারবেন আমি সবসময় মসৃণ পথে হাঁটিনি। কিন্তু ভরসা এখানেই যে ওঁরা যেভাবে জীবন দ্যাখেন তাতে সঙ্কীর্ণতা নেই বললেই চলে। দেশে ফিরে যাওয়ার টান পড়ছে মনে। কেন যেন মনে হচ্ছে অনেকদিন আমি কলকাতাকে দেখিনি। চা-বাগান ছেড়ে যখন জলপাইগুড়ি শহরে এসেছিলাম তখন কেবলই মনে হতো কতদিন চা-বাগান দেখিনি। যখন কলকাতায় এলাম তখন জলপাইগুড়ি আমার শেকড় ধরে টানত। আর এখন কলকাতা টানছে। আমি জানি যদি আরও দশ বছর এই নিউ-ইয়র্কে থেকে যাই তাহলে নিউ-ইয়র্কও টানবে। আসলে আমি কোনো বিশেষ শহরের নই। শহরটায় থাকার অভ্যাসে অভ্যস্থ হই শুধু। এতোবছর কলকাতায় থেকেও কলকাতার জন্য কিছুই করিনি। করার কথা মনেও আসেনি। প্রিয়জনের জন্যে কি লোকে কিছু না করে থাকে! তাহলে সবটাই অভ্যেস থেকে বানানো।

মাঝরাত্রে মনোজ আমার ঘরের দরজায় নক্ করল। লেপের তলায় শুয়েছিলাম। ফিউচার শক্ নামক একটি বই পড়তে পড়তে খেয়াল ছিল না রাত কত হয়েছে। আজ সন্ধ্যের পর আমরা বাইরে যাইনি। মনে হচ্ছিল সবই দেখা হয়ে গেছে। অথবা শুভর সংগে সেই নিশিভ্রমণের পর থেকেই এই রাত দেখার আগ্রহে ভাঁটা পড়েছিল। সোয়েটার শাল চাপিয়ে বিছানা ছেড়ে দরজা খুলতেই দেখলাম মনোজ হাসছে খানিকটা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতেই। জিজ্ঞাসা করল, 'ঘুমিয়ে ছিলেন?' আমি আশেপাশে তাকালাম! মনোজের স্ত্রী নেই কোথাও। ওদের শোওয়ার

ঘরের দরজা ভেজানো। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার ?'
'একটু নিচে আসবেন ?' মনোজ জানতে চাইল।
'চলুন।' সিঁড়ি বেয়ে মনোজকে অনুসরণ করে মাটির নিচের হল ঘরে চলে এলাম। দেখলাম সবকটা আলো সেখানে জ্বলছে। এমন কি একটা টি ভি নিঃশব্দে চলছে। সোফার এক কোণে পা মুড়ে চাদর জড়িয়ে আরাম করে বসলাম। মনোজ বলল, 'আমি খুব এক্সাইটেড। ব্যাপারটা ষোল সতের বছরে হওয়া উচিত সমরেশ, কিন্তু আমার মনে হলো আপনাকে না শোনানো পর্যন্ত আমি ঘুমাতে পারব না। আপনি নিশ্চয়ই আমার অবস্থা বুঝতে পারছেন।'
'না। বুঝতে পারছি না। তবে যেহেতু ঘুমাচ্ছিলাম না তাই আড্ডা মারতে খারাপ লাগবে না।' সিগারেট ধরালাম আমি, তারপর বললাম, 'বেশ ঠান্ডা। আমরা এক পাত্তর খেতে পারি ?' 'যাক। এ্যাদ্দিনে খেতে চাইলেন।' মনোজ প্রায় লাফিয়ে কোণের দিকে চলে গেল। দুটো গ্লাসে শিভাস রিগ্যাল ঢেলে জল মিশিয়ে টেবিলে রাখল। এ বাড়িতে যে কোনো আমেরিকান গৃহের মতো নানান মদের বোতল রাখা আছে। যার এক একটা নাম শুনলে কলকাতার মদ্যরসিকদের জিভ সিক্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু এ বাড়িতে পা দেবার পর থেকেই মাঝে মাঝে দুই-এক ক্যান বিয়ার ছাড়া আমার বিন্দুমাত্র বাসনা হয়নি ওগুলো গেলার। কেন হয়নি ঈশ্বর জানেন।
একটা চুমুক দিয়ে মনোজ বলল, 'শুনুন, আমি একটা গল্প লিখেছি !'
সোজা হয়ে বসলাম। 'এই দ্বীপ এই নির্বাসন' পড়তে পড়তে আমার বারংবার মনে হয়েছে মনোজের হাত আমাদের অনেকের চেয়ে ভালো। একজন বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার নিউ ইয়র্কে বসে কোনো অনুপ্রেরণা ছাড়া একটা উপন্যাস লিখে গেল এটা ভাবা যায়, কিন্তু সেই উপন্যাস যদি চমক তৈরি করে তখন অন্যতর ভাবনা মাথায় আসে। আমি মনোজকে অনেকবার বলেছি গল্প লিখতে। ও এড়িয়ে গেছে, 'দূর আমার দ্বারা হবে না। নিজের পত্রিকার পাতা ভরাতে যা দেখেছি তাই লিখেছি, গল্প লেখার ক্ষমতা আমার কোথায় ?' অতএব আমি চোখ বন্ধ করে বললাম, 'পড়ে যান।' মাটির নিচের সেই ঘরে পৃথিবীর কোনো শব্দ আসে না। মনোজের নিকটজনেরা ওপরের ঘরে গভীর নিদ্রামগ্ন। সেই মধ্যরাতে মনোজ একটানা গল্পটি পড়ে যখন শেষ করল তখনও আমি পানীয়ের পাত্রে হাত দিইনি। এবং আমার মনে হলো অনেক অনেক বছর পর বাংলা সাহিত্য একজন সত্যিকারের লেখককে পেল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি নাম দিয়েছেন ?' 'নামকরণ ব্যাপারটা খুব গোলমেলে, বুঝলেন। পুরোটা যে লিখতে পারব তাই আমি ভাবিনি। খুব খারাপ লেগেছে ?'
'না মনোজ। আপনি একটি অনবদ্য গল্প লিখেছেন।'
'কেন অনবদ্য বলছেন ?'
আমি থমকে দাঁড়ালাম। মুকুন্দর কাছে গল্প শুনেছি শম্ভু মিত্রের কাছে কেউ যদি তাঁর নাটক দেখে বলত খুব ভালো লেগেছে তাহলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'কেন ভালো লাগল ? কারও খারাপ লাগলে তো আমরা জানতে চাই কি কি

কারণে খারাপ লেগেছে তাহলে ভালো লাগার কারণটা জানতে চাইব না কেন ?'

ভেবে দেখেছি খারাপ লাগার সময় কারণগুলো বেশ চটপট মনে আসে কিন্তু ভালোলাগা বোধটা মনে ছড়ালে বুদ্ধি দিয়ে তার বিশ্লেষণ করতে হয়। সেইটে করার সময় কেমন যেন বোকা বোকা লাগে বেশিরভাগ সময়েই। মনোজ যখন প্রশ্ন করল তখন আমাকে ভাবতে হলো। মনোজ জানতে চাইল কোন কারণে আমার মনে হলো গল্পটি ভালো। আমরা যখন আলোচনা শেষ করেছি তখন ভোর হবো হবো। হাত জড়িয়ে ধরে সে জানতে চাইল, 'সত্যি বলুন তো গল্প লেখালেখি আমার হবে ?'

বললাম, দেখুন মনোজ, এইরকম একটা গল্প লিখতে পারলে আমি খুশি হতাম। আপনি এখনই গল্পটা দেশ পত্রিকায় পাঠিয়ে দিন।'

মনোজ হো হো করে হেসে উঠল, 'ক্ষেপেছেন! 'দেশ'-এর মতো পত্রিকা একজন নতুন লেখকের গল্প ছাপবে! বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার মতো অবস্থা। ছোট-খাটো কাগজের নাম বলুন যারা ছাপালেও ছাপাতে পারে।'

মাথা নাড়লাম, 'না। শুরু করতে হলে এক নম্বর দিয়েই করতে হবে।'

'দেশ আমার লেখা খুলেও পড়বে না।'

'আপনি সাগরদার নামে পাঠান। আমার বিশ্বাস ওই একটি জায়গায় বিচারে ভুল হয় না।' গল্পটির কারণে আমরা দু'জনেই খুব উত্তেজিত ছিলাম। 'দেশে' পাঠানোর ব্যাপারটা মনোজ মেনে নিতে পারছে না। ওর ধারণা ভস্মে ঘি ঢালা হবে। ঘুম আসছিল না। আমরা দু'জন নিঃশব্দে ওপরে উঠে এসে দরজা খুলে চাবি দিয়ে বাইরে পা দিলাম। তখনও অন্ধকার গাছের মাথায়। ঘাসের ওপর শিশির চপচপে হয়ে রয়েছে। হাড় কাঁপানো শীতে চারপাশ নিস্তব্ধ। দু'জনে চুপচাপ রাস্তা ধরে হাঁটছিলাম। নিঃশ্বাস নিলেই বুক ভরে যাচ্ছিল। সারা-রাতের ক্লান্তির চিহ্ন এক ফোঁটা নেই শরীরে। মাথায় শুধু পাক খাচ্ছে গল্পের বিষয়বস্তু। আমি জানি সাগরদা নতুন ক্ষমতাবান লেখক খুঁজছেন। গত কুড়ি বছরে বাংলা সাহিত্য একজনও সেইরকম লেখক পায়নি যার লেখা পড়তে পাঠ-কেরা উন্মুখ হয়ে থাকে। বয়স্ক লেখকরা ক্রমশ স্তিমিত হচ্ছেন, কেউ কেউ চলেও গেছেন অথচ নতুন কেউ তাঁদের জায়গা নিচ্ছে না। এই রকম চললে কুড়ি বছর পরে ক'জন লেখক বাঙালি পাঠকের জন্যে বেঁচে থাকবে কে বলতে পারে। আমাদের সময় স্কুলে পড়াশোনার যে রীতিনীতি ছিল তাতে আর যাই হোক ভবিষ্যত নির্মাণের আকাঙ্খা কোথাও ছিল না। সেটা হতো আপনা আপনি। পাঠ্য বইয়ের বাইরে রাশি রাশি পড়াশোনার আনন্দ আমরা পেয়েছি। কেউ কেউ হাত পাকাতে শুরু করেছি তখন থেকেই। এখনকার ছেলে মেয়েদের সেই সুযোগ কম। ক্লাস নাইনে উঠলেই হয় ডাক্তার নয় ইঞ্জিনিয়ার হবার প্রতি-যোগিতায় নামতে হয় অভিভাবকের নির্দেশে। সাহিত্য করার ফুরসৎ কোথায়! মনোজের গল্প সাগরদা যদি পড়েন তাহলে 'দেশে' অবশ্যই ছাপা হবে।

হাঁটতে হাঁটতে মনোজ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি সূর্য প্রণামের মন্ত্রটা জানেন, না ? উত্তরাধিকারে পড়েছি।'

সেই কবে ছেলেবেলায় দাদুর সঙ্গে তিস্তা নদীর গা বেয়ে কাক ভোরে হাঁটতে হাঁটতে তাঁর মুখে নিত্য মন্ত্রটা শুনতাম, আজ আমার গায়ে কাঁটা দিলো। মুহূর্তেই যেন আমি সেই ছেলেবেলায় পেঁাছে গেলাম। নিউ ইয়র্কের ভোর আর জলপাইগুড়ির ভোর একাকার হয়ে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য, আমি কিছুতেই মন্ত্রটা পুরো মনে করতে পারছি না। ভুল শব্দে গান গাওয়ার মতো ওটা উচ্চারণ করতে যাওয়া অন্যায়।

সকাল হচ্ছে। আমরা একটা কফি স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে কফি খাচ্ছিলাম। চোখের সামনে রাস্তায় একটু একটু করে লোক বাড়ছে। কেউ জগিং করছে, কেউ হাঁটছে স্বাস্থ্যের কারণে। হঠাৎ মনোজ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'পেয়েছি। গল্পটার নাম দেবো 'গর্ভ দাও'।

এখানে পাঠকদের একটু পরের কথা বলে রাখি। ভালো গল্প পাঠিয়েছিল মনোজ। সেই গল্প সাগরময় ঘোষ 'দেশ' পত্রিকায় পুজো সংখ্যায় ছেপে ছিলেন সরাসরি। এই সৌভাগ্য আর কোনো লেখকের হয়েছে কিনা জানি না। ছ'মাসের মধ্যে মনোজের আরও দুটো গল্প দেশে ছাপা হলো। শেষ পর্যন্ত সাগরদা ওকে 'দেশ' পত্রিকার ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে বললেন। সাগরদা আমায় বলেছিলেন, 'অনেকদিন পরে একটি জাত লেখক পেলাম হে।' কিন্তু বিধাতার ইচ্ছে ছিল অন্যরকম।
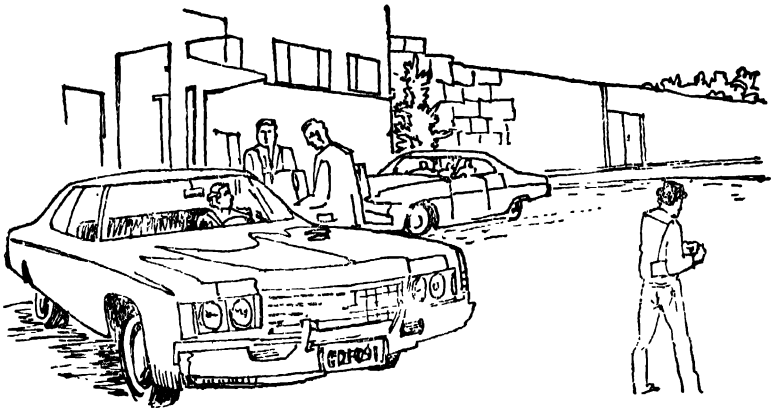
২৫

ঈশ্বরের ইচ্ছের কথা আপাতত থাক। আমার খুব দৃঢ় ধারণা ভদ্রলোকের তাল-জ্ঞানের বড্ড অভাব। হঠাৎ কাউকে কাউকে অনেক কিছু দিয়ে দেন, কাউকে একফোঁটাও নয়। আবার দিয়েই তার মনে কেন দিলাম, তখন কেড়ে নিতে চেষ্টা করেন। যাঁদের কাছ থেকে পারেন না তাঁরাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যজিৎ রায়, যাঁদের কব্জা করে ফেলেন তাঁরাই হয় মনোজ ভৌমিক। এই প্রসঙ্গ আজকের লেখার শেষে বলব। একজন লেখককে নাকি নির্লিপ্ত হতে হয়, কিন্তু আপনাদের কাছে বলতে দ্বিধা নেই, এরপর আর লেখার আগ্রহই আমার হচ্ছে না।

আমেরিকায় আমি গিয়েছিলাম মনোজের চিত্রনাট্যের কাজ, সরকারি ব্যবস্থা-পনায় দেশ ঘুরে মানুষ দেখতে। সত্যি কথা বলতে গেলে এরপরেও তো কিছু-দিন ওখানে ছিলাম। খুব বেশি মানুষের কথা আজ মনে পড়ে না। শুধু নিউ-ইয়র্ক টাইমসের চলচ্চিত্র সমালোচক ভিনসেন্ট ক্যানবি আর বিখ্যাত অভিনেতা ডাস্টিন হফম্যান ছাড়া। ভিনসেন্ট ক্যানবি হলেন সেই ভদ্রলোক যিনি সত্যজিৎ রায়ের গুণমুগ্ধ হিসেবে নিউইয়র্ক টাইমসে অনেক লেখালেখি করেছিলেন। মনোজই ওঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল। ওর আগ্রহ ছিল। আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের নিয়ে যে ডকুমেন্টারিটা ও বানাচ্ছে তা শেষ হলে ভিনসেন্টকে দেখাতে চায়। সেই ব্যাপারেই কথা বলবে। আমি একজন চলচ্চিত্র সমালোচক জেনে ভিনসেন্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছেন কথা বলতে।

আমরা দুপুরবেলায় বেরিয়েছিলাম। হাতে সময় ছিল। ব্রডওয়ে পাড়ায় পাক দিয়েছিলাম অনেকক্ষণ। কোথাও টিকিট নেই। আমেরিকায় এসে ব্রডওয়ের নাটক দেখে যাব না ভাবতেই খারাপ লাগছিল। তিনমাস আগেই নাকি হাউস-

ফুল হয়ে যায়। ডেথ অফ এ সেলসম্যান, জোবরা দ্য গ্রেট অথবা ওহ্ ক্যালকাটার পোস্টার দেখে ফিরে আসতে হলো। থিয়েটার পাড়ার অদূরে একটা সেন্টার থেকে কিছু প্রাত্যহিক টিকিট বিক্রি হয় সব নাটকের। সেখানে লাইন পড়ে কাউন্টার খুলতেই। ফুরিয়ে যায় চোখ মেলতেই।
নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা সম্পর্কে একটা বিশাল ভাবনা ছিল। আমেরিকার অত নামি কাগজ যখন, তখন তার অফিসের কেতাই হবে আলাদা। প্রতি ফ্লোরে অবশ্য ইউনিফর্ম পরা তদারকি অফিসার আছেন কিন্তু যখন আমরা ভিনসেন্টের সন্ধানে একটা হল ঘরে পৌঁছালাম তখন রাইটার্স বিল্ডিং-এর তিন চারতলার হল ঘরগুলোর সঙ্গে কোনো তফাৎ পেলাম না। সেই একই রকম ডাঁই করে রাখা কাগজপত্র, এ টেবিল থেকে ও টেবিলে চিৎকার করে কথা বলা, যেকোনো বঙ্গদেশীয় কেরানির মনে হবে ঘরে ফিরে এলাম।
ভিনসেন্ট ক্যানবি অবশ্য ছোটঘরে বসেন কিন্তু সেটি খুবই সাধারণ। ষাট পেরিয়ে যাওয়া শিক্ষিত আমেরিকান চেহারার মানুষ। আলাপ হবার পর বললেন, 'আজ আমি খুব টেনশনে আছি। ফ্রান্সে আজ 'ঘরে-বাইরে' দেখানো হচ্ছে। ওর রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই।'
ব্যাপারটা দেশে থেকেই শুনেছিলাম। 'ঘরে-বাইরে' ওখানকার ফেস্টিভ্যালে দেখানো হবে। কিন্তু সেটা যে আজকেই তা জানতাম না। অতএব ছবিটার প্রসঙ্গ উঠল। ভিনসেন্ট পারিবারিক অসুবিধার জন্যে ফেস্টিভ্যালে যেতে পারেননি। ছবিটাও দেখা হয়নি। মনোজ তো সুবিধে পায়নি। ভিনসেন্ট জানতে চাইলেন কলকাতায় ছবিটা রিলিজ করেছে কিনা! আমার অভিজ্ঞতা কি! হঠাৎ অনুভব করলাম যে তর্ক বা মতামত আমি কফি হাউসের টেবিলে বসে সোচ্চারে উচ্চারণ করতে পারি একজন বিদেশীর কাছে সেটা করতে বাধছে। আমার মতো একজন সত্যজিৎভক্ত কলকাতায় বসে মনে করেছে এটি তাঁর প্রথম সারির ছবি নয়। কিন্তু সেকথা আমি নিউইয়র্কে চেঁচিয়ে বলতে যাবো কেন? অনেকের কাছে ব্যাপারটা সারল্য থাকছে না কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যাঁর কাছে আশাতিরিক্ত পেয়েছি তাঁর কয়েকটা ত্রুটি চোখে পড়লেই মধ্যরাতের কুকুরের মতো চিৎকার করায় আর যাইহোক কিছু পাওয়া হয় না। সারাজীবন যে পিতা নিজেকে সংসারের জন্যে উজাড় করে দিলেন তাঁর বৃদ্ধ বয়সে কিছু অসংগতি দেখলেই সমালোচনার বাণ ছুঁড়ে নাজেহাল করার রুচি আমার নেই। ভিনসেন্ট দেখলাম ভারতীয় ছবির খবর মোটামুটি রাখেন। হিন্দীতে এখন অনেক ভালো ছবি হচ্ছে তাও জানেন। বললেন সন্ধের পরে জানতে পারবেন ফেস্টিভ্যালের দর্শকদের প্রতিক্রিয়া কী! ইউরোপ আমেরিকায় যাঁরা নতুন ছবির সার্কিট কেনেন তাঁদের এজেন্টরা থাকে এই ফেস্টিভ্যালগুলোতে। একজন বিখ্যাত এজেন্ট গিয়েছেন ফ্রান্সে শুধু সত্যজিৎ রায়ের ছবির জন্যে। দর্শকদের প্রতিক্রিয়া যাচাই করবেন তিনি। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। সাবটাইটেল সাঁটা একটা ছবি দেখে দর্শকরা প্রথমবারেই বিষয়ের সঙ্গে কতটা অন্তরঙ্গ হতে পারেন? সেই প্রতিক্রিয়া ছবির বিক্রির ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা নিলে তো খুব মুস্কিল!

ভিনসেণ্ট মনোজকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে আমন্ত্রণ পেলেই তিনি ওর ডকুমেণ্টারি দেখতে যাবেন। আমেরিকায় ভারতীয়দের দ্বিতীয় প্রজন্মের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বললেন, 'ওরা আমাদের চেয়ে বেশি আমেরিকান কারণ আমাদের আমেরিকান হবার জন্যে কোনো উদ্যম নেই ওদের আছে। তবে কি জানো, এক-জন ইউরোপিয়ান যদি আফ্রিকার কোনো গ্রামে দুই পুরুষ ধরে বাস করে তা-হলেও এই সংঘাত দেখা দেবে। তোমাদের ছেলেমেয়েরা এদেশে এসে ছুটছে বৈভবের পেছনে আর এরা ওখানে গিয়ে চাইছে বৈভবের জাল থেকে মুক্তি। নাটকের কথা উঠল। টিকিটের অভাবে দেখা হচ্ছে না জেনে বললেন, 'তা কি হয়! আমি একটা চিঠি দিচ্ছি। ডেথ অফ এ সেলসম্যানের কাউণ্টারে দেখিও। ওদের ম্যানেজার তোমাদের টিকিটের ব্যবস্থা করে দেবে।'

এটুকুই আমার লাভ বলে মনে হয়েছিল সেই মুহূর্তে।

আচমকা ফোন এলো আমার। বাফেলো থেকে একটি তরুণ যার নাম জামাল জিজ্ঞাসা করছে আমি সেখানে কবে যাবো। বাফেলোতে যাওয়ার কোনো কথাই নেই অথচ সে বলছে তাকে নাকি কামালচাচা বলেছে আমি সেখানে যাবো। আমি বিস্মিত বুঝে জামাল জানতে চাইল তাহলে কি আমার নায়েগ্রা ফল্‌স দেখার কোনো ইচ্ছে নেই? জানতাম না নায়েগ্রা বাফেলো শহরের কাছে আর বস্টন থেকে কামাল এইটে ভেবেছে! জানিয়ে দিলাম যাবো। ছেলেটি টেলিফোন নম্বর দিয়ে বলল আগে জানলে সে এয়ারপোর্টে থাকবে।

মনোজ হাসছিল। বলল, 'আমেরিকায় কেউ এলেই নায়েগ্রা দেখতে চায়। ইতি-মধ্যে তিনবার গিয়েছি গাইড হয়ে। আপনার বেড়ানোর ধরণ দেখে মনে হয়েছিল আপনি ইণ্টারেস্টেড নন। কিন্তু চলুন, ঘুরে আসি।'

কেনেডি এয়ারপোর্ট ছাড়াও নিউইয়র্কে আর একটি এয়ারপোর্ট আছে যেখান থেকে দেশের ভেতরে ছোট প্লেনগুলো যাতায়াত করে। মনোজ আর আমি ওর গাড়িতে যখন এয়ারপোর্ট পৌঁছালাম তখন বিকেল পাঁচটা। পার্কিং প্লেসে গাড়ি চাবি দেওয়া পড়ে রইল। টিকিট নিয়ে বেরিয়ে এলো মনোজ। যতক্ষণ না ফিরি গাড়ি এখানে ঠিকঠাক থাকবে। এয়ারপোর্ট বিল্ডিংস-এ ঢোকার পর কেন জানি না বারংবার হাওড়া স্টেশনের কথা মনে পড়ছিল। সেই গ্যাঁজাগেজি হইচই, একটুও অহঙ্কারী আবহাওয়া নেই। ঘাড় দেখে মনোজ বলল, 'চলুন চা খাই, ঘণ্টাখানেক পরে প্লেনে উঠলে বিশ ডলার বাঁচানো যাবে।'

'মানে?'

'আমরা যাব পিপল্‌স এয়ারওয়েসে। এ শহর থেকে ও শহরে যাওয়ার জন্যে এই জনতা প্লেন এখন পাবলিকের ভরসা। ট্রেনের চেয়েও ভাড়া কম। আবার ছ'টা পর্যন্ত এক ভাড়া আর তারপরে আরও কনসেশন। এসব দিচ্ছে কারণ ওদের এস্টাবলিশমেণ্ট চার্জ নেই বললেই চলে।' আমি একটি চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা পেলাম। জীবনে প্রথমবার প্লেনে উঠলাম অথচ টিকিট হলো না। দূরপাল্লার বাসের কণ্ডাক্টর দরজায় দাঁড়িয়ে টিকিট দেখতে চায়, এখানে কেউ চাইল না। প্লেন যখন আকাশে তখন কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হাতে রসিদবই নিয়ে কণ্ডাক্টর

এলেন ভাড়া চাইতে। যেভাবে কলকাতার বাসে টিকিট কিনি সেইভাবেই যাত্রা-টাকে আইনি করলাম। কোনো এয়ার হোস্টেস নেই। সবার টিকিট কেটে একটা ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে এলেন ওই একই কন্ডাক্টর। তাতে নরম ও কড়া পানীয়ের কৌটো থেকে আরম্ভ করে টুকিটাকি খাবারের প্যাকেট ঠাসা। না, বিনামূল্যে বিতরণ নয়, ফেল কড়ি মাখো তেল ব্যবস্থা। হঠাৎ মনে হলো এই ব্যবস্থাটা আমাদের দেশে চালু হলে কেমন হতো! মাঝ আকাশে কন্ডাক্টর টিকিট চাইল আর সেই গ্রাম্য মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, 'পইসা নাই', বেল বাজিয়ে গাড়ি থামিয়ে নামিয়ে দিতে পারবে না।

কিন্তু ব্যাপারটা ভাবার মতো। আমাদের এদেশে আগে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন-সের পাশাপাশি প্রাইভেট কোম্পানির প্লেন চলত। জলপাইগুড়ি কুচবিহারে সেই প্লেনে সস্তায় যাওয়া যেত। এখন তো এয়ার লাইন্স উত্তরপূর্ব ভারতের প্লেন ভাড়া কিছুটা কমিয়ে রাখলেও বেশিরভাগ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এখনও কেউ জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় প্লেনে আসছে শুনলে ভাবে উঠতি বড়লোক। ভারত সরকার যদি কিছু প্রাইভেট কোম্পানিকে প্লেন চালাতে দেন এবং তারা যদি আমাদের স্টেটবাসের মতো বাস পিছু পঁয়তাল্লিশজন কর্মচারীর ব্যবস্থা না করান তাহলে আমাদের দেশের বিমানভাড়া দশআনায় নেমে যেতে বাধ্য। বাফেলোতে চমৎকার কাটিয়েছিলাম বাংলাদেশি ছেলেদের মেসে। ওরাই গাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল নায়েগ্রা দেখতে। এপাশে আমেরিকা ওপাশে কানাডা। পাঠক এই সুন্দর এবং ভয়ংকর জলপ্রপাতের বর্ণনা নিশ্চয়ই অনেক পড়েছেন। আমার সেই উদ্দেশ্যই নেই। তবে লিফটে চেপে যখন জলপ্রপাতের নিচে নেমে গেছি তখন সেই ছিটকে ওঠা জল থেকে তৈরি কুয়াশায় দাঁড়িয়ে মনোজ বলেছিল, 'ঈশ্বর অনেক কিছু আশ্চর্যজনক সৃষ্টি করেছেন ঠিকই, কিন্তু মানুষ যখন লেখে তখন কখনও কখনও ঈশ্বরকেও অতিক্রম করে যায়, এইখানেই ঈশ্বরের হার।' কথাগুলো আমার মনে নায়েগ্রার স্মৃতির চেয়েও বেশি উজ্জ্বল।

'ডেথ অফ এ সেলসম্যান:' নাটকটি আমাদের ছাত্রাবস্থায় খুব আলোচনার বস্তু ছিল। চতুর্মুখ দলের অসীম চক্রবর্তী 'জনৈকের মৃত্যু' নামে ওই নাটকটি কর-তেন। ব্রডওয়ে থিয়েটারে বসে ওই নাটক দেখা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। বলে রাখা ভালো ভিনসেন্ট ক্যানবির চিঠি আমাদের টিকিট পেতে সাহায্য করেছিল এবং সেটা উপহার হিসেবেই। আমার এর আগে ছবিটবি দেখে ধারণা হয়েছিল আমেরিকান পেশাদারি নাটক মানে বিশাল স্টেজ, মাথা ঘোরানো ব্যাপার-স্যাপার। কিন্তু কলকাতার হলের কোনো তুলনা মাথায় না এলেও মনে হলো এরা অপ্রয়োজনীয় বা বাহুল্যের ব্যবস্থা করেননি। কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গেলাম ডাস্টিন হফম্যানের অভিনয় দেখে। ক্রেমার ভার্সেস ছবি দেখে চমকে গিয়েছিলাম, টুথসিতে ওর নারী ভূমিকায় অভিনয় করার গল্প শুনেছি কিন্তু এক প্রৌঢ় বৃদ্ধের চরিত্রে সেই মানুষ যেন সমস্ত অতীত স্মৃতিবিচ্ছিন্ন। নাটকের মাঝখানে একজন লোক এসে বলে গেল যদি চাই আমাদের একজন নাটকের শেষে গ্রীনরুমের সামনে আসতে পারে।

একজন কেন ? মনোজ বলল, 'এক এক করেই তো অনেক হয়। আপনি ঘুরে আসুন।' ফিল্ম স্টার দেখার লোভ আমার কখনই ছিল না। একটু অসত্যি বললাম। কলকাতার কলেজে যখন পড়তে এলাম তখন উত্তমকুমার মধ্যগগনে। কিন্তু তাঁকে দেখার সাধ হতো না বরং ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে হতো, সাহস পাইনি। এখন তো কলকাতার চলচ্চিত্রজগতের প্রায় সবাইকে কাছ থেকে জানি। কিন্তু ছাত্রাবস্থা থেকে মাত্র একজনই আমার মনে মাটি খুঁড়ে রোমাণ্টিকতার শেকড়ে রোদ হাওয়া দিয়েছিলেন অথচ তাঁর সঙ্গে আজও আমার পরিচয় হলো না ! ছেড়ে যাই একথা, আমেরিকায় এসে পুরোন ফিল্মস্টারদের সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম কারণ তাঁরা একসময় আমাদের খুব কাছের লোক ছিলেন। এখন কে কেমন আছে জানতে ইচ্ছে করেছিল। শুধু সিডনি পয়েটার ছাড়া কারো সঙ্গেই সেতু তৈরি হয়নি।

গ্রীনরুমের সামনে একটা চওড়া প্যাসেজ। বলে রাখা ভালো পুরো বাড়িটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। সেই প্যাসেজে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন জনাছয়েক বিভিন্ন বয়সের সুবেশ মানুষ। আমাকে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে বলা হলো। মিনিট তিনেকের মধ্যে ডাস্টিন এলেন। ইতিমধ্যে মেকআপ তুলে পোশাক পাল্টেছেন। যেভাবে এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নেমে রাষ্ট্রনায়করা পরিচিত হন সেইভাবে একে একে করমর্দন করতে করতে এগিয়ে আসছেন। আমার পাশের ভদ্রলোকের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাউ ইজ বব ?'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বিগলিত হাসি হাসলেন, 'ফাইন।'

এবার আমার সামনে। ছোটোখাটো মানুষ। অস্কার পেয়েছেন। চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইউ আর ফ্রম ?'

'ইণ্ডিয়া।' নিজের নাম বললাম।

'হাই ইজ রে ?'

'উনি খুব সুস্থ নন।'

'আপনি কি করেন ?'

'লেখালেখি।'

'আচ্ছা ! নাটক কেমন লাগল ?'

'আপনার অভিনয় ভালো লেগেছে।'

'নাটক ?'

'ঠিক আছে।'

'কিছু মনে করবেন না আপনার দেশের নাটকের মান কীরকম ?'

'কয়েকজন আছেন যাঁরা খুব ভালো করেন।'

'পরিচালক না অভিনেতা ?'

'দুই-ই।'

'একটা নাম বলবেন ?'

'শম্ভু মিত্র।'

'আমি নাম শুনিনি কেন ?'

'প্রচার ব্যবস্থার ত্রুটির জন্যে।'
ডাস্টিন আমার দিকে যেন অবাক হয়ে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'রে-কে আপনার কী ধরনের পরিচালক বলে মনে হয় ?'
'তিনি একজন মহান পরিচালক।'
'মহানের সংজ্ঞা আপনার কাছে কীরকম ?'
'এনিয়ে শুধু তর্কই হবে।'
'ঠিক। আমি ওঁর ছবি যা পেয়েছি দেখেছি।' পাঠক এবার ক্ষমা করুন। ডাস্টিন হফম্যান সেই রাতে যা যা বলেছিলেন তা আমার কাছে রেকর্ড করা নেই। কারণ কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়াই আমি গিয়েছিলাম। অতএব আজ এতকাল বাদে এমন কিছু লেখা উচিত হবে না যার সত্যতা প্রমাণ করতে পারব না। এমন কিছু বলা আহাম্মুখী হবে যা নিজে বিশ্বাস করি না অথচ অন্যে বলেছেন বলে নির্বিকারভাবে উগরে দিয়ে পরে হাত কমড়াবো। সেই মফস্বলের বালকটি তো ইতিমধ্যে কলকাতার মানুষ দেখে দেখে চল্লিশের মাঝখানে পেঁাছে গেছে !
এবার আমেরিকা ছেড়ে যাওয়ার পালা। মনোজ আর একবার সমস্ত পরিকল্পনাটা ঝালিয়ে নিল। আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে শিল্পী, প্রধান কুশলীদের তারিখ নিয়ে পাশপোর্ট রেডি করতে বলব। মনোজ ভিসার কাগজপত্র পাঠাবে এখান থেকে। টিকিট নিয়ে সে নিজেই হাজির হচ্ছে খুব শিগগির। কিন্তু এসব খবর আগাম প্রেসে দিতে চায় না ও। আমিও না।
ইতিমধ্যে মনোজ দুটি গল্প পাঠিয়েছে সাগরদার নামে দেশ পত্রিকার ঠিকানায়। হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোনটে আমার হবে বলুন তো ? লেখা না ছবি ?' খুব কঠিন ছিল উত্তর দেওয়া। ছবি হবে না বলা যায় ? যখন সব কিছু শেষ হবার মুখে ? লেখা হবে না বলাটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি হাসছি দেখে মনোজ ব্রুকলিন ব্রিজের দিকে যেতে বলেছিল, 'ছবিই হবে। লেখা তো অন্যের দয়ায় নির্ভর করে। তিনি ছাপবেন কিনা পাঠক পড়বেন কিনা। ছবি আমি তুলব নিজের ক্ষমতায়, কেউ দেখতে না চাইলে জোর করে দেখাবো।'
'নিজের পয়সায় তো বই ছাপাতে পারেন।'
'নাঃ। সেটা অক্ষমতাকে প্রমাণিত করবে। আমার 'এই দ্বীপ এই নির্বাসন' কোনোদিন বই হয়ে বেরুবে ভেবেছেন ? অসম্ভব। আন্তরিকের পাতায় ছাপা হচ্ছে, এদেশে তো ঠোঙাও হয় না।'
শেষবার নিউইয়র্কের রাতের রাস্তায় আমরা ঘুরেছিলাম এলোমেলো। এই সেই নিউইয়র্ক যার তিনদিকে হাডসন, ইস্ট আর হার্লেম নদী চতুর্থদিকটা অতলান্তিকের নোনা জলে ঘেরা। কেউ কেউ শহরটাকে বলেন, 'মেল্টিং পট। মনোজের কথাই তুলে দিচ্ছি, 'আমেরিকা মূলত ইমিগ্রান্টদের দেশ। কাজেই আমেরিকান সংস্কৃতির পাশাপাশি এখানকার প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই আরেকটা শেকড় আছে। যতো জ্বালা-যন্ত্রণা এই অন্য শেকড়টা নিয়ে।'

পাঠক, কাহিনীর এখানেই শেষ হলে খুশি হতাম খুব। কিন্তু ঈশ্বরের খাম-খেয়ালিপনার একটি নিকৃষ্ট উদাহরণ আমাকে দিতেই হচ্ছে। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আমেরিকার মানুষদের নিয়ে এই আকাশপাতাল ভাবনার মধ্যে পৃথিবীর মতো দাঁড়িয়ে আছে মনোজ। আজ মনে হয় আমি আমেরিকানদের যতটা না দেখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি জেনেছি মনোজকে। ছাত্র হিসেবে সে ছিল ব্রিলিয়ান্ট। হ্যাঁ, আমি 'ছিল' শব্দটি লিখতে বাধ্য হলাম। খড়্গপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ও কস্ট এবং ওয়ার্কস এ্যাকাউন্টিং পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল। নিউইয়র্কের সেণ্ট জন্স ইউনিভার্সিটি থেকে বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন পরীক্ষা দিয়ে সে আমেরিকার 'গোল্ড কি' পুরস্কার পেয়েছিল। সেখানে পেশায় যেখানে পৌঁছেছিল তা বাঙালির স্বপ্ন। কিন্তু এহেন দামি ছেলে যখন কাছে আসত তখন মনেই হতো না ওইসব ডিগ্রির কথা। এমন হাঁসের মতো জল পালক থেকে ঝেড়ে ফেলার ক্ষমতা অর্জন করা খুব শক্ত। কিন্তু ওই বলয় থেকে বেরিয়ে এসে মনোজ চাইল একই সঙ্গে লেখক এবং চলচ্চিত্র পরিচালক হতে।

দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ ডাকে গল্প পেয়ে সরাসরি পুজো সংখ্যায় ছাপলেন। একই বছরে ওর আরও দুটো গল্প বেরুলো দেশে। মনোজ চিঠিতে জানাল কৃতজ্ঞতা। বলল, 'খুব জোর পাচ্ছি। উপন্যাস লিখব। কলকাতায় পাঠকরা কেমন নিচ্ছেন আমার লেখা জানতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ছবিটাও তুলব। তৈরি হচ্ছেন তো?'

ঈশ্বর কাউকে কাউকে অজান্তে অনেক দিয়ে থাকেন। তারপরেই যখন কেড়ে নিতে পারেন তখন তাঁদের নাম হয়ে যায় মনোজ ভৌমিক।

মনোজ আমায় লিখল, 'কলকাতায় যাচ্ছি খুব শিগ্গির। ইউনিট নিয়ে আমার জন্যে তৈরি থাকুন।'

সেই দিনটা অনেকটা এইরকম। মনোজ সবসময় থাকত খুব আলস্য নিয়ে। পোশাক নিয়ে মাথা ঘামাতো না। গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল ব্যাঙ্কে যাবে বলে। গিয়েও ছিল কাজ সেরে পার্কিং লটে এসে গাড়ি চালু করে রাস্তায় উঠেছিল। আর তখনই ঈশ্বর ওর বুকে যন্ত্রণাটা তৈরি করলেন। মনোজ বলত, মানুষের বুকে যদ্দিন যন্ত্রণা থাকবে তদ্দিন সে নিজেকে মানুষ বলে প্রমাণিত করে যাবে। মনোজ জানত না, আর এক যন্ত্রণা আছে যা মুহূর্তেই সমস্ত আলো মুছে দেয়। বুকে হাত চেপেও যাকে সামলানো যায় না। ছুটন্ত গাড়ির স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ-হীন হয়ে পড়ে, পা এগোতে পারে না ব্রেক পর্যন্ত। মনোজ গাড়িটাকে থামাতে পেরেছিল কি পারেনি এনিয়ে দ্বিমত আছে। কিন্তু যা সত্য তা হলো এই একটা ভাঙাচোরা গাড়ির স্টিয়ারিঙে মাথা রেখে সে শুয়েছিল নিঃশব্দে। ঈশ্বর ওর শরীরের সব শব্দ কেড়ে নিয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন যেভাবে অবোধরা গোবধ করে আনন্দিত হয়।

এই খবর কলকাতায় আমার কাছে পৌঁছাতে সামান্য দেরি হয়েছিল। এবং ততক্ষণ মনোজ আমার কাছে বেঁচে ছিল। ততক্ষণ আমি জানতাম ছবিটা হচ্ছে, ততক্ষণ আমি ভেবেছিলাম বাংলা সাহিত্যের স্থির হয়ে আসা জলে ঢেউ উঠতে

যাচ্ছে। আর এখন চোখ বন্ধ করলেই একটি দৃশ্য চট করে সামনে চলে আসে। নিউইয়র্কের রাতের রাস্তায় মনোজ গাড়ি চালাচ্ছে, আমি পাশে। দূরে ব্রুকলিন ব্রিজ দেখা যাচ্ছে। ও পাশের লেন দিয়ে মাঝমধ্যে এক-আধটা গাড়ি উল্কার মতো ছুটে যাচ্ছে। মনোজ আপনমনে গুণগুণ করে যাচ্ছে, 'তুমি কিছু দিয়ে যাও।' সারারাত আমরা পাক খাচ্ছি নিউইয়র্কের পথে পথে। তখনও জানি না জীবন খুঁজে পাওয়া বড় দুষ্কর। এতো চাওয়া সত্ত্বেও কিছুই পাওয়া যায় না। এই লেখালেখি শেষ। তবু হে পাঠক, এই মানুষটিকে জানবার জন্যে আপনাদের আর একটু অপেক্ষা করতে হবে। ওর লেখা থেকেই তুলে দিই। 'নির্বাসনের' মূল নায়ক নায়িকা শৈবাল আর টিয়া। বিচ্ছেদের মুহূর্তে তারা যে কথা বলেছিল তা কি মনোজেরই কথা?
টিয়া বলল, 'আমার সামনে বসো। আর কিছুক্ষণ পরেই তো তুমি চলে যাবে।' মুখোমুখি বসল ওরা দু'জন। টিয়া আবার কথা বলল, 'এতদিন পরে দেশে যাচ্ছ, মুখ গোমড়া করে যেও না। এখানকার ছেলেরা কী রকম ভাবে দেশে যায় জানো?'
শৈবালের হাসি পেল, 'কী রকমভাবে?'
'দেশে যাওয়ার আগে ভালো সেলুনে চুল কাটে। ভালো দোকান থেকে লিভাইস জিন কেনে—তার সঙ্গে দামি শার্ট। কাঁধে মিজোলটা কিংবা সাইকন। আমেরিকা থেকে যাবার আগে কতোরকম প্রিকশান নিতে হয়।'
'কেন?'
'ওমা! তুমি কি বোকা গো! দেশে যদি কেউ বলে ফেলে আপনি আমেরিকা থেকে এলেন বোঝাই যাচ্ছে না! কি লজ্জার কথা। প্রথমেই ডিফারেন্সটা দেখিয়ে দিতে হবে। মেড ইন হংকং বা কোরিয়া হলে মাথা কাটা যাবে। ব্র্যান্ড নেম হওয়া চাই।' টিয়ার হাত পা নাড়া দেখে শৈবাল হেসে ফেলল। টিয়া গম্ভীর মুখে বলল, 'আরেকটা সুযোগ আছে। মাইনেটা টাকায় বলতে পার। অনেকের চোখ বড় হয়ে যাবে।'
শৈবাল বলল, 'তুমি কি রেগে যাচ্ছ আমার ওপর?'
স্যুটকেস বন্ধ করে টিয়া উঠে পড়ল। চায়ের কাপ দুটো নিয়ে রান্নাঘরে যেতে যেতে বলল, 'না রাগ নয়, 'তোমার ওপর তো নয়ই।'
শৈবাল টিয়ার মুখোমুখি দাঁড়াল, 'আমার দিকে তাকাও।'
টিয়া মুখ তুলল, ওর চোখে জল। শৈবালের হাতদুটো শক্ত করে ধরে আস্তে আস্তে বলল, 'যদি না পারি?'
'কি?'
'চাকরি, পড়শোনা, একা একা ঘরে ফেরা, এই নির্বাসন।'
টিয়ার চুলগুলো হাত দিয়ে পুরো এলোমেলো করে দিলো শৈবাল,
'জান, কলকাতা থেকে তোমার জন্যে কি আনব?' টিয়া তাকাল।
শৈবাল বলল, 'কাজল।' টিয়া হেসে ফেলল।
মনোজ কাজল আনতে চেয়েছিল।